উৎসর্গ

স্বর্গতা জননী

সুকুমারী দত্তের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—

॥ সূচীপত্র ॥

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
প্যারীচরণ সরকার	...	১৬
উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত	...	৩৩
হরিচরণ দাস	...	৫০
গণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে	...	৬১
ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী	...	৭৪
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	...	৯০
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী	...	১০০
সারদারঞ্জন রায়	...	১১২
কুঞ্জলাল নাগ	...	১২৫
ঈশানচন্দ্র ঘোষ	...	১৪৩
রসময় মিত্র	...	১৫৭
জগদীশ মুখোপাধ্যায়	...	১৭১
কামাখ্যাচরণ নাগ	...	১৭৯
হারাণচন্দ্র চাকলাদার	...	১৯১
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ	...	২০৯
যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদার	...	২২০
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	...	২৩১
যোগীন্দ্রনাথ বসু	...	২৩৯
গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর	...	২৫১
নির্ঘণ্ট	...	২৭৫

নিবেদন

বাঙলার উনবিংশ শতাব্দী বাঙলার ইতিহাসে একটা বড় যুগ। এই শতাব্দীর প্রধান বাণী,—ভূমিচারী মানবাত্মার মানস বিস্ফোরণ। য়ুরোপ যেমন মধ্যযুগের কালরাত্রির অবসানে প্রাচীন হেলেনীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে নূতন মূল্যমানের সাহায্যে জীবন সমুত্থিত সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমাপ করতে সমর্থ হয়েছিল—তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপ যেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের পশরা নিয়ে বাঙালীর দুয়ারে করাঘাত করেছিল—সেদিন ভারতবর্ষের মূর্চ্ছাতুর জড়দেহটাতে প্রাণসঞ্জীবনী মন্ত্র সঞ্চারিত হয়নি সত্য, কিন্তু এই আঘাতের ফলে বাঙালী আপনাকে আবিষ্কার করে এবং বক্ষপঞ্জরে বহ্নি সংকার করে তারই শিখায় বিসর্পিত জীবনপথের সন্ধান পায়। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইংরেজী শিক্ষার যে ঢেউ আসে তা নামান্তরে ফরাসীচিন্তার ঢেউ। ফরাসীচিন্তার যে আঘাতে প্রাচীন সমাজ ও শাসনপদ্ধতি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তার বীজমন্ত্র Reason। এ দেশের প্রথম ইংরেজী শিক্ষার গুরুগণ হেয়ার, ডিরোজিও, রিচার্ডসন সকলেই Reason পন্থী। বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার সেই সত্যযুগে ফরাসী নাস্তিক্যবাদ, নিরীশ্বরবাদ ও যুক্তিপন্থার পরোক্ষ প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে জিজ্ঞাসামুখর নব নব প্রতীতির বহ্ন্যুৎসব সৃষ্টি করেছিল। পরে এই জাগরণ আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে সমগ্র জাতির প্রাণকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। জাতির মগ্ন চৈতন্য হতে তার জন্মজন্মান্তরের ঐতিহ্য, তার সুদীর্ঘ অতীত, একসঙ্গে একই প্রেরণায় তড়িৎ-শিখাবৎ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতকের বাঙলার ইতিহাস এ যুগের সারা ভারতের ইতিহাস। প্রকৃত প্রস্তাবে 'It was truely a Renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople.'

যুগধর্মবশে সেদিন বাঙলার যে জাগরণ ঘটেছিল তা এক অর্থে সম্পূর্ণ নূতন, কোন প্রাচীন সুপ্তসংস্কারের পুনরুদ্বোধন নয়। বাঙলার নবজাগরণের বড় আশীর্বাদ নব্যশিক্ষা। ইংরেজশাসনের সূচনা থেকে এই শিক্ষার পদসঞ্চারণ সূচিত হলেও মেকেলে'র বিখ্যাত 'এডুকেশন মিনিট' (১৮৩৫) এবং আরও পরে চার্লস্ উডের শিক্ষা সংক্রান্ত সনদ (১৮৫৪) পর্যন্ত, বলা যেতে পারে,

যুগের সমগ্র মধ্যকাল ব্যাপ্ত করে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাই আর সকল আকাঙ্ক্ষাকে গৌণ করে তুলেছিল। বাঙলায় সে যেন এক নূতন ঋতুর আবির্ভাব। ইংরেজী শিক্ষা সেই আবির্ভাবের পক্ষে বড়ই অনুকূল ও উপযোগী হয়েছিল। এই যুগের প্রধান ও মূল প্রবর্ত্তনা যে ইংরেজী শিক্ষার ফলেই ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। তথাপি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সূত্রপাতে মিশনারী সম্প্রদায়, ইংরেজ রাজপুরুষ, বিশেষ করে সেকেলে'র চক্রান্তমূলক মনোভাবের কথা আদৌ বিস্মরণযোগ্য নয়। মেকেলে'র সেই উক্তি, "We will creat a Class of People who will be Indians only by birth, but they will be Europeans in their thoughts, words and deeds" ইংরেজ রাজপুরুষগণের এই বাসনা কার্য্যতঃ চরিতার্থ হয়ে ওঠেনি। পৌত্তলিক ভারতবাসী দলে দলে যীশু ভজনা করবে তাঁদের এই আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এতদ্দেশীয় শিক্ষক সমাজের প্রতিও তাঁদের আস্থা ছিল না। বিলাত থেকে শিক্ষক আনয়ন করে এই নূতন শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসার তাঁদের পরিকল্পনার বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ কাল থেকে গৌড়বঙ্গের প্রাণধর্মের যে বিশিষ্ট বিকাশের সূচনা—সেই ধারা-বাহিকতার মন্থর স্রোত চলোর্ম্মিমুখর সমুদ্রের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। গত যুগের ঐ মানস জাগৃতি বাঙালীর মর্মমূলে যে দিব্য-দাহ সৃষ্টি করে তার বিদ্যুৎস্পর্শ শিক্ষাজগতে সঞ্চার করে কুলনাশী প্রাণোন্মাদনা। ফলতঃ অত্যল্পকাল মধ্যে এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় নবলব্ধ য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নবযুগের অভ্যুদয় সূচনা করে।

বাঙলার এই নবজাগরণের অভিনব আত্মসাক্ষাৎকারের গূঢ়তম নিদর্শনগুলি কেবলমাত্র সাহিত্য-সমাজ-ধর্মসংস্কার ও রাষ্ট্রচেতনার মধ্যেই অনুস্যূত নয়—উনবিংশ শতকের নব্যশিক্ষা সম্প্রসারণের ইতিহাসের মধ্যে তার প্রচ্ছন্ন উপাদান বিক্ষিপ্ত আছে। বস্তুতঃ এই যুগের সাহিত্য অপেক্ষা সাময়িক পত্রের মধ্যেই বাঙালীর মানসজীবনের পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষিত হবে। নবযুগের বাণীকে দেশব্যাপ্ত করে সাময়িক পত্র ও বঙ্গের নব্যশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়। গত যুগের ঐ চিত্তজাগরণের উৎসবে শিক্ষকসমাজের অভিনব যুগ প্রবর্ত্তনার কাহিনী ঐ ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষই ঐরূপ যুগের প্রবর্তক নন। ছোট-বড় কত পুরুষের প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে জাতির প্রবুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এই শিক্ষাকে প্রসারিত ও প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। কোলকাতা

বা শহর-নগরীগুলিতেই নয়—সুদূর গ্রামবঙ্গের শান্ত-নিরুদ্বিগ্ন আম্রবনচ্ছায়া পরিবেষ্টিত বিদ্যাপীঠে বসে সে যুগের কৃতবিদ্য শিক্ষকসমাজ লোকচক্ষুর অন্তরালে নবযুগের ভাবচিন্তার বহ্নিকণা ছড়িয়েছেন—নূতন যুগের মানুষ গড়েছেন—জাতির চিত্তে দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতকের প্রথম হতে বাঙালীর মানসজীবনে যে চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয় এবং ফলতঃ যে নব-জাগৃতি, তার ধারাবাহিক ইতিহাস বোধকরি এখনও রচিত হয়ে ওঠেনি। সে বিষয়ে আংশিক ও প্রাসঙ্গিক যে সব আলোচনা বা পুথি-পুস্তক রচিত হয়েছে—সেখানে সমগ্র চিন্তার লক্ষণ সুপরিস্ফুট নয়। গতযুগের শিক্ষকসমাজের অনেকেই তাঁদের কীর্তির কোন পাথুরে প্রমাণ রেখে যাননি—তথাপি তাঁদের সাধনা ও কর্মকীর্তির কাহিনী নবযুগের ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। এই অদৃষ্টপূর্ব বাঙলার নবজাগরণ প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ সরকারের প্রসিদ্ধ বচন স্মরণযোগ্য,—"In this new Bengal originated every good and great thing of the modern world and passed on to the other Provinces of India. From Bengal went forth the English educated teachers and the Europe—inspired thought that helped to modernise Bihar and Orissa, Hindusthan and Decan. বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে বাঙালীর প্রাণ-মনের যে আকস্মিক উদ্দীপ্তি তার যথাযথ আলোচনা ইতিহাসসম্মত হওয়া উচিত এবং সে ইতিহাসে গতযুগের নব্যশিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাধনা ও কীর্তির সুসম্বদ্ধ আলোচনা প্রয়োজন।

আমার এই আলোচনা সেইরূপ কোন বিধিবদ্ধ গবেষণা নয়। বিগত এক দশক কাল ধরে সেকালের বিদ্যালয় ও কলেজের স্মরণীয় শিক্ষকবৃন্দের উপর আমার অনেকগুলি নিবন্ধ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 'সেকালের শিক্ষাগুরু' এইরূপ কিছু নির্বাচিত নিবন্ধের সংকলন মাত্র। উনবিংশ শতক থেকে বর্তমান শতক পর্যন্ত প্রসারিত সময়ে বঙ্গীয় শিক্ষকসমাজের বিচিত্র সাধনা ও কর্মকীর্তির ইতিবৃত্ত আয়াসসাধ্য ও গুরুতর গবেষণার বিষয়। এইরূপ ইতিহাস অর্থে ঘটনার যে কালক্রমিক তরঙ্গ-পরম্পরা বুঝায়—আমার এই গ্রন্থে তার একান্তই অসদ্ভাব। তথাপি মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন চরিত্রের উদার দৃশ্যপট সম্মুখে প্রসারিত রেখেছি—গতযুগের জাতির ঐ বিশিষ্ট সাধনার সঙ্গে তাঁদের সুগভীর সম্পর্কের সশ্রদ্ধ পরিচয় যতদূর সম্ভব উন্মোচন করার প্রয়াস প্রত্যক্ষ

করা যাবে। শিক্ষক চরিত্রগুলির অধিকাংশই একালে প্রায়-বিস্মৃত। গ্রন্থখানির পরিশিষ্ট রচনা 'গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর'। শুভঙ্কর ঐ ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ববর্তী। তথাপি বাঙলার শিক্ষাজগতে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাবের কাহিনী বিস্মরণযোগ্য নয়। সেই গল্প-গাথা ও কিংবদন্তীর 'শুভঙ্কর'কে নূতন করে অনুসন্ধানের দিকটি সুধীসমাজের দরবারে সবিনয়ে উপস্থিত করেছি।

গ্রন্থে সঙ্কলিত নিবন্ধগুলির অধিকাংশই অপরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হ'ল। রচনাগুলির মধ্যে যেসব মতামত স্থান পেয়েছে—সেগুলি সকল ক্ষেত্রে বর্তমানে আমার অনুমোদিত না হতেও পারে—ইতিমধ্যে কিছু কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান মিলেছে; স্বভাবতঃই রচনাগুলির পরিবর্তন ও পরিমার্জনের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। লেখকের বর্তমান রুচি ও বিচারের মান দিয়ে রচনাগুলির সংস্কারসাধন করতে গেলে হয়ত এই গ্রন্থখানির প্রকাশ ঘটে উঠত না—সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রবন্ধ আবার নূতন করে লেখার প্রয়োজন হত। স্বভাবতঃ কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষিত হ'তে পারে। উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে আমার লেখাগুলিতে মাঝে মাঝে প্রাচীন ও নূতন উভয় বানান পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে গেছে। আমার আবাস কোলকাতা থেকে দূরবর্তীস্থানে হওয়ায় প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ রয়ে গেছে। আশা করি প্রশ্রয়শীল পাঠক সমাজের দৃষ্টিতে এই সব অসঙ্গতিগুলি উপেক্ষণীয় বলেই গণ্য হবে।

সেকালের শিক্ষকসমাজ সম্বন্ধে আমাকে অনুসন্ধান ও আলোচনার পন্থা নির্দেশ করেছিলেন 'শিক্ষক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক স্বর্গীয় অধ্যাপক মহীতোষ রায়চৌধুরী মহাশয়। এই গ্রন্থের অধিকাংশ রচনা 'শিক্ষক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কয়েকটি রচনা 'সমকালীন' সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী, এবং একটি রচনা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সুবর্ণলেখা' নামক স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই সমুদয় পত্র-পত্রিকা ও স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক ও কর্তৃস্থানীয়দের আমি এই সূত্রে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শিক্ষক পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক শ্রীসমীর রায়চৌধুরীর সৌজন্য ও সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আমার শিক্ষাগুরু 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে'র 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে'র প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত মহাশয় আমার এই শ্রেণীর লেখাগুলিকে

গ্রন্থবদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁকে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত অতিশয় তৎপরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই সঙ্গে আমার পুত্র শ্রীমান অংশুমান দত্ত ও 'তুলি-কলম'-এর শ্রীবীরেন নাগের নাম উল্লেখ না করলে প্রত্যবায় হবে।

পরিশেষে পুস্তক প্রকাশনার এই সংকট মুহূর্তে 'তুলি-কলম'-এর কর্ণধার শ্রীকল্যাণব্রত দত্ত অতিশয় আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে আমার এই নীরস রচনাগুলিকে গ্রন্থরূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন। এজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

তারাধন দত্ত

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়। 'In June 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal.' ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে তা সত্য হলেও, বাঙলাদেশে যথার্থ নব যুগের সূচনা হয় রামমোহনের কলকাতায় আগমনের পর। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের কলকাতায় আগমনের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, রামমোহন নব প্রাণ-প্রতীতির দিব্য দীপশিখা বহন করেছিলেন। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ তাঁরই শাণিত যুক্তির আয়ুধে সজ্জিত হয়ে নব্য রেণেসাঁর পথ প্রস্তুত হয়। রামমোহন এই দারিদ্র্য-পীড়িত যুগজীর্ণ মধ্যযুগীয় বাঙলাদেশে বিচিত্র ও বিরোধী জীবনধারার সমন্বয় সাধন করে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই বাঙালীর নবজীবন প্রভাতের মাঙ্গলিকগানে দেশকে চকিত করেন। বাঙলাদেশের এই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি বিষয়ে নানা পুস্তক, নিবন্ধ ও সমীক্ষাদি প্রকাশিত হয়েছে। অগণিত কৃতী বাঙালীর শোভাযাত্রায় এই পুনর্জাগরণ চরিতার্থ হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশের সেই বিস্ময়কর উজ্জীবনের ইতিবৃত্ত আমাদের আলোচ্য নয়। এই আত্মঘোষণার বহুবিধ অভিনব লক্ষণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও সম্প্রসারণ আধুনিকতার বার্তাবাহীরূপে চিহ্নিত। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর (১৮১৭ খৃঃ) বাঙালী য়ুরোপীয় জীবনধারার পরিচয় পায় এবং সত্যকার নবজীবনের সূত্রপাত হয়। উনিশ শতকের এই প্রত্যূষলগ্নে রামমোহনের সমকালীন যুগে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার খুব সহজ ছিল না। এই পর্বের কৃতবিদ্য বঙ্গসন্তানগণের কৃতিত্ব ও কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞান হয়তো দুর্লভ নয়। কিন্তু যুগনায়কদের যুগবাণী বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছিল যশস্বী শিক্ষক-সমাজের ঐকান্তিক শিক্ষা ও সাধনা-বৈগুণ্যে। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ জিজ্ঞাসা—জীবন-রহস্য মন্থনের চেষ্টা। এই মন্ত্র আপামর জন-সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করেন দেশী ও বিদেশী শিক্ষকগণ। এই সূত্রে প্রথিতযশা শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে উদিত হয়। এদেশের শিক্ষক সমাজে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় হেডমাষ্টার এবং ইংরেজীর প্রথম অধ্যাপকরূপে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে মুকুটিত থাকবেন।' দুঃখের বিষয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ যুগে একপ্রকার প্রায়-বিস্মৃত।

রামমোহনের জীবৎকাল মধ্যে (১৭৭২-১৮৩৩ খৃঃ) আবির্ভূত হয়ে যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন, তাঁদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাঙালী চিত্তে চিরকালের জন্য অম্লান হয়ে থাকার মত। কিন্তু মানুষ-গড়ার এই অদ্বিতীয় শিক্ষাগুরু—নবজীবনবোধ ও জাগৃতির পুরোগামী পথিক ঈশানচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথাও একালে এক-প্রকার দুর্লভ এবং গবেষণার বিষয়। অসাধারণ পণ্ডিত, খ্যাতিমান লেখক ও প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের বাঙলাদেশের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ঈশানচন্দ্রের জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় এতাবৎ বিস্তৃতভাবে কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর জন্মের প্রায় একশত ষাট বৎসর পরে তাঁর জীবনের উপাদান সংগ্রহে বাধা অনেক। পুরাতন পত্র পত্রিকার ফাইল, সরকারী বিবরণ ও পুস্তকাদি সর্বত্র সহজলভ্য নয়। এমতাবস্থায় সংগৃহীত স্বল্পবস্তু-নির্ভর উপাদান অবলম্বন করে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জীবনাবয়ব বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য।

পলাশীর যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের একটা লাল তারিখ। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার পরবর্তী কিছুকালের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার পদ-সঞ্চারণের সূচনা। এই ঐতিহাসিক লগ্নের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা সংস্কৃতির উন্মেষপর্বের সমাপ্তি সূচিত হয়। অতঃপর নব্য সংস্কৃতির কনকপদ্ম কলকাতাকে কেন্দ্র করে নবজীবনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। বাঙালীর সেই নব জাগ্রত চিত্ত সেদিন সহসা সুদূর গ্রামবঙ্গের তন্দ্রাতুর সমাজদেহেও আলোড়ন তুলেছিল। বাঙালীর এই চিত্ত-জাগরণ ও আত্মবিকাশের মুহূর্তে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের প্রায় ৫৭ বৎসর পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে (১০ সেপ্টেম্বর) হুগলী জেলার গুপ্তি-পাড়ার গঙ্গা-বেহুলা সঙ্গম সন্নিহিত 'আয়দা' পল্লীতে শ্রুতকীর্তি শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের প্রায় ৪৩ বৎসর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। 'আয়দা' পল্লীতে অদ্যাপি তাঁর ভদ্রাসনের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান।

ঈশানচন্দ্রের পিতা বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আয়দার এই বন্দ্যোপাধ্যায়েরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ। পুত্র-কন্যাদের লেখাপড়া সম্পর্কে বদনচন্দ্র খুব সচেতন ছিলেন। তৎকালে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর আস্থা ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দু হয়েও, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন দেশের ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি এককথায় বঙ্গ-সংস্কৃতির পরম সঙ্কটকাল।

পুত্র-কন্যাদের নৈতিক অধঃপতনের আশঙ্কায় বদনচন্দ্র স্বগৃহেই তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বদনচন্দ্রের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র যথাক্রমে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অপর তিন পুত্র অল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ব্যতীত আর সকলেই বালিকা বয়সে মৃত্যুবরণ করে। ঈশানচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র উত্তর যুগের নব্যবঙ্গের প্রথিতযশা শিক্ষক, বরেণ্য পণ্ডিত ও সুলেখকরূপে নবজীবনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেন। বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব ও অবদান এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়।

প্রাচীন প্রথানুযায়ী হাতেখড়ির পর ঈশানচন্দ্র দেশীয় শিক্ষাগুরুর কাছে স্বগৃহে বাঙলা অধ্যয়ন করেন। পারশী শিক্ষা ছিল তখন অপরিহার্য। ঈশানচন্দ্র মুনসী তোফেল্ আলির কাছে পারশী শিক্ষার পাঠ নেন। বদনচন্দ্র পুত্রকে গ্রামের কোন পাঠশালা বা বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে ১২ বৎসর বয়সে তাঁকে কলকাতায় প্রেরণ করেন। বদনচন্দ্রের এক ভ্রাতা ইংরেজ সওদাগরী অফিসের কর্মসূত্রে, সে সময়ে কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এই খুল্লতাতের সহায়তা ব্যতিরেকে ঈশানচন্দ্র পরবর্তীযুগে কৃতী পুরুষ হিসাবে অভিনন্দিত হতে পারতেন না। ঈশানচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন চিৎপুরে রেভারেণ্ড এম, পিয়ার্সের বিদ্যালয়ে। ঈশানচন্দ্রের প্রবল বিদ্যানুরাগ এই বিদ্যালয়েও প্রকটিত হয়ে পড়ে। ছাত্র হিসেবে ঈশানচন্দ্র খুব মেধাবী ছিলেন। রেভারেণ্ড পিয়ার্সের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, তিনি যখন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের দ্বারদেশে পৌছান, সেই সময়ে তাঁর পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। তাঁর পিতৃব্য এই সময় মেসার্স জন পামার এণ্ড কোম্পানীতে চাকুরী হারান। ঈশানচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহী অভিভাবক খুল্লতাতের পারিবারিক জীবনে আর্থিক সঙ্কট প্রকটিত হয়ে ওঠে। অতঃপর এই পিতৃব্যের প্রচেষ্টায় মেসার্স জন পামার এণ্ড কোম্পানীতে ঈশানচন্দ্রের জন্য একটি চাকুরীর ব্যবস্থা হয়। বস্তুতঃ পরিবারের সকলেই আশা করেছিলেন, এই চাকুরীর দ্বারা অন্ততঃ তাঁরা দারিদ্র্য ও অনাহার-মুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের অগ্রদূতরূপে ঈশানচন্দ্র নব্যবঙ্গে যুগপথিকের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, বোধহয় বিধাতার এমনই ইচ্ছা ছিল। মেসার্স জন পামার এ্যাণ্ড কোম্পানীর চাকুরীতে যোগদানের প্রথম দিনেই তিনি অজস্র ধারায় অশ্রুবিসর্জন করেন। অতি অল্পবয়সে বিদ্যার্জনের সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েন। পামার কোম্পানীর ইংরেজ মালিকের শত

প্রবোধ বাক্যেও কোন ফল হল না! অবশেষে এই ইংরেজ সন্তান উচ্চাভিলাষী ঈশানচন্দ্রের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, 'হিন্দু কলেজে' তাঁর জন্য একটি ফ্রী-সীটের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে যোগদান করেন। এখানে তিনি তীক্ষ্ণধী ছাত্রের গৌরব অর্জন করে, বহু বৃত্তি ও পারিতোষিক দ্বারা সম্মানিত হন। একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকে তাঁর হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে—"educated in the Hindu College where he distinguished himself by the handsome prizes and rapid promotion he won." কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে হিন্দু কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখে তিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতাকর্মে যোগদান করেন। ডাফ্ স্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে। ডাফ্ স্কুল পরবর্তীকালে জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশন্ এবং আরও পরে বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ডাফ্ সাহেবের স্কুলে ঈশানচন্দ্রের উচ্চশিক্ষার অভিলাষ চরিতার্থ হয়ে ওঠে। ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের কাছে তিনি অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান এবং সুপণ্ডিত ডক্টর ম্যাকে সাহেবের কাছে ইংরেজী, লাটিন, গ্রীক, গণিত, রসায়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ডঃ ম্যাকে শ্রীরামপুর মিশনারীর খ্যাতিমান পণ্ডিতরূপে সুবিদিত। ডঃ ডাফ্ সাহেব তাঁর বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রবৃন্দকে কেবলমাত্র শিক্ষাদানেই পরিতৃপ্ত ছিলেন না, তাঁদের ভবিষ্যৎ সফল জীবনের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা করতেন। সেকালের ইংরেজ শিক্ষাবিদ্দের মত ডঃ ডাফ্ ছিলেন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের বড় সমর্থক। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের মত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য ডাফ্ সাহেব তাঁর বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে শিক্ষক শিক্ষণের প্রবর্তন করেন। ঈশানচন্দ্র হিন্দু কলেজ ছেড়ে আসার পর প্রকৃতপক্ষে ডাফ্ স্কুলে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং এই সঙ্গে এই দুই বিদেশী পণ্ডিতের কাছে ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার তীব্র অভিলাষ চরিতার্থ করেন। শিক্ষানবিশ শিক্ষকরূপে ১৮৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধাশাখায় বিচরণ করে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাকাপাকিভাবে শিক্ষাজগতে প্রবেশের তোরণদ্বারে উপনীত হন।

হিন্দু কলেজ ও জেনারেল্ এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও শিক্ষাব্রতী জীবনের প্রতি অনুরাগের কথা শিক্ষাবিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের

কর্ণগোচরে আসে। এই সময় স্যার চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভিলিয়ান্ সাহেবের নির্দেশক্রমে ঈশানচন্দ্র চাইবাসা ও হাজারীবাগের কয়লা অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হলেন। ট্রেভিলিয়ান্ নিজে মেকলের ভগিনীপতি, আই. সি. এস. ও ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে মেকলের সহযাত্রী ও সমর্থক ছিলেন। হাজারীবাগের কিষেনপুরে ১৮৩৪ খৃঃ নূতন মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, ঈশানচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয় 'উইল্‌কিন্‌সন্স স্কুল' নামে পরিচিত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। এই বিদ্যালয়েই প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষক জীবনের সূচনা। এই বিদ্যালয়ের কর্মজীবনে তিনি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। চিন্তাশীল লেখকরূপেও তাঁর আত্মপ্রকাশ এই সময়ে। তাঁর জীবনের এই পর্ব সম্পর্কে লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন—"Here the splendid library of Captain Wilkinson, the Governor General's Agent, unreservedly thrown open to him, enabled him to make up the deficiencies of his schooldays and to pave his way to future success His graphic description of manners and customs of that barbarous people, in the pages of the Christian Observer, attracted general notice and secured for him a transfer to the Zamindari School founded by Mr. D. C. Smyth, of the Sadar Court and ultimately to the College of Haji Muhammad Mohsin." ডি. সি স্মিথ্ সাহেব ১৮৩৪ খৃঃ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। "ক্যালকাটা খৃশ্চিয়ান অবজারভার" মাসিক পত্রিকাখানি খৃষ্টান মিশনারী সমাজের পক্ষে ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কর্তৃক ১৮৩২ খৃঃ-এ প্রকাশিত হয়। ঈশানচন্দ্র তাঁর শিক্ষক জীবনের সূচনাতে এই প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিকের লেখক শ্রেণীভুক্ত হন।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জমিদারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক-রূপে যোগদান করেন। এই বৎসরের আগষ্ট মাসে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ঈশানচন্দ্র কলেজে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৩ খৃঃ নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। হুগলী কলেজের কার্যকালে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট—নভেম্বর পর্যন্ত স্কুল বিভাগে প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিনিধিত্ব করেন। ঈশানচন্দ্রের শিক্ষাব্রতী জীবনের সুদীর্ঘকাল হুগলী কলেজের সেবাতে অতিবাহিত হয়। কেবলমাত্র বেতনভুক্ শিক্ষক হিসেবে নয়—এ কলেজের প্রতিষ্ঠা ও

ক্রমোন্নয়নের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত। সংবাদপত্রে (The Englishman) প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথাতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। "He was then entrusted with the founding of the Hoogly College, Mohammed Mohesin's Institution, which has made much progress as to be, at present, fit to be considered one of the pillars on which the fabric of the University of this Presidency now rests. He successfully completed an examination for teachership with European candidates, and obtained promotion to the chair of the Headmaster, a position never before filled by any of our countrymen." হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার পুণ্যলগ্নে তাঁর শিক্ষকখ্যাতি নগণ্য ছিল না। সমাচার দর্পণে (১৬ই জুলাই, ১৮৩৬) প্রকাশিত একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সংবাদে তাঁর বিচক্ষণতা, নিষ্ঠা ও স্বধর্ম-পরায়ণতারও পরিচয় পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণ লিখেছিল, "প্রায় তিনমাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সোমাদ্দার সুবিচক্ষণ, সজ্জন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ মহাশয়দ্বয়ের অধ্যয়নাকুল্যার্থে এতৎ পাঠশালার শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়া এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তদবধি ইঁহাদের বিচক্ষণতা ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণতা ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা শ্রবণে এতদ্দেশীয় গণ্যমান্য মহাশয়েরা স্বয়ং বালকগণের তত্তৎ সন্নিধানে সমর্পণ করাতে, অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে।"

১৮৫৩ খৃঃ ঈশানচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হয়ে আসেন। সিনিয়র স্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। প্রথম এ্যাসিস্টেন্ট মাষ্টারের পদও অলঙ্কৃত করেন। ঈশানচন্দ্র (নভেম্বর ১৮৫৩—জানুয়ারী ১৮৫৬) পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঈশানচন্দ্র পুনরায় হুগলী কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন (জানুয়ারী ১৮৫৬—ডিসেম্বর ১৮৫৮)। হুগলী কলেজে এই পর্বের কার্যকালে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (এপ্রিল—জুন) কিছুকালের জন্য ঈশানচন্দ্র কলেজিয়েট স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিনিধিত্ব করেন। নভেম্বর ১৮৫৮-৬৩ খৃঃ পর্যন্ত ঈশানচন্দ্র বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে শিক্ষকতাসূত্রে নিযুক্ত থাকেন।

ইংরেজ আধিপত্য যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমতম

প্রতিনিধি বলা চলে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি শিক্ষক জীবনে সাফল্য অর্জন করেন। পদোন্নতির ব্যাপারে তৎকালে য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষকগণের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য ছিল। যদিও পণ্ডিত হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথম সারির ব্যক্তি। এবং শিক্ষক হিসেবে তাঁর অনন্যসাধারণতা কিংবদন্তীর পর্য্যায়ে উঠেছিল—তথাপি শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে তাঁকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তিনি তাঁর সমগ্র শিক্ষক জীবনে শিক্ষা বিভাগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে বহুবার অবতীর্ণ হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু য়ুরোপীয়দের একচেটিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে বহু বিলম্ব হয়। তথাপি ঈশানচন্দ্রই প্রথম ভারতীয়, যিনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চ ও শ্লাঘনীয় পদ অলঙ্কৃত করতে সমর্থ হন। এ জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগের অনেকের বিরাগভাজন হন। বহরমপুরে বদলীর ব্যাপারে ইংরেজ শিক্ষক সমাজের একটি ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হওয়া যায়। K Zachariah তাঁর History of Hooghly College (1936) গ্রন্থে ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজ শিক্ষক সমাজের মনোমালিন্যের ঘটনা বিবৃত করেছেন। পদোন্নতির ব্যাপারে দেশীয় ও ইংরেজ শিক্ষকগণের মধ্যে অহেতুক বৈষম্যকে ঈশানচন্দ্র ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্র স্বীকার করে নেননি। তখন দেশীয় শিক্ষক সমাজের নেতৃপদে ছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষাবিভাগে যথাসময়ে আশানুরূপ পদোন্নতি না ঘটায় ঈশানচন্দ্র হতাশ হন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে 'The Hindoo Intelligencer' সংবাদপত্রে প্রধান শিক্ষক গ্রেভস্ এবং অধ্যাপক ব্রেন্নাণ্ড সাহেবের উপর আক্রমণমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়। এইরূপ প্ররোচনামূলক সংবাদ প্রকাশের পিছনে ঈশানচন্দ্রের উস্কানি ছিল ইংরেজ মহলে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই সন্দেহ ও মনোমালিন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। হুগলী কলেজের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্ররা ক্লাসে শিক্ষক Mr. Ure-এর প্রতি কিছু বিরূপ আচরণ প্রকাশ করলে ইংরেজ মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব এইরূপ ঘটনার জন্য ভারতীয় শিক্ষক, বিশেষ করে ঈশানচন্দ্রের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে বহরমপুর কলেজে স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। বহরমপুর কলেজে ঈশানচন্দ্র প্রায় ৫ বৎসরকাল ছিলেন। প্রধান শিক্ষক R. L. Martin বদলী হওয়ায় ঈশানচন্দ্র কিছুকাল প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঈশানচন্দ্র প্রধান শিক্ষকের পদে হুগলী কলেজে যোগদান করেন। বহরমপুর কলেজ ছেড়ে

আসার প্রাক্কালে কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড সাহেব ঈশানচন্দ্রের জন্য এক বিদায় সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন। স্বয়ং অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড সাহেব ঈশানচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করে ভাষণ প্রদান করেন। শিক্ষাবিভাগের জেনারেল রিপোর্টে (১৮৬১-৬২) বলা হয়—"...during a five years' connection with this College won golden openions from all with whom that connection brought him into contact. Revered and loved by his pupils, he gained the confidence and respect of his officials, superiors, by his thoroughly conscientious and intelligent discharge, by the important duties committed to him; and by his urbanity of disposition, the goodwill and esteem of his subordinates and of the native community in general His official conduct remarkably exemplified the motto Suaviter in modo; fortiter in re", বহরমপুর কলেজে David Carnduff তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র হুগলী কলেজে অধ্যাপক পদে কার্যানির্বাহের নির্দেশ লাভ করেন। এই বৎসরে Higher Educational Service এর প্রবর্তন হয় এবং ঈশানচন্দ্র স্থায়ীভাবে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। শিক্ষা-বিভাগের এই পদে ঈশানচন্দ্রই প্রথম ভারতীয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে Higher Graded Service-এ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়—মাত্র এই তিনজন ভারতীয় ছিলেন। প্রায় ৭ বৎসরকাল ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্রুত-কীর্তি ভারতীয় অধ্যাপকরূপে তিনি হুগলী কলেজের যুবচিত্তে নব চেতনার বহ্নি-কণা ছড়িয়ে দেন। সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসরকাল একাগ্র শিক্ষক জীবনের ব্রত সম্পন্ন করে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রুতকীর্তি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অবসর গ্রহণের পর ঈশানচন্দ্র প্রায় ২১ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং স্বোপার্জিত পেনসন ভোগ করে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে ওয়েলিংটন স্কোয়ার সন্নিহিত বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেনস্থ নিজস্ব বাসভবনে লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুতে মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর নিজস্ব সম্পাদিত The Indian Nation সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন—"He was the first Bengalee who was promoted to the higher grade of the educational department. He did valuable work in his day, but this is not a Country which keeps a record of work or shows any appreciation of it. It would be well if he had

written down some of his reminiscenees for his was a generation that is fast becoming extinct. His younger brother Babu Mohesh Chandra died some years ago, and among the more distinguished of his friends and contemporaries there is so far as we can discover, only one left, Rev. M. Lalbehari Dey. The university has yet to produce English Scholars, teachers and writers equal to any of these gentlemen."

এদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে ঈশানচন্দ্র একটি পুণ্য নাম। বহু ভাষাবিদ্ ঈশানচন্দ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধাব্যপ্ত ক্ষেত্রে বিচরণ করেন। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে বাঙালী যে নবজীবন প্রতীতি লাভ করেছিল, তাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত করে দেওয়ার কাজে মুষ্টিমেয় যে কয়জন দেশীয় শিক্ষক পথিকৃতের পদচিহ্ন অঙ্কন করেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে স্বতোদীপ্যমান ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর সমগ্র শিক্ষক-জীবনে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন, হাজারীবাগ উইলকিনসন্স স্কুল, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলী কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৮ বৎসরকাল শিক্ষাদান ব্রত উদ্‌যাপন করলেও হুগলী কলেজে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়। হুগলী কলেজ নবজাগরণের পুণ্যলগ্নে আধুনিক শিক্ষার জয়বার্তা ঘোষণা করে। এই কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক ও স্থপতি হিসেবে ঈশানচন্দ্র বাঙলাদেশের অন্তরলোকে পূজিত থাকবেন। ঈশানচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতা মহেশচন্দ্রের পদতলে বসে উনিশ শতকের বহু কৃতবিদ্য সন্তান নবজীবন-চেতনার সমিধ সংগ্রহ করেন। বাঙলার শিক্ষক সমাজে মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ও এক অগ্রগণ্য নাম। হুগলী কলেজ, স্মিথস্ জমিন্দারী স্কুল, হুগলী কলেজ (এ্যাংলো-পারশীয়ান বিভাগ), হিন্দু স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক (১৮৬৯-৭৪) মহেশচন্দ্রও বাঙলার শিক্ষাজগতে তার একটি অবিস্মরণীয় নাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী বিভাগে তাঁর পরবর্তী অন্যান্য ভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে সারদাচরণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পূর্বসূরীদের নাম স্বভাবতঃই মনে আসে। নানা পত্র পত্রিকায়, বিশেষ করে, রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে সম্পাদিত, "বেঙ্গল ম্যাগাজিন" (জুলাই-১৮০২) পত্রিকায় মহেশচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

ঈশানচন্দ্র এদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য

বিষয়ে অধ্যাপনা করলেও ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এ জন্য আর্ক ডেকন প্রাট্ সাহেব একবার ঈশানচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টগুলিতে তাঁর শিক্ষক জীবনের সাফল্য ও কৃতিত্বের প্রশংসামূলক মন্তব্যে ভরপূর। সম্রাট এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসেবে কলকাতায় আগমন করেন, তখন তিনি ঈশানচন্দ্রের অধ্যাপনা শুনে মুগ্ধ হন। কোন ভারতীয়ের পক্ষে এইরূপ বিশুদ্ধ ইংরেজীতে অধ্যাপনা করার দক্ষতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দক্ষতার কথা উল্লেখ করে 'রেইস এ্যাণ্ডরায়ত' পত্রিকা লিখেছিল—"He was one of the Bengalee who before the universities were establised distinguished themselves by their proficiency in the English language. As an old Calcutta Reviwer, he wrote English like an accomplished Englishman.

শিক্ষক জীবনের সাফল্য ও আনন্দের মূর্তিমান প্রকাশ তাঁদের কৃতী ছাত্রবৃন্দ। এদিক থেকে বিচার করলে ঈশানচন্দ্রকে পরম সৌভাগ্যবান বলতে হয়। উনিশ শতকের বাঙলাদেশের সাহিত্য-শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজনীতি-স্বাদেশিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাঁরা নবচেতনার বারিনিষেক করেন, তাঁদের অনেকেই ঈশানচন্দ্রের পদতলে বসে পাঠগ্রহণ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগল দেশীয় শিক্ষকগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ঈশানচন্দ্রের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগলের কাছে অধ্যয়ন করেন। তাঁর অন্যান্য কৃতী ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলেখক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যসেবী হরেন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাচরণ সরকার, শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র দাস, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, আইনশাস্ত্রবিদ সৈয়দ আমীর আলি, প্রত্নতাত্ত্বিক নন্দলাল দে, আইন পরিষদের সদস্য ও চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহশিক্ষক ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'পিতাপুত্র' নিবন্ধে লিখেছেন "আমরা দুই পুরুষে প্রসিদ্ধ প্রফেসর ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী।" তাঁর অন্যান্য বহু ছাত্র কর্মজীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন। আধুনিক শিক্ষা

বিস্তারের জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে স্বগ্রাম গুপ্তিপাড়ায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঈশানচন্দ্রের ভাগ্য নিয়ামক মেসার্স জন পামার এ্যাণ্ড কোম্পানীর সেই সদাশয় ইংরেজ সাহেব যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই সব নানা কারণে গত শতকের শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক অবিস্মরণীয় নাম। 'ইংলিসম্যান' পত্রিকার অভিমত এই সূত্রে স্মরণযোগ্য।

"His success in imparting sound knowledge to those who had the good fortune to come under his tuition is amply testified to by his pupils themselves. Who now, for the most part, are holding with credit the highest appointments of the land, and who, no doubt, will sincerely deplore his loss, which sweeps away the last vestige of the old regime."

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুলেখক। ইংরেজী, বাংলা ও ফরাসী ভাষাতেও জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ রচনায় তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মাতৃভাষা অপেক্ষা ইংরেজী রচনাতে তাঁর পারদর্শিতা বহুবিদিত। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ Kerr সাহেবের "Review of the public Instruction in the Bengal Presidency from 1835-1851, গ্রন্থখানি বাঙলাদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কীয় একখানি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ। এই সময়ে 'Historical Register of the College' প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় Thwaytes এবং ঈশানচন্দ্রের উপর। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই এই দুইজন লেখক কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রবৃন্দের বিবরণ প্রণয়ন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ফলতঃ হুগলী কলেজের প্রথম যুগের প্রামাণিক ইতিহাস থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে তিনি এই কলেজের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত ছিলেন। এই কলেজের প্রথম শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। অনুমান করা যেতে পারে হুগলী কলেজের ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে ছিল। অথচ হুগলী কলেজের ইতিহাস বিষয়ক তাঁর স্বাক্ষরিত কোন রচনার সন্ধান আমরা পাইনি। এই কলেজে তাঁর সমসাময়িক সুহৃদদের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ও সাময়িক পত্রসেবী রেভাঃ লালবিহারী দে'র নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' নামক ইংরেজী মাসিকের বিজ্ঞাপনে এই পত্রিকার লেখক হিসেবে ঈশানচন্দ্রের নাম ঘোষণা করেন। সমসাময়িক কোন কোন পত্র-পত্রিকা 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' ঈশানচন্দ্রের সহায়তার কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে

Indian Christian Herald (June, 26, 1893) লিখেছিল—"The Rev. Lal Behari Dey in conducting his review and Magazine found in him a very able and popular writer and always valued, and counted his co-operation." কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এ ঈশানচন্দ্রের কোন স্বাক্ষরযুক্ত রচনা পাওয়া যায়নি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিনে 'হিষ্ট্রি অফ হুগলী কলেজ' প্রকাশিত হয়। রচনাটির লেখক 'one of its former masters'। অনেকের ধারণা, এই রচনার লেখক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' (জুলাই ১৮৮২) প্রকাশিত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী থেকে অবগত হওয়া যায় "regularly contributed to this magazine from the date of its appearance. Indeed there are few numbers, if any, that does not contain an article from his pen." লেখক হিসেবে মহেশচন্দ্র শুধু স্বদেশেই নয় বিদেশেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'বেথুন সোসাইটি'র সঙ্গে মহেশচন্দ্রের আত্মিক যোগাযোগ ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (২৮শে নভেম্বর) মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 'বেথুন সোসাইটি'তে 'হিষ্ট্রি অফ হুগলী কলেজ' নামক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে (৯ই এপ্রিল) মহেশচন্দ্র ঐ সোসাইটির অধিবেশনে "Effects of the English Education in Bengal" বিষয়ক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত 'হিষ্ট্রি অফ হুগলী কলেজ' নামক নিবন্ধটি সুলেখক মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের হওয়াও স্বাভাবিক। মহেশচন্দ্রও হুগলী কলেজের সূচনা পর্বের খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন। সে যাহোক, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকা সমূহের নিয়মিত লেখকরূপে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। He devoted his whole time to literary persuits and was largely connected with the press being a regular contributor to some of the Dailies of his time under the 'nomndeplume' of 'Zorian' (A. B. Patrica)। স্মিথের সম্পাদনকালে ঈশানচন্দ্র 'Bengal Hurkura' পত্রিকার 'The spirit of Native Press' নামক মনোজ্ঞ নিবন্ধমালা প্রকাশ করেন। অন্যান্য যে সব পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনাদি প্রকাশিত হত সেগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান মিরর, ইণ্ডিয়ান খৃশ্চান হেরাল্ড, রেইস এাণ্ড রায়ত, ইণ্ডিয়ান নেশন, হিন্দু পেট্রিয়ট, স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার, বেঙ্গলী, বেঙ্গল হরকরা, সংবাদ প্রভাকর, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত 'লা-পাতি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর রচনাসমূহের সঠিক বৃত্তান্ত প্রদান করা একালে এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁর রচনারাজির ভূয়িষ্ঠ অংশ স্বাক্ষরবিহীন অথবা কোন ছদ্মনামে প্রচারিত হয়েছিল। সেকালের ঐ সব পত্র-পত্রিকার ফাইল এখন আর সহজলভ্য নয়। এ সব নানা কারণে লেখক হিসেবেও তাঁর অবদানের কথা একালে প্রায় অস্বীকৃত। বাঙলাদেশ ও বাঙালীর অন্তরলোকে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুগভীর প্রভাব এবং তাঁর চিন্তা ও মননের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এদেশে এখনও সম্যক অনুসন্ধান হয়নি।

আজীবন শিক্ষাব্রতী ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ সংস্কৃতির যে যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন, সে সময় যোগ্য ও কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের অভাব ছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে মেকলের নাম চিরস্মরণীয়। ১৮৩৫ (৭ই মার্চ) খৃষ্টাব্দে শিক্ষাধিকারের সাধারণ সমিতি কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষাবিষয়ক মেকলের প্রস্তাব অনুমোদিত হলে ঈশানচন্দ্র তাঁকে আলোর অগ্রদূত বলে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের উষালগ্নে ঈশানচন্দ্র নব্যবঙ্গের মনোজগতে সুগভীর অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর দক্ষতার কথা 'সমাচার দর্পণে'ও লক্ষ্য করা যায়। 'সমাচার দর্পণ' (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৬) হুগলী কলেজ সংবাদে লিখেছিল—"সুবিচক্ষণ সজ্জন স্বধর্মপরায়ণ শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি পূর্বে নিখিলগুণযুক্ত শ্রীযুক্ত স্মিত সাহেবের নূতন কলেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহার বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপাট্যতা দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তদীয় তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলস্যস্বরূপ শয্যা হইতে উঠিয়া জ্ঞানরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেক ;" শিক্ষক হিসেবে তাঁর এই সুখ্যাতির জন্য তিনি প্রগতিবাদী ব্রাহ্মগণের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষাপ্রচারে ঈশানচন্দ্র আহূত হতেন। বাঁশবেড়িয়ায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় বাঙলাদেশের বহু কৃতী ব্যক্তির সঙ্গে ঈশানচন্দ্রকেও আহ্বান করা হয়। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা," (১লা মাঘ ১৭৬৬ শক)। যুগের আহ্বানে ইংরেজী শিক্ষাকে বরণ করলেও স্বদেশের চিরায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণতার এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের যুগে ঈশানচন্দ্রের বিবেক-বুদ্ধি ও উদার মানসিকতা তরুণ শিক্ষার্থী মহলে নবমন্ত্রের বীজ রোপন করে। ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচারের সর্বপ্রকার

কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি জীবন সংগ্রাম করেছেন। স্বদেশ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের অভিনব জয়যাত্রায় তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ও সাধনা বাঙলার নবজাগরণের চরিত্র লক্ষণকে গাঢ়বর্ণে রঞ্জিত করেছিল। তাঁর সমকালীন অথবা কিছু পরবর্তীকালে রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচরণ সরকার, বোয়ালিয়ার হরগোবিন্দ সেন এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যবঙ্গের পথিকেরা তাঁর আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করে তোলেন। এঁদের হাতে গড়া তরুণ সমাজ বাঙলার নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করে তোলেন। বাঙলার রেণেসাঁকে নিয়ে এদেশে চিন্তা-চর্চা কম হয়নি; কিন্তু এই জাগরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কালে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত যুগপথিক শিক্ষকবৃন্দের চিন্তা-মনন ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন না হলে রেণেসাঁর মর্মবাণীর সম্যক আস্বাদ হয় না।

উল্লেখ পঞ্জী ঃ

1. J. N. Sarkar. Hist. of Bengal, voll. II (D. V. 1948)
2, Nineteenth Century Studies. (April. 73)
3. K. Zachariah. Hist. of Hooghly College (1936)
4. Hooghly College Register (1936)
5. Lokenath Ghosh. The Modern His. of Indian Chiefs, Rajas and Zamindars etc. vol. II (1881)
6. J. Kar Review of the Public Instruction in the Bengal Presidency from 1835 to 1851.
7. William Adam Report of the State of Education in Bengal 1835—1838. Ed. by A. N. Basu (C. U, 1941)
8. The Bengal Magazine, July, 1882
9. Indian Christian Herald. June 26, 1893.
10. K. P. Sengupta. The Christan Missionaries in Bengal (Cal. 1971)
11. The Englishman, June 20, 1893
12. The Indian Nation, June 19, 1893
13. Reis and Rayyat, June 17, 1893
14. Amrita Bazar Patrika, June 20, 1893
15. Krishnanath College Centenary Comemoration voll. (1954)

16. যোগেশচন্দ্র বাগল। বেথুন সোসাইটি (১৩৬৭)।
17. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২য় খণ্ড (৩য় সং ১৩৫৬)।
18. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যা, যা, চ. ১৩৪৯)।
19. সুধীর কুমার মিত্র। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ। ২য় খণ্ড (২য় সং ১৩৬০)।
20. অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পিতা-পুত্র, বঙ্গভাষার লেখক (হরিমোহন) ১৩১১।
21. T. N. Talukdar, N. K. Majumder. Hist. and Register of Krishnanagar College, 1950.
22. Lalbehari Dey, Recollection of Alexander Duff, London 1879.
23. Thomas Smith, Alexandar Duff. London, 1883.

প্যারীচরণ সরকার

নবযুগের বাঙলাদেশে প্যারীচরণ সরকার একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শুধু শিক্ষক হিসেবেই নয়—সেকালীন বাঙলাদেশের জাগৃতি-জাতীয়তা এবং ঊর্মিমুখর ভাবান্দোলনের অতল গভীরে তিনি নিজেকে বিলীন করে দেন। এদেশের নূতন শিক্ষা প্রসার ও স্বাধীনতা বিস্তারের পদসঞ্চারণের ইতিহাসে প্যারীচরণের নাম অম্লান মহিমায় বিরাজ করবে। প্যারীচরণ ছিলেন নূতন বাঙলাদেশ নির্মাতাদের অন্যতম। একাধারে মহানুভব কর্মবীর ও জ্ঞানযোগী এই ভারত সন্তানের সর্বাঙ্গীন পরিচয় বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের অভিপ্রেত নয়—বোধ করি সম্ভবও নয়। সেকালের শিক্ষক সমাজে প্যারীচরণের কীর্তি ও অবদানের দিকটাই আলোচনার লক্ষ্য। এই সূত্রেই তাঁর সুমহান্ জীবনের চিত্রের গৌরবের আরও দু-একটা রশ্মি হয়ত আভাসিত হয়ে উঠবে।

প্যারীচরণের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল কৃষ্ণনগরে। সপ্তদশ শতকের প্রত্যূষলগ্নে এ বংশের বীরেশ্বরদাস হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া আটপুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে বসবাস করতে থাকেন। বীরেশ্বর নবাব সরকারে কাজ করে 'সরকার' উপাধি পান। বীরেশ্বরের পৌত্র শিবরাম জীবন সায়াহ্নে কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন। সে ১৭৯১ সালের কথা। শিবরামের দুই পুত্র তারিণীচরণ ও ভৈরবচরণ। উভয় ভ্রাতাই থ্যাকার' কোম্পানীর অফিসে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তারিণীচরণ এই অফিসের বেনিয়ান নিযুক্ত হন। ভৈরবচন্দ্র এই অফিসের কাজ ছাড়াও জাহাজের রসদ সরবরাহ করতেন। চোর বাগানের গোকুলচন্দ্র বসুর পুত্র ভৈরবচন্দ্র বসুর একমাত্র দুহিতা 'দ্রবময়ীর' সঙ্গে ভৈরবচন্দ্রের বিবাহ হয়। ভৈরবচন্দ্রের সহধর্মিণীর রূপ-গুণের অবধি ছিল না। ভৈরবচন্দ্র ১৮৩৮ সালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বৎসরেক কাল মধ্যে তারিণীচরণও ইহধাম ত্যাগ করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের গর্ভধারিণী 'ধনমণি' আরও দশ বৎসর পরে ১১৫ বৎসর বয়সে কাশী লাভ করেন।

পুণ্যশ্লোক প্যারীচরণ সরকার ছিলেন ভৈরবচন্দ্র সরকারের তৃতীয় পুত্র। তিনি বঙ্গীয় ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ, ইংরেজী ১৮২৩ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী কলকাতায় মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহের এই বাটী পরবর্তীকালে প্যারীচরণ সরকার এবং আরও পরে ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের বাটীরূপে

পরিচিত হয়। প্যারীচরণের পৈতৃক বাসস্থান এর সন্নিকটে। প্যারীচরণের শৈশব ও বাল্যকাল গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাঁর অপর ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পার্বতীচরণ, মধ্যম প্রসন্নকুমার, কনিষ্ঠ রামচন্দ্র। প্যারীচরণ তাঁর প্রথম শিক্ষার পাঠ নিলেন জননী 'দ্রবময়ী' এবং প্রথমাগ্রজ পার্বতীচরণের কাছে। পার্বতী-চরণ হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং সুশিক্ষক হিসেবে তৎকালীন বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

প্যারীচরণের প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হোল হেয়ার সাহেবের পাঠশালায়। এই পাঠশালায় প্যারীচরণের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। একাদশ বয়ঃক্রমকালে প্যারীচরণ ঢাকায় জ্যেষ্ঠাগ্রজ পার্বতীচরণের কাছে গমন করেন। পার্বতীচরণ সে সময় ঢাকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্যারীচরণ ঢাকাতে বৎসর-খানেক পড়াশুনা করেন। পরে কলকাতায় ফিরে আসেন। পুনরায় ভর্তি হন 'হেয়ার সাহেবের স্কুলে'। প্রতিষ্ঠা লগ্নে 'হেয়ার স্কুলের' নাম ছিল, 'স্কুল বুক সোসাইটির স্কুল'। 'প্রিপারেটরী স্কুল' 'পটলডাঙ্গা স্কুল' এ সব নামগুলোও প্রচলিত ছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র, এই বিদ্যালয়কে 'চাঁপাতলা স্কুল' বলে উল্লেখ করেছেন। 'হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল' বা নিছক 'ব্রাঞ্চ স্কুল' নামেও এর পরিচিতি ছিল। ১৮৪১ সালের শেষ দিকে 'হেয়ার স্কুল' 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' নামে পরিচিত হয়। পরে ১৮৬৭ সালে সুখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয় "হেয়ার স্কুল" নামে অভিহিত হয়। ঢাকা থেকে ফিরে এসে প্যারীচরণ এই বিদ্যালয়ে তিন বৎসব অধ্যয়ন করে বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছাত্রের গৌরব লাভ করেন। সে যুগে ডেভিড হেয়ার ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাত তপন। এই বিদ্যালয়েই প্যারীচরণ হেয়ার সাহেবের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁর নিত্য সাহচর্যে প্যারীচরণের কোমল হৃদয়ে হেয়ার সাহেবের চরিত্র ও মহত্বের ছায়াপাত ঘটে। প্যারীচরণ মহাত্মা হেয়ারের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জীবন্ত আদর্শগুলি প্রত্যক্ষ করে সেই দেবদুর্লভ গুরুর গরিয়সী শিক্ষা আপনার মধ্যে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত করে নেন।

১৮৩৮ সাল, প্যারীচরণ 'হেয়ার স্কুল' থেকে 'জুনিয়র স্কলারশিপ' পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হলেন এবং ৮৲ টাকা বৃত্তিলাভ করলেন। এর পরেই হিন্দু কলেজের ছাত্রব্রত। হিন্দু কলেজের প্রথম থেকেই প্যারীচরণ উৎকৃষ্ট ছাত্র। সে সময়ে হিন্দু কলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন ফরাসী দেশীয় V. L. Rees। তাঁর মত গণিতাধ্যাপক তখন এদেশে কেউ ছিলেন না। Captain D. L.

Richardson ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর সহপাঠী গোপালকৃষ্ণ ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র। কিন্তু কৈশোরেই তিনি লোকান্তরিত হন। হিন্দু কলেজে তাঁর অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, দুর্গাচরণ লাহা, ঠনঠনিয়ার ধনাঢ্য বণিক মাধবচন্দ্র দত্ত, ও যোগেশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে বহুভাষাবিৎ সুপণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুচরণ চক্রবর্তী, ভোলানাথ দত্ত, বিমলচরণ দে প্রভৃতি। ১৮৩৯ সালের মধ্যভাগে প্যারীচরণ হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় গণিতে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। এডুকেশন কাউন্সিলের বার্ষিক রিপোর্টে দেখি—"Hindoo College—3rd class. In Algebra they were tried on 3 questions in quardratic equations; Peary Churn Sircar answered the 3 questions correctly and to him the Mathametical prize was awarded."১

প্যারীচরণের পূর্ববর্তীকালে 'সিনিয়র স্কলারশিপ' পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়নি। সে সময়ে হিন্দু কলেজে সিনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে "সার্টিফিকেট অব মেরিট্" প্রদান করা হোত। ১৮৪০ সালে শিক্ষাসভা সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। এই বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর ১৮৪১ সালের বর্ষশেষে সর্বপ্রথম সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম বৎসরের এই পরীক্ষায় প্যারীচরণ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে ৪০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। এই বৎসরে হিন্দু কলেজের আরও চৌদ্দ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তি দু-বৎসর যাবৎ উপভোগ্য বা কার্য্যকরী ছিল। ১৮৪২ সালের সর্বশেষে প্যারীচরণ পুনরায় সিনিয়র স্কলারশিপ বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বৎসর নূতন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পর বৎসর অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৩ সালে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্যারীচরণ পুনরায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শিক্ষা-সভার ক্রমান্বয় তিন বৎসরের রিপোর্টে, কোনবার তাঁর প্রশ্নপত্রের উত্তর বা কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোল। এইরূপ তিন বৎসর যাবৎ প্যারীচরণ মেধাবী ও

১ Report of the Council of Education 1840.

অধ্যয়নপটু সহাধ্যায়ী ও নব নব প্রতিভাবান্ প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে আপনার উচ্চ সম্মান রেখে চললেন।

এই সময় প্যারীচরণ আরও ক'টি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে তৎকালীন হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে বৎসর সিনিয়র স্কলারশিপ বৃত্তি পরীক্ষার প্রবর্তন হয়, সেই ১৮৪০ খৃষ্টাব্দেই শিক্ষাসভা দেশীয় প্রতিভাবান্ ছাত্রগণের উচ্চবিদ্যাশিক্ষার আকাঙ্খা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করবার জন্য লাইব্রেরী-পদক পরীক্ষার (Library Medal Examination) প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ পুস্তাকাগারের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে, যে ছাত্র সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচয় দিতে সক্ষম হতো, তিনিই এই পারিতোষিকলাভের অধিকারী হতেন। এই পরীক্ষায় কোন নির্দিষ্ট পুস্তক বা বিষয় ধার্য ছিল না। সেজন্য পরীক্ষার্থীদিগকে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করতে হোত। এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্যারীচরণ তিন বৎসর কাল অভিনিবেশ সহকারে পাঠে লিপ্ত থাকেন এবং অসাধারণ স্মৃতি ও ধীশক্তির গুণে তিনি এই পরীক্ষায় চরম সাফল্য প্রদর্শন করেন। প্যারীচরণের এই জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় লাভ করে তৎকালীন শিক্ষাসমিতির সভাপতি ও বড়লাটের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ক্যামেরন সাহেব তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে পড়েন।

জুনিয়ার বৃত্তি-পরীক্ষার পর থেকে প্যারীচরণ চোরবাগানে মাতুলালয় গোকুল চন্দ্র বসুর বাড়ীতে বাস করতেন। সে সময় এই বাড়ী ছিল সরস্বতীর পীঠস্থান। এখান থেকেই প্যারীচরণের জ্যেষ্ঠাগ্রজ পার্বতীচরণ সরকার ও ঝামাপুকুরের তারকনাথ ঘোষ প্রাচীন হিন্দু কলেজের 'রত্ন' বিশেষ বলে সুখ্যাতি লাভ করেন। সম্পর্কে মাতুলপুত্র কৈলাসচন্দ্র বসুও সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে সুধীসমাজের সমাদর লাভ করেন। প্যারীচরণ ও কৈলাসচন্দ্র বসু একত্রে বিদ্যানুশীলন করতেন। ১৮৪৩ সাল। এই বৎসর প্যারীচরণ হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। কলেজ পরিত্যাগ কালে প্যারীচরণ হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় ও জ্ঞানবান্ ছাত্র হিসেবে সমসাময়িকদের অভিনন্দন লাভ করলেন। ছাত্রজীবন থেকে প্যারীচরণ ইংরেজী নিবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। এ সময়ে তিনি অনেক মূল্যবান ও অচিন্তিতপূর্ব ইংরেজী নিবন্ধ লিখে পারিতোষিক লাভ করেন। ১৮৪১-৪২ ও ১৮৪৩-৪৪ সালের এডুকেশন রিপোর্টে প্যারীচরণের একাধিক ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

হিন্দু কলেজ থেকে বিদায়লগ্নে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ এবং

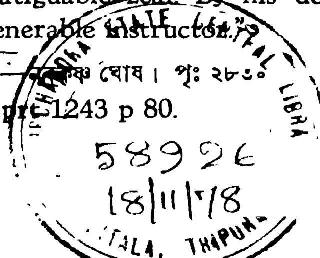
শিক্ষাসভার সদস্যগণ প্যারীচরণকে অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করে সম্মানিত করলেন। ১৮৪৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে অধ্যক্ষ J. Kerr M. A. প্রধান শিক্ষক G. Lewis এবং আরও অন্যান্য সদস্যগণ স্বাক্ষর প্রদান করেন। ইংরেজী অধ্যাপক Captain D. L. Richardson গণিতাধ্যাপক V L. Rees অধ্যক্ষ J. Kerr প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দ প্যারীচরণ সম্পর্কে গভীর প্রশংসাজ্ঞাপক পৃথক পৃথক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এই সমস্ত পত্রের প্রতিলিপি তাঁর জীবনীগ্রন্থে উৎকলিত আছে।২ গণিতাধ্যাপক V. L. Rees তাঁর প্রশংসাজ্ঞাপক পত্রখানিতে লিখেছিলেন—"The mathematical acquirements of Babu Peary Churan Sircar, pupil of the class, are of the highestordr. Only few are his equals.'

আপাতদৃষ্টিতে প্যারীচরণের গৌরবময় ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে জীবন-ব্যাপীই তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ী ছাত্র হয়ে রইলেন। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি গভীরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন। বিষাদের কালো মেঘ তাঁর সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ১৮৪২ সালে কলেজ ত্যাগের আগেই উনিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্যারীচরণ বিবাহ করলেন। পাত্রী হাটখোলার রাজা শিবনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা। শিবনারায়ণ রাজা মানিক বসুর বংশধর। কিন্তু তাঁর যৌবনের এই আনন্দগান দুঃখের প্লাবনী ধারায় বিধৌত হয়ে গেল। ১৮৪৩ এর ১১ই নভেম্বর তাঁর প্রথমাগ্রজ চিরপ্রিয় সহোদর পারতীচরণ মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে পরলোকগমন করেন। পার্বতীচরণ হিন্দু কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সেকালীন শিক্ষা বিভাগে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ও ঢাকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি অতি অল্প বয়সেই যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পার্বতীচরণের মৃত্যুতে শিক্ষাসভা শোক প্রকাশ করে যে প্রশস্তি লিপি লিখেছিল তার দু একটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"He was for upwards of six years at the head of the School (Hooghly Branch School) and discharged the duties of his situation with ability and indefatiguable zeal. By his death the education service has lost a venerable instructor."৩

২ প্যারীচরণ সরকার (১৩০৯)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃঃ ২৮৩০

৩ Bengal Educational Report 1243 p 80.



সংসার ও পরিবার পরিজন প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব এসে গেল প্যারীচরণের উপর। কিন্তু অন্য কোন অর্থকরী চাকুরী তাঁকে আকৃষ্ট করতে বিফল হ'ল। বিদ্যাবিতরণের মহৎ ব্রত তাঁর জীবন ও জীবিকায় উন্মাদনা এনে দিল। পার্বতী-চরণের মৃত্যুতে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়েছিল। তিনি ঐ পদের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু এই আবেদন পত্র তাঁকে প্রত্যাহার করে নিতে হ'ল। কারণ পার্বতীচরণের স্নেহাস্পদ ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সে সময় হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক। হিন্দু কলেজের অদ্বিতীয় ছাত্র প্যারীচরণ আবেদন প্রত্যাহার না করলে ক্ষেত্রমোহন প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হতে পারবেন না। প্যারীচরণ বন্ধুর উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টির লোক ছিলেন না। সেজন্য তিনি ক্ষেত্রমোহনের অনুকূলে দু-শত টাকার প্রধান শিক্ষকের পদ বিনা দ্বিধায় ছেড়ে দিলেন এবং পরিবর্তে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করলেন—এ পদের বেতন ৮০ টাকা। ১৮৪৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারীচরণ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। শিক্ষা বিভাগের সেবকরূপে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। তাঁর মধ্যমাগ্রজ প্রসন্নকুমার সরকার সে সময়ে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের ৫ম শিক্ষক। প্রতীচ্য বিদ্যায় নিষ্ণাত প্যারীচরণ অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ সাদারল্যাণ্ড প্রশংসাসূচক পত্রে প্যারীচরণকে উৎসাহিত করলেন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দু' বছর দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে কাজ করার পর তাঁর পদোন্নতি ঘটল। ১৮৪৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর দেড়শত টাকা বেতনে তিনি বারাসত গভর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদাভিষিক্ত হয়ে হুগলী ত্যাগ করলেন।

বারাসত স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন ১লা জানুয়ারী, ১৮৪৬। প্যারীচরণ কার্যত ঐ দিনেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। প্যারীচরণ বারাসত স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বিদ্যালয় নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম তিন বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হ'ল। বারাসতে কার্যকালে সি, ভি, ট্রেভর ও এলফিনষ্টোন জ্যাক্‌সন্ পর পর ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এলেন। এই দু'জনেই বিদ্যালয় কল্যাণবিধায়ক কাজে পোষকতা করতে থাকেন। প্যারীচরণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিদ্যালয়ের আশাতীত উন্নতি ঘটল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চতুর্থ বৎসরে L. Lodge বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রদর্শন করেন।

এ বছরেই জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ এলফিনষ্টোন্ জ্যাক্সন্ শিক্ষা সভার রিপোর্টে বারাসত স্কুলের বাৎসরিক উন্নতি প্রসঙ্গে লিখলেন—

"I must however bring to the particular notice of the Council, unremitted exertion of the Headmaster Babu Peary Charan Sircar, to promote the welfare of the school. His whole attention is turned to its improvement. His unceasing endeavours to instil knowledge into the boys in school, is only equalled by his great kindness to them out of school. The pupils looked on him of a friend as well as an instructor"[৪]

প্যারীচরণের কায়িক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রমে অচিরকাল মধ্যে বারাসত স্কুল বঙ্গদেশীয় স্কুলসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। বিদ্যালয়ের দর্শনশ্রী ও পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যেরও সীমা ছিল না। এ সম্বন্ধে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ নব্য ভারতে প্রশস্তি লিখেছিলেন।[৫]

কেবলমাত্র বারাসত স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির মধ্যেই তাঁর কর্মধারা সীমাবদ্ধ ছিল না। নবজাগরণের বাঙলাদেশে নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের পুরোবর্তী নায়ক ছিলেন প্যারীচরণ। বারাসতেই আধুনিক শিক্ষার প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা হাতে নিয়ে বাঙলাদেশকে সচকিত করে তুললেন। বাঙলাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচরণ নিঃসন্দেহে অন্যতম যুগনায়ক। তিনি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের সতীর্থ সহযাত্রী।

বারাসতে প্যারীচরণ বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম কৃষি বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস স্থাপন করলেন। বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচরণ এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ ও আগ্রহে উদ্বোধিত হয়ে, বারাসতে বঙ্গের প্রথম গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমস্ত মহৎ কর্ম প্রবর্তনের সময় তিনি বারাসতে দু'জন পরম বন্ধুর সহায়তা লাভ করেন। একজন বারাসতের চিরগৌরব সুপণ্ডিত কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং অপর জন

৪ Report of the public Instruction of Bengal, 1848-49 p-168,

৫ নব্যভারত। চৈত্র—১৩০৬

কালীকৃষ্ণ অগ্রজ প্রথিতনামা ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র। এছাড়া, একদা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিচারপতি সি-ভি ট্রেভর শিক্ষা প্রসারে প্যারীচরণের বন্ধু ছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে প্যারীচরণ বারাসতকে কেন্দ্র করে নবযুগের অভ্যুদয়কে ভাস্বর করে তুললেন। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার নানা বীজ বপন করলেন তিনি। বঙ্গের প্রথম কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি যে দূরদৃষ্টি দেখিয়েছিলেন —তা এ যুগেও অনুধাবনযোগ্য। বাঙলাদেশে শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন।

১৮০২ সালে বারাসতে বঙ্গের প্রথম ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করে তিনি অগ্রপথিকের দায়িত্ব পালন করেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্যারীচরণ জীবন ব্যাপী প্রচেষ্টা করে গেছেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সুখ্যাত প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বারাসতে বঙ্গের প্রথম গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হ'ল। এর পূর্বে ১৮২০ সালে স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যমে কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বীটন্ সাহেবের স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৪৯ সালে বীটন্ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বারাসতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্যারীচরণ সমাজচ্যুত হন। প্যারীচরণ বারাসত স্কুল কমিটির সম্পাদক হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। তিনি বারাসত বালিকা বিদ্যালয় কমিটিতেও সদস্য নির্বাচিত হন। বারাসতে Experimental Class-এর প্রবর্তন করে ছাত্রপ্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন—The establishment of the Experimental Class is a note-worthy event in the history of the advancement of English education in the country.৬ সাহিত্য-চর্চা, জ্ঞান-চর্চা, বক্তৃতা প্রভৃতির উন্নতি কল্পে প্যারীচরণ বারাসতে 'বীটন্ শাখা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯ সালে বালিকা বিদ্যালয় কমিটির প্রচেষ্টায় বারাসতে 'শ্রমজীবিদিগের বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্যতঃ প্যারীচরণের ঐকান্তিক সাধনা ও কর্মনিষ্ঠার ফলে বারাসত নবশিক্ষার বোধন কেন্দ্রে পরিণত হয়ে উঠল।৭

প্যারীচরণ স্কুলে ৯ বৎসর প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৫৪ সালে

৬ Life of Peary Charan Sircar (1914). M. N, Sircar. M. A. B. L. p-37

৭ Bengal Education Report 1851-52. p-146-149

প্যারীচরণ কলিকাতা 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে' বদলি হয়ে এলেন। ১৮৮৩ সালে 'বারাসত স্কুলের বিস্তৃত বার্ষিক বিবরণী'তে কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় যা লিখেছিলেন তার দু'একটি কথা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য—

"The present flourishing state of the Barasat School, being attended by upwards of 200 boys tells of the high opinion which the people of the piace entertain of Babu Peary charn Sircar. . .His exertions in the cause of native female education and for instructing in the rudiments of knowledge have been unceasing. Though great success, as is to be expected, has not attended them yet praise in due for the attempt"

প্যারীচরণ ১৮৫৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম তারিখে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (হেয়ার স্কুল) প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। তাঁর দক্ষ নায়কত্বে বিদ্যালয়ে যুগান্তর এল। এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করল। প্যারীচরণের শিক্ষা-নৈপুণ্য ও কার্যদক্ষতার জন্য গভর্ণর স্যার জন পিটার ও শিক্ষা অধিকর্তা এটকিন্‌সনের প্রস্তাব মত প্যারীচরণকে ৫০০টাকায় পুবস্কৃত করা হোল। কলিকাতার কর্মক্ষেত্রে প্যারীচরণ আধুনিক শিক্ষা বিস্তাব আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে যুক্ত করে ফেললেন। বিদ্যালয়ে আদর্শ পাঠ্য পুস্তকেব একান্ত অভাব। বারাসতে অবস্থান কালে প্যারীচরণ বালক ও শিশুপাঠ্য ইংরেজী পুস্তকের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেন। ১৮৫০ সালে তিনি First Book of Reading পুস্তকখানি প্রণয়ন কবেন। এক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে যোগদান করার আগেই অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে তাঁর First Book of Reading এই বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়। প্যারীচরণের সুহৃদ ও গুণগ্রাহী কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলেব শিক্ষক প্রসন্নকুমার গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন। ১৮৫৬ সালে পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্যারীচরণের পুস্তকেব আদর্শানুযায়ী অন্যান্য পুস্তক প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান করেন। প্যারীচরণের First Book কেবল বাঙলা দেশে নয়—ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রবর্তিত হয়। ১৮৭৩ সালে বড়লাট নর্থব্রুক বালক ও শিশু পাঠ্য পুস্তকাবলীর উপযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নির্দ্দেশ দেন। ঐ কমিটির সদস্যবৃন্দ শিক্ষা অধিকর্তা এটকিন্‌সন্ সাহেবের কাছে প্রদত্ত রিপোর্ট (১৮৭৪, ২রা মার্চ) প্যারীচরণের

পুস্তকাবলীকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করে লেখেন—"On the whole, the best we have seen for the lower classes.' তদবধি Sir Roper Lethbridge K.C.I.E মহোদয়ের ন্যায় বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ইংরেজ উক্ত পুস্তকখানিকে সম্পাদন ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন।

প্যারীচরণের আমলে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টাতে শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি ঘটে—ছাত্রদের সুখ সুবিধার জন্য টানা পাখার প্রবর্তন হয়—মাতৃভাষায় ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। প্যারীচরণের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের নাম 'হেয়ার স্কুলে' রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৭ সালে গভর্ণর স্যার উইলিয়ম্ গ্রে বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসেন এবং প্যারীচরণ সে সময়ে এক স্মারক লিপিতে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের যুক্তিযুক্ততার কথা উল্লেখ করেন। তদনুসারে বিদ্যালয়ের নাম হয়, 'হেয়ার স্কুল' ৮ কলকাতায় 'ইডেন হিন্দু হোষ্টেল' প্রতিষ্ঠা তাঁর অনন্যকীর্তি। বারাসতে বঙ্গের প্রথম ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেছি। কলকাতাতেও তিনি একটি ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। প্যারীচরণ গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট একটি ছাত্রাবাস স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করলেন। রাজকীয় সহানুভূতি লাভ করে লালবাজারে ৪৫ জন ছাত্রের বাসোপযোগী একটি ছাত্র-নিবাস স্থাপিত হোল। প্যারীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার ও তদীয় বন্ধু দীননাথ ধর ছাত্রাবাসের অবৈতনিক চিকিৎসক ও পরিদর্শক নিযুক্ত হলেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক নীলমণি চক্রবর্তী ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পেলেন। পরে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এটকিন্‌সন্ সাহেবের অনুরোধে ১৮৬২ সালের জুন মাসে গভর্ণমেণ্ট ছাত্রাবাসের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। প্যারীচরণ প্রতিষ্ঠিত সেই ক্ষুদ্র ছাত্রাবাস কালক্রমে গভর্ণমেণ্ট ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে 'ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে" পরিণত হয়। একালের তরুণ সমাজ প্যারীচরণের এই স্মরণীয় কীর্তির কথা সম্ভবতঃ বিস্মৃত হয়েছেন।

হেয়ার স্কুলের শিক্ষাধিনায়করূপে প্যারীচরণ কলকাতায় আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের আন্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি "চোরবাগান প্রিপারেটরী স্কুল" "চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়" এবং "ইডেন হিন্দু হোষ্টেল" স্থাপন করেন। ১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান স্কুল প্রতিষ্ঠা

৮ David Hare (1968) Radharam Mitra. p-13,

করলে প্রিপারেটরী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয়। বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি বিধানের উপায় নির্দ্ধারণার্থে তৎকালীন প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল পরিদর্শক উডো সাহেবের পরামর্শে ১৮২৪ সালে গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি স্থাপন করেন। এই কমিটিতে সাতজন সদস্যের মধ্যে একমাত্র প্যারীচরণ ব্যতীত সকলেই ছিলেন ইংরেজ।

১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সী কলেজের History and Political Economy বিভাগে Asstt, Professor-এর পদে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রইল। পরবর্তী বৎসরে তিনি ঐ পদে confirmed হলেন। এসময়ে তাঁর মাসিক বেতন ৫০০ টাকা। ১৮৭৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের স্থায়ী অধ্যাপকের সম্মান লাভ করে Graded Service-এর পর্যায়ভুক্ত হলেন। প্যারীচরণের পূর্বে এই পদে একজন মাত্র ভারতীয় উন্নীত হয়েছিলেন। এ সময়ে প্যারীচরণের বেতন ৭৫০ টাকা। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও তিনি অশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। অধ্যাপনাসূত্রে মাঝে মাঝে গণিত শাস্ত্রেও তিনি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। তাঁর অধ্যাপনার কথা বলতে গিয়ে সেকালের একখানি পত্রিকা লিখেছিল—

"It was a sight to see him explain the most difficult passages in Prose and Poetry, illustrated by classic allusions and ancedotes. Whatever he taught he thoroughly impressed on the minds of his students. The secret of his success as a teacher was the familiarity with which he treated his pupils".[১]

ছাত্র ও অধ্যাপক সমাজে তিনি ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগার ভবনে আজও প্যারীচরণের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র শোভিত আছে। সেকালের ছাত্র সমাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্মৃতি বহন করে চলেছে এই তৈলচিত্র খানি।

কলকাতার কর্মজীবনে ১৮৬৫ সালে প্যারীচরণ একটি "বালক সম্মিলন" (Juvenile Association) প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য সুনীতি সদ্ব্যবহার শিক্ষা এবং পরস্পরের মধ্যে আনন্দ প্রদান। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজেও অনুরূপভাবে "Students' Association" স্থাপন করেন। ১ ৪১ খৃষ্টাব্দে মহামতি

১ The Hindu Patriot. 4th, October, 1873.

বীটন সাহেব "Bethune Girls School" প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচরণ এই বিদ্যালয়ের একজন অক্লান্ত সেবক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তিনি বীটন সাহেবের সহকর্মী ছিলেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বে বারাসতে তিনি সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পথিকৃত হিসাবে পথ নির্দেশ করেন। ১৮৭৩ সালে প্যারীচরণ সরকার "বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের" কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ সালে তিনি নিজ প্রচেষ্টায় চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় অধুনা, "প্যারীচরণ বালিকা বিদ্যালয়" নামে প্রসিদ্ধ।

আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্যারীচরণ সরকার নিঃসন্দেহে নব্য বঙ্গের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। সমাজ সংস্কার, পত্রিকা সম্পাদন, মাতৃভাষা চর্চা ও মানবিকতার প্রসারে তিনি ছিলেন নিরলস সাধক। সুরাপান সেকালে সমাজ স্বাস্থ্যের মস্তবড় প্রতিবন্ধক ছিল। প্যারীচরণ যে কালের বাঙলা-দেশের আলো বাতাসে মানুষ, সেকালে মদ্যপান ব্যতীত কেউই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেত না। প্যারীচরণ বাল্যকালেই সুরাপানের বিপক্ষ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এ বিষয়ে মহাত্মা হেয়ার ছিলেন তাঁর মন্ত্রদাতা গুরু। 'সমাজকে মাদকদ্রব্য বর্জনে দীক্ষিত করতে হবে'—এই কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৮৬৩ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি "বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ" বা The Bengal Temperance Society প্রতিষ্ঠা করলেন। প্যারীচরণ ছিলেন এই সভার সম্পাদক। রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আজিমুদ্দিন খাঁ, বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বেঙ্গলী সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্টদাস পাল প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণ এই সভার সদস্য, হিতৈষী ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। প্যারীচরণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সভার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। Rev. C. H. Dall এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার উন্নতিকল্পে প্যারীচরণ "Well wisher" ও "হিতকরী" নামক দুখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। পত্রিকা দুখানি ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত প্রচারিত ছিল। ১৮৭৩ সালে সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন পালিত হয়। ইহাই প্যারীচরণ কর্তৃক আহূত শেষ অধিবেশন। ১৮৭৪ সালে তিনি "The Tree of Temperance" নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে পারেনি। প্যারীচরণ প্রবর্তিত এই সামাজিক আন্দোলন দেশ ও জাতিমানসে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার

করেছিল। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছিলেন "It set the tide of public opinion against intemperance." দীনবন্ধু মিত্র সুরধনী কাব্যে লিখলেন—

চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ
যাহার ইংরেজী বই পড়ে শিশুগণ।
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ
হীনমতি সুরাপান বিষম শাসন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচরণের কৃতিত্বের দিকগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে লিখলেন—

No man was better qualified to lead the movement than a teacher of youth so universally respected as Peary Charn Sircar,,.... ..and the gentle headmaster of the Colootola Branch School had been gifted by nature with what are believed to be incompatible qualities, a child-like simplicity and a fascinating amiability, combined with the firmness and strength of a leader of men.১০

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখেছেন—He was one of the greatest Teachers of Youth that Bengal has produced" বিধবা-বিবাহ প্রচারে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী। সেকালের সব ক'টি বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের পাশে। সমাজ সংস্কারে তিনি ইউরোপীয় অনুকরণের প্রশ্রয় দেননি। ১২৮২ সালের 'বঙ্গ মহিলার' ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় রমণীকুলের হিতার্থে তিনি যে নিবন্ধ প্রকাশ করেন তা তাঁর সমাজ সচেতনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বদেশী যুগের উষালগ্নে 'হিন্দুমেলার' আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় অভিযাত্রী।

'Well wisher' ও 'হিতকরী' সম্পাদনায় প্যারীচরণের সাময়িক পত্র সম্পাদনার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়েছি। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা' মাসিক পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়। এই পত্রিকাখানির পিছনে প্যারীচরণ ছিলেন গুরুর ভূমিকায়।

১০ A Nation in Making. (2nd Edn. 1963) Sir S. N. Banerjee.

"এডুকেশন গেজেট" সম্পাদনা তাঁর সাময়িক পত্রিকাসেবী জীবনের অন্য কীর্তি। ১৮৫৬ সালের ৪ঠা জুলাই পত্রিকাখানির আবির্ভাব। Hodgeson Pratt সাহেবের প্রস্তাব মত পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪ সালে গেজেট পরিবর্দ্ধিত আকারে ও নতুন নিয়মে পরিচালিত হতে থাকে। ১৮৬৬ সালে Rev W O'Brien Smith পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরের ৩রা মার্চ (১২৭২ চৈত্র) এট্‌কিন্‌সনের পরামর্শমত প্যারীচরণকে সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৮ সালে শ্যামনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে রেলদুর্ঘটনা সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশ করলে ছোটলাট Sir William Grey অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে প্যারীচরণ স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেন। প্যারীচরণ আত্ম-মর্যাদাকে রাজানুগ্রহ এবং আত্ম সুখ-দুঃখ অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু বলে বিবেচনা করতেন। এই সূত্রেই তিনি "গেজেট" সম্পাদনার চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন। পরে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজীবন ঐ পত্রের সম্পাদনা করেন। পত্রিকা সম্পাদনায় প্যারীচরণ নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। উনিশ শতকে বাঙলাদেশে সংবাদপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্যারীচরণ একটি স্মরণীয় নাম।

প্যারীচরণ ছিলেন সুলেখক—ইংরেজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই তাঁর অনায়াস অধিকার ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন কর্মবীর। সে জন্য তিনি যথেষ্ট সাহিত্য কীর্তি রেখে যেতে পারেননি। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল সুদূরপ্রসারী ও গভীর। তিনি স্বদেশের সামাজিক-নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন কামনায় লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তাঁর স্কুল ও কলেজপাঠ্য পুস্তক ও ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলিতে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিকটা আভাসিত আছে। ছাত্র কল্যাণ ও নব্য শিক্ষার প্রসারে প্যারীচরণ ছিলেন অক্লান্ত। স্কুল ও কলেজের আদর্শ পাঠ্য পুস্তকের অভাব তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন—সেজন্য সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও এই সমস্ত বিষয়ে কোন সাহিত্য-কর্ম রেখে যেতে পারেনান। কলেজ পাঠ শেষ করার চার বৎসর পরে বীটন সোসাইটিতে তিনি Education শীর্ষক একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ তৎকালীন সুধী সমাজ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। শিক্ষাসমিতির সভাপতি Dr. Monat এই প্রবন্ধের জন্য প্যারীচরণকে অভিনন্দিত করেন। প্যারীচরণ মাতৃভাষার চর্চাতেও চিন্তাবিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে দেখা দেন। রচনার অজস্রতার দিক দিয়ে নয়, বাঙালীর চিত্তজাগরণের উৎসবে প্যারীচরণের বাঙলা রচনাগুলি নতুন

যুগের মশাল ধরেছিল। এ বিষয়ে নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন।১১

প্যারীচরণ সরকারের গ্রন্থপঞ্জী

(১) First Book of Reading, (২) Second Book of Reading, (৩) Third Book of Reading, (৪) Fourth Book of Reading, (৫) Fifth Book of Reading, (৬) Sixth Book of Reading, (৭) Child's First Grammar, (৮) Geography of Bengal for Beginners, (৯) Primary Geography, (১০) Geography of India, (১১) Second Geography, part I and II (১২) Geographical Chart of the World, (১৩) Companion of the Atlas (১৪) Native Child's Arithmetical Table (১৫) Historical Chart of England, (১৬) The Tree of Intemperanance.

এই সমস্ত পুস্তক ব্যতীত তাঁর ইংরেজী ও বাঙলা নিবন্ধের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। এদেশে যতদিন ইংরেজী শিক্ষার আদর থাকবে ততদিন প্যারীচরণ বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পূজা পাবেন। স্বরচিত পুস্তক এবং পত্রিকা সম্পাদনার জন্য তিনি চোরবাগানে "স্কুলবুক প্রেস" নামে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। ১৮৬৬-৬৭ সালে ঐ মুদ্রণযন্ত্র শ্রীবৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর (বাঃ ১২৮২, ১৬ই আশ্বিন) মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে প্যারীচরণ সরকার ইহধাম ত্যাগ করেন। নবযুগের বাঙলা দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের ইতিহাসে প্যারীচরণ ছিলেন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান বিজ্ঞানের সব শাখায় তিনি নিষ্ণাত ছিলেন—এমন কি শারীর বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, থিয়জফি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও প্যারীচরণ ছিলেন অনন্যসাধারণ। স্বভাব সুষমায়, চরিত্র গৌরবে, ধর্মবিশ্বাসে নব্যবাঙলায় পদ সঞ্চারণের যুগে প্যারীচরণের জীবনাদর্শ জাতিকে নূতন যুগের অভিমুখী করেছিল। রামতনু লাহিড়ী সে জন্যই বলেছিলেন—Babu Peary Charan Sircar led an examplary life, did immense good to his country and died venerated by all' কৃষ্টদাস পাল তাঁর বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'a man of unbounded benevolence.' বাস্তবিকই প্যারীচরণের মৃত্যুতে

১১ প্যারীচরণ সরকার (১৩০৯) 'মাতৃভাষার সেবায়' অংশ।—নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২২৭-২৩৪।

সমগ্র বাঙলাদেশ শোকে মুহ্য হয়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের C. H. Tawney তাঁর মৃত্যুতে কলেজ, হেয়ার স্কুল ও হিন্দু স্কুল বন্ধ করে দিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হলে এক শোকসভার অনুষ্ঠান হ'ল। বঙ্গীয় 'মাদকনিবারণী সভার' কর্তৃপক্ষ ১৮৭৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে 'মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটার হলে' এক শোকসভা আহ্বান করেন—বাঙলাদেশের অগণিত নরনারী এই সভায় যোগদান করেন। মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় যোগদান করতে না পারায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন পৌরহিত্য করলেন। সভায় রেভাঃ কে, এম, ম্যাকডোনাল্ড, শিক্ষা অধিকর্তা এইচ, উডরো, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিচারপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাঙলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সভায় প্যারীচরণের স্মরণচিত্র স্থাপনার্থ একটি সমিতি গঠিত হয়। ঐ সমিতির সভাপতি ছিলেন, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর—সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার। এ ছাড়া তদানীন্তন বাঙলাদেশের দিক্‌পাল বঙ্গমণীষীগণ এই সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।১২ কলকাতার একটি রাস্তা "প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট" আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে।

নতুন যুগের ঝড়ের দাপটে সেদিন খাঁচার পাখীরাও পাখার মধ্যে নীল আকাশের আহ্বান উপলব্ধি করেছিল, সেই জাগরণ যজ্ঞে শতাব্দীর বহ্নি-কুণ্ড থেকে অনেকেই অগ্নিচয়ন করে এনে বাঙালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশলাকা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। জাতির আত্মঘোষণার এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। জাতীয় জীবনের প্রলয় কল্লোলের সেই ইতিহাসকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি, ভুলে গেছি সেকালের শিক্ষক, যুগপথিক প্যারীচরণ সরকারকে।

তাঁর মৃত্যুতে শোকের অঞ্জলি নিবেদিত হল দেশের সাময়িকপত্র পত্রিকাগুলিতে। Englishman, Statesman, Indian Daily News, Amrita Bazar Patrika, The Bengalee, National Paper, The Hindu Patriot, ভারত সংস্কারক, এডুকেশন গেজেট, সহচর, সোম-প্রকাশ, সাপ্তাহিক সমাচার, বঙ্গ মহিলা, প্রভৃতি পত্রিকায় প্যারীচরণের বহুমুখী প্রতিভা ও জীবন-গৌরবের দিকগুলি আলোচিত হ'ল। রেভাঃ লালবিহারী দে তাঁর একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন করতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘ ২৭ বৎসরের মধ্যেও তাঁর জীবনচরিত রচিত হ'ল

১২ প্যারীচরণ সরকার (১৩০৯) 'উপসংহার' অংশ। নবকৃষ্ণ ঘোষ

না। অবশেষে বঙ্গীয় ১৩০৯ সালে নবকৃষ্ণ ঘোষ প্যারীচরণ সরকারের জীবনবৃত্ত রচনা করলেন। বাঙলাদেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্যারীচরণের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। কিন্তু প্যারীচরণকে আমরা মনে রাখিনি। তাঁর বহুল প্রচারিত 'First Book' আজ আর ঘরে ঘরে পঠিত হয় না। নব্য বাঙলার নির্মাতা ও যুগপুরুষ প্যারীচরণ আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। এই যুগসংকটে তাঁর চরিতাখ্যান পাঠ নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। সমসাময়িকেরা তাঁকে Arnold of the East, The Prince of Indian Teachers আখ্যায় ভূষিত করেছিল। তাঁর স্মৃতিতে 'The Bengalee' পত্রিকা যা লিখেছিল তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করে প্যারীচরণ প্রসঙ্গের উপসংহার করা গেল—

A distinguished students of Hindu College, he entered the Education Department, where his industry and scholarship soon placed him in the front rank of successful teachers. He was for several years the Headmaster of the Hare School, which became the best English School during his incumbtency. His success led the Director of public Instruction to choose him as one of the first Bengalee officers, who were taken into the ranks of graded Education Service, and his reputation as a Professor in the Calcutta Presidency College proved the soundness of the choice. By his writings Baboo Peary Charn did much to facilitate the study of Englisn in our country."

উল্লেখ পঞ্জি ঃ

১) প্যারীচরণ সরকার (১৩০৯) নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ

২) প্যারীচরণ সরকার (কল্পতরু গ্রন্থাবলী সিরিজ ১৫—১৯১৯ নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ

৩) Life of Peary Charn Sircar (1914)—M. N. Sircar M. A. B. L.

৪) A Nation in Making (1925, 2nd Edn-1963) By Sir S. N. Banerjee.

৫) জীবন কোষ (ঐতিহাসিক—১৩৪৭) প্রথম খণ্ড—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

৬) Freedom Movemnt in Bengal (1968) Edited by Nirmal Sinha M. A.

৭) The Modern History of the Indian Chiefs, Rojas Zamindars Etc. (1881)—Lokenath Ghosh.

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত

শিক্ষকের কাজ মানুষ গড়া। প্রজ্ঞাবান, চরিত্রবান এবং উৎকর্ষচিত্ত মানুষের কীর্তি ও অবদান যে কোনো দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে সহায়তা করে। যথার্থ শিক্ষাগুরু ব্যতিরেকে এরূপ প্রত্যাশা পরিপূরিত হয় না। বস্তুতঃ এইরূপ শিক্ষক কখনও কখনও সমগ্র জাতিকে নব নব ভাবনা ও প্রত্যাশায় সঞ্জীবিত করে তোলেন। প্রাচীন গ্রীসের এ্যারিস্টটল তার দৃষ্টান্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে যুগে যুগে কালে কালে দেশ ও জাতির জয়যাত্রার ইতিহাসে শিক্ষক সমাজের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। শিক্ষক জীবনের পূত চরিতকীর্তন ভবিষ্যৎ ও জাতীয় জীবনে বিশেষ মূল্যবহ। আজিকার শিক্ষাসংস্কৃতির এই নৈরাশ্যের কালে পুণ্যশ্লোক ও কীর্তিমান শিক্ষক সমাজের চরিতকাহিনী আমাদের অধঃপতন মোচনে সহায়ক হতে পারে। বিগত শতকে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রদর্শনের সঙ্গে বাঙালীর যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার ফলে বাঙালী এক মুহূর্তেই ছায়াধূসর মধ্যযুগীয় জীবনবোধ পরিত্যাগ করে রণরঙ্গ-মুখর আধুনিক জীবনের রাজপথ অবলম্বন করে। ফলতঃ জীবনের সীমাঙ্কিত বলয় রেখা ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হয়। আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে বাঙালী জাতি-জীবনের নূতন তত্ত্ব উপলব্ধি করে। ভৌগোলিক চতুঃসীমায় বন্দী বাঙালীর এই দিব্য মুহূর্তে বৃহদ্ ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। বাঙালীর জীবনের এই অত্যাশ্চর্য উজ্জীবন 'নবজাগরণ' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বস্তুতঃ এই পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষিত কৃতবিদ্য শিক্ষক সমাজের অবদান নগণ্য ছিল না। নবোদ্ভূত উনবিংশ শতকের এই আত্মজাগরণের বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে সর্বাত্মক রেণেসাঁর রূপ পরিগ্রহ করে। পরিপার্শ্বচেতনা ও নূতন যুগজিজ্ঞাসা কথা বিষয়ক জনমানসের কৌতূহল চরিতার্থ হয় মূলতঃ কৃতবিদ্য শিক্ষাব্রতীগণের দ্বারা। উনবিংশ শতকের স্মরণীয় বরণীয় যুগপুরুষদের কর্ম-কীর্তির কাহিনী নানাভাবে লিপিবদ্ধ হলেও যাঁরা তাঁদের মত, পথ ও বাণীকে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের চিত্তে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন—সেই সব কীর্তিমান শিক্ষকবৃন্দের কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। অথচ বিগত বাঙলার অদৃষ্টপূর্ব উজ্জীবন পর্বে তাঁদের অনন্য অবদানের কথা বিস্মরণযোগ্য নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্মেষ ও পদ সঞ্চারণের পর্বে উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত এমনই এক স্মরণীয় নাম।

সেকালের শিক্ষা জগতের দিকপাল শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত একালে প্রায়-বিস্মৃত। এযুগের সন্তান সন্ততিরা বোধ করি তাঁর নামও শোনেনি। বড়জোর বুদ্ধিজীবি মহলের কোনো কোনো স্থলে উমেশচন্দ্র এই নাম দূরশ্রুত কিংবদন্তীর মত। অথচ ইংরেজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা লগ্নে উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত নব্য-শিক্ষার মন্ত্রদাতা গুরুরূপে যুবক বাঙলার চিত্তে বহ্ন্যুৎসব ঘটিয়েছিলেন। উমেশচন্দ্রের সংগ্রামক্ষুব্ধ নাটকীয় জীবন উত্তরকালে সাফল্যের বিজয়মাল্যে অভিনন্দিত হয়। নবজাগৃতির বিদ্যুৎস্পর্শ উমেশচন্দ্রের চিত্তলোকে এক গভীরতর ভাবদ্বন্দ্ব সৃষ্ট করেছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে নানা জীবন দর্শনের সংঘাতে উচ্চকিত, নানা অশান্তিতে বিচঞ্চল ছিল সামাজিক অসন্তোষ, অপূরণীয় আকাঙ্খার আর্তনাদ। এ সম্বন্ধে মিলের সেই প্রসিদ্ধ বচন, 'It is better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied.' স্মরণীয়।

উমেশচন্দ্রের জীবনেও এই শতাব্দীর কূট সংকট প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিকে পুরাতনের সম্মোহ, অপর দিকে নবযুগের দ্যোতনা—এই দ্বিমুখী ভাবদ্বন্দ্বে আলোড়িত হয়ে উমেশচন্দ্র কিভাবে নবযুগের আশীর্বাদকে বরণ করে নেন—তাঁর জীবন ও কীর্তিকথা বিশ্লেষণ করলে তা অনুভূত হ'বে। নিবন্ধের পরবর্তী অংশে শিক্ষক-গৌরব উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের জীবনের কথঞ্চিত পরিচয় প্রদানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে।

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস কৃষ্ণনগর সমীপবর্তী পান্নালা গ্রাম। পান্নালার গুপ্তরা বৈদ্যসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রাচীন কৃষ্ণনগরের একটি অঞ্চল 'হটনগর'। হটনগরের দত্তরা সমাজে 'হটুদত্ত' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারে কাজ করতেন। তাঁরা কৃষ্ণনগর রাজাদের কাছ থেকে বর্তমান নেদেরপাড়া বন্দোবস্ত নেন। ক্রমে এঁদের বংশলোপের উপক্রম হ'লে পান্নালার গুপ্তবংশের একজনকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। তদবধি পান্নালার এই গুপ্ত পরিবার 'দত্তগুপ্ত' উপাধিতে পরিচিত হন। কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়ায় তাঁদের নূতন বসবাস আরম্ভ হয়। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়ার এই গুপ্ত পরিবারে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দুর্গাপ্রসাদ দত্তগুপ্ত। দুর্গাপ্রসাদ ২৪ পরগণা জেলার জজ আদালতে প্রধান মুন্সী ছিলেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও দুর্গাপ্রসাদ দান-ধ্যান পুণ্যকর্মে অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তান সন্ততিদের জন্য কোনো সঞ্চয় রেখে যেতে পারেননি। ফলে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে তাঁর এই পরিবার

সমূহ আর্থিক সংকটের মধ্যে পতিত হয়। সবকনিষ্ঠ উমেশচন্দ্রের বয়স তখন ২ বৎসর। অতি শৈশবেই উমেশচন্দ্রের শৈশব জীবন হয়ে উঠল অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ইংরেজদের নতুন নগর কলিকাতাকে কেন্দ্র করে তখন যুগপরিবর্তনের তুফান উঠেছে। নবযুগ চাঞ্চল্যে সচকিত হয়ে উঠেছে দীর্ঘকাল প্রসুপ্ত বাঙালীচিত্ত। এই জাগরণের বহ্নিকণা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রসিদ্ধ জনপদগুলিতে। কৃষ্ণনগরেও তার বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল। বোধহয় এই মন্তব্যও ঠিক নয়। কলিকাতা নগরী পত্তনের বহু আগে থেকে কৃষ্ণনগর নববাঙলার প্রসিদ্ধতম সংস্কৃতিকেন্দ্রের গৌরব অর্জন করে, এমন কি অষ্টাদশ শতকের বাঙলাদেশে কৃষ্ণনগর রাজদরবারে বোধ করি আধুনিকতার শুভ উন্মেষ লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই যুগ পরিবেশে উমেশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ালো। বাঙলার গ্রামে গ্রামে তখনও প্রাচীন ধারার শিক্ষাপ্রবাহ অব্যাহত। পিতার মৃত্যুর পর উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত কয়েক বৎসর এই বিপন্ন পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। তিনি সে সময় নীলকুঠীর চাকরী ছেড়ে মোক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এসব সত্ত্বেও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংসারের অন্নবস্ত্রের যোগান মেটাতে গিয়ে উমেশচন্দ্রের মায়ের সামান্য কয়েকখানি অলঙ্কার বিক্রীত হয়ে যায়। তবু উমেশজননী তাঁর পুত্রের শিক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। অভাব অনটনের সংসারেও তাঁর আশা ছিল বড় ছেলে হবে কবিরাজ, মেজ ছেলে করবে সরকারী চাকরী এবং উমেশচন্দ্র জমিদারী এস্টেটে কোন একটি চাকুরী খুঁজে নেবে। এমনই এক মিষ্টি-মধুর আশা নিয়ে দুর্গাপ্রসাদ-জায়া পুত্রত্রয়কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্য রকমের।

পিতৃহীন উমেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম পাঁচ। চিরাচরিত প্রথায় তিনি একটি পাঠশালায় প্রবিষ্ট হলেন। পাঠশালা বসতো দুর্গানন্দ রায়ের বাড়িতে। গুরুমহাশয়ের নাম রঘুনাথ রায়। খড়ি দিয়ে লেখা শুরু করে কাগজে লেখা পর্যন্ত প্রায় চার পাঁচ বৎসর উমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় পাঠশালায়। তালপাতা কলাপাতায় লিখন অভ্যাস সম্পূর্ণ করে উমেশচন্দ্র কাগজে লেখেন। কৃষ্ণনগরে সে সময় আরও পাঠশালা ছিল। উমেশচন্দ্র অপেক্ষা ১৬ বৎসরের বড় যুগপ্রবর্তক রামতনু লাহিড়ীও কৃষ্ণনগরের লোক। তিনি কৃষ্ণনগরে দেবী চৌধুরীর পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। উমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে বরেণ্য শিক্ষক রামতনু লাহিড়ীর পদতলে বসে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান। কর্মজীবনেও

উমেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে একত্রে অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত থাকেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৩) গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়েছেন। এড্যাম সাহেব তাঁর শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৮) বাঙলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করেছেন। উমেশচন্দ্র অচিরকাল মধ্যে বিদ্যালয়ের 'সর্দার পড়ুয়া' আখ্যা পান। 'সর্দার পড়ুয়া' বা উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কাজে সহায়তা করতেন। উমেশচন্দ্র পাঠশালার নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন। পাঠশালাতে উমেশচন্দ্র অদৃষ্টপূর্ব স্মৃতিশক্তি ও মেধার পরিচয় দিয়ে প্রথম শিক্ষাগুরু রঘুনাথ রায়কে বিস্মিত করেন। দরিদ্র বিধবার এই পঞ্চবর্ষীয় বালকটি বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকলে গুরুমহাশয় অধ্যাপনায় যথোচিত মন দিতে পারতেন না। এজন্য বর্ষাকালে যখন পথঘাট জলমগ্ন হয়ে যেতো, সে সময় এই ছাত্রবৎসল গুরুমহাশয় উমেশচন্দ্রকে স্কন্ধে বহন করে বিদ্যালয়ে আনতেন এবং অপরাহ্নে পাঠশালা হতে বাসভবনে পৌঁছে দিতেন। বাঙালী গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের মৌলিক গণিতবিদ্যা তখনকার বিদ্যালয়গুলিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাঠশালার পাঠশেষে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। রাজকার্যের জন্য অনেকে ফারশী পড়তেন। জমিদারী কাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য পাঠশালার পাঠ যথেষ্ট বিবেচিত হত। এই পাঠশালার ছাত্রজীবনে উমেশচন্দ্র আমড়াতলায় ছাপা দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদচরিত্র, চাণক্যশ্লোক প্রভৃতি গ্রন্থ সুচারুরূপে অধ্যয়ন করেন। খাতাপত্র লেখা, জরিপ, জমা খরচ, জমাওয়াশিল প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষাও তাঁর আয়ত্বে আসে। পাঠশালার গুরুমহাশয় রঘুনাথ রায় উমেশচন্দ্রের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে আপ্তবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—তা ব্যর্থ হয়নি। পরিণত বয়সে উমেশচন্দ্র তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরুর কথা স্মরণ ক'রে প্রায়শঃ ভক্তিরসে আপ্লুত হতেন।

কিন্তু সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য উমেশচন্দ্রের শিক্ষার পথে বড় বাধা। বিধবা ভগিনী পরিবারের এই সংকট মুহূর্তে সংসার নির্বাহের জন্য নিজের গহনা বিক্রয় করে দেন। বাড়ীর কিছু কিছু দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থে সংসার নির্বাহ হ'তে লাগলো। উমেশচন্দ্র এই সময়ে 'শিবপ্রসাদ বিদ্যালয়ে' প্রবিষ্ট হলেন। অর্থ নেই, বই নেই, স্মৃতিশক্তিকে আশ্রয় করে উমেশচন্দ্র কোনো রকমে পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। বিধবা ভগিনীর সুতাকাটা বৃত্তির সামান্য অর্থ সংসারের

একমাত্র ভরসা। এমতাবস্থায় উমেশচন্দ্র দিনের পর দিন পাঠ্যবিষয়গুলি কপি করেন। কখনও বা শিক্ষক মহাশয় ও সহপাঠি বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে পাঠ বুঝে নেন—দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করেন। সহ্য করেন তিরস্কার ও লাঞ্ছনা। দিবাভাগে পাঠ অনুশীলনের অবসর মেলে না। তেলের অভাবে রাত্রিতেও পড়ার সুযোগ হয় না। তথাপি প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার বলে বিদ্যালয়ের প্রতি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন উমেশচন্দ্র।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে মিশনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, উমেশচন্দ্র এই বৎসরেই মিশনারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটা বড় আন্দোলন হয়। মিশনারীরা চিন্তামণি সরকারকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করলে স্কুলের শিক্ষক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। এই সময়ে ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল ব্রজমোহন স্কুল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উমেশচন্দ্রেরও ভূমিকা ছিল। মিশনারী বিদ্যালয় উমেশচন্দ্রের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ফলতঃ তিনি এই বিদ্যালয় ত্যাগ করে পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ীর অনুজ প্রসাদ লাহিড়ীর কাছে ইংরেজী অধ্যয়ন সুরু করেন। প্রসাদ লাহিড়ীর ইংরেজী শিক্ষা উমেশচন্দ্রের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে বিশেষ কার্যকরী বিবেচিত হয়।

নব্য বঙ্গের নতুন শিক্ষার আশীর্বাদ উমেশচন্দ্রের জীবনে অবারিত দাক্ষিণ্য নিয়ে দেখা দেয়নি। দুঃখ দারিদ্র্যময় তরঙ্গসঙ্কুল জীবনের শতধা বাধা অতিক্রম করে তাঁকে পথ পরিক্রমণ করতে হয়েছিল। দারিদ্র্যের কশাঘাতে মাঝে মাঝে তাঁর অধ্যয়নে ছেদ পড়েছে। এমন দিন গেছে যখন অর্থাভাবে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে—কোন কিছু বিক্রয় করে দিন গুজরান করার মত বিষয় সম্বল ছিল না। বিধবা ভগিনী ভিন্ন গৃহে রাঁধুনীর কাজ করেন এবং লব্ধ-অন্ন সকলে মিলে ভাগ করে খান। জীবনের এই ঘোরতর সংকট মুহূর্তে কিশোর উমেশচন্দ্র অধ্যয়ন ছেড়ে পথে পথে চাকুরীর সন্ধান করেছেন। তবু চাকুরী মেলেনি। অতঃপর স্থানীয় রেজিষ্ট্রেশন অফিসে নকলনবিশির কাজ যোগাড় করে উমেশচন্দ্র বিপন্ন পরিবারের সাহায্যে সচেষ্ট হলেন। তাঁর এক খুল্লতাত এই সময়ে তাঁদের কিছু কিছু সাহায্য করেন। উমেশচন্দ্রের এক দূর আত্মীয় মহোদয় সে সময় রেজেষ্ট্রী অফিসের প্রধান মুন্সী ছিলেন। তিনিও উমেশচন্দ্রের জন্য অনুলিখনের কাজ যোগাড় করে দিয়ে বিপন্ন পরিবারের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এইরূপে

কিছুদিনের মধ্যেই তাদের কষ্টের কিছুটা উপশম হয়। উমেশচন্দ্র এই দৈন্য-দারিদ্র্যকে জীবনে সহ্য করেছেন কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে অনন্ত অধ্যয়ন পিপাসার ফল্গুস্রোত ছিল চির-প্রবহমান। এইরূপ অসীম জ্ঞান পিপাসাকে জাগতিক কোন বাধা দিয়ে নিবৃত্ত করা যায় না। উমেশচন্দ্রের জীবন তাঁর দৃষ্টান্তস্থল।

শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই য়ুরোপীয় জীবনধারার উন্মত্ত তরঙ্গ ছায়াস্নিনিবিড় দূর পল্লী বাঙলার পর্ণকুটির পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তার ঢেউ এসে পৌঁছালো নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত শতাব্দীর এই বহ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নিচয়ন করে বাঙালীর বক্ষপঞ্জরে দীপশলাকা প্রজ্জলিত করে দেবেন—এমন এক গভীরতর আকূতিতে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। কলকাতার হিন্দু কলেজ, চুঁচুড়ার মহসীন কলেজে নতুন যুগের নিশান উড়ছে—নতুন জীবন মন্ত্রের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করে নবজীবনের বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইলেন। কোনোরূপ বাধা বিঘ্ন তাঁর অদমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করতে পারেনি। এইরূপ এক দৃঢ় প্রতীতি নিয়ে তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হলেন। এই মুহূর্তে কৃষ্ণনগরের সহকারী জেলা শাসক, চার্লস প্যারী হবহাউস, উমেশচন্দ্রের ভাগ্যবিধাতারূপে দেখা দিলেন। উমেশচন্দ্র একদিন হবহাউসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করলেন। উচ্চবিদ্যার জন্য যুবক উমেশচন্দ্রের অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিরীক্ষণ করে তরুণ ইংরাজ রাজপুরুষ হবহাউস শুধুমাত্র মুগ্ধ হলেন না—উমেশচন্দ্রের কলেজীয় শিক্ষার যাবতীয় দায়ভার বহন করতে সম্মত হলেন। সৌভাগ্যবশতঃ, এই সময়ে উমেশচন্দ্রের প্রথমাগ্রজ কবিরাজী ব্যবসা দ্বারা পরিবারের আর্থিক অনটন মোচনে সহায়তা করেন। কৃষ্ণনগর এই সময়ে হয়ে উঠল নব্য শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম দিবসে কৃষ্ণনগর কলেজের শুভারম্ভ। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বল বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা দেয়। উমেশচন্দ্রের আবাল্যপোষিত আশা ফলে ফুলে প্রস্ফুটিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উমেশচন্দ্র জুনিয়ার স্কলারশিপ বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন (১৮০১-১৮৬৫ খৃঃ)। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর রিচার্ডসন কলেজের অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ

করেন। নব্য বাঙলার অন্যতম স্রষ্টা রিচার্ডসন এ দেশের আধুনিক শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম। বঙ্গদেশে শেক্সপীয়র চর্চার অন্যতম প্রবক্তা রিচার্ডসন কবি ও সাহিত্যসেবীরূপে যুব বাঙলার চিত্তে দীপশলাকা প্রজ্জলিত করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের পূর্বে হিন্দু কলেজে (১৮৩৬-১৮৪৫ খৃঃ) অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে ছাত্রসমাজের মধ্যে নবজীবনের যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিলেন —তা নব্য বাঙলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। রিচার্ডসন সম্বন্ধে টি, বি, মেকেলের সেই প্রসিদ্ধ অভিমত "One of his Compensation for exile in Calcutta was to hear Richardson read Shakespeares" বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজে এই অদ্বিতীয় সাহিত্য শিক্ষকের পদতলে বসে সাহিত্য বিশেষ করে শেক্সপীয়র চর্চার পাঠ গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে বঙ্গের বিরলতম শেক্সপীয়র পণ্ডিতরূপে গণ্য হন।

তখন কলেজের হেডমাষ্টার এফ-ডবলু ইউ-ব্রাডবেরি। তার অন্যান্য পূজনীয় শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও রামতনু লাহিড়া, এতৎব্যতীত অন্যান্য ইংরেজ শিক্ষক। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন বচকোট আর হ্যারিসন হলেন হেডমাষ্টার। গণিতের শিক্ষক ব্র্যাডবেরি, শেক্সপীয়র পড়াতেন বীটল্যাণ্ড বা বীনল্যাণ্ড। অতি অল্প সময়ের মধ্যে উমেশচন্দ্র কলেজের সেরা ছাত্ররূপে শিক্ষক সমাজের হৃদয় জয় করেন। ইংরেজী সাহিত্যে তার সুগভীর বুৎপত্তির কথা অবিদিত রইল না। মার্চেন্ট-অফ-ভিনিসে'র একটি নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি ক'রে তিনি অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের কাছে ৬০ এর মধ্যে ৬০ নম্বর লাভ করে রেকর্ড স্থাপন করলেন। কলেজের প্রথম জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উমেশচন্দ্র অর্জন করলেন ঈপ্সিত সাফল্য।

সূচনা হতে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থানীয় পরিচালন সমিতির অধীন ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ অন্যান্য মফঃস্বল কলেজ সহ কেন্দ্রীয় শিক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে আসে। ১৮৪৮ খৃঃ অনুষ্ঠিত সমস্ত কলেজের সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উমেশচন্দ্র পঞ্চম স্থান অধিকার করে রচফোর্ট রৌপ্যপদক লাভ করেন। মফঃস্বল কলেজসমূহকে হিন্দু কলেজের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে অধিকাংশ ইংরেজ রাজপুরুষের ঘোরতর আপত্তি ছিল। সরকারের সচিব সিসিল বিডনের (পরে লেঃ গভর্নর) আগ্রহাতিশয্যে মফঃস্বল কলেজসমূহ হিন্দু কলেজের সমপর্যায়ভুক্ত হয়। সেজন্য কৃষ্ণনগর কলেজে উমেশচন্দ্রের এই সাফল্যে তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। এই সংবাদে শিক্ষা সমিতির সভাপতি জন

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সমিতির সভ্য বীডন ও মৌয়াটকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে পারিতোষিক বিতরণের জন্য উপস্থিত হন। পারিতোষিকাবলি যথাসময়ে কলেজে না পৌঁছানোর জন্য কলেজ কমিটির অন্যতম সদস্য মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়বাহাদুর নিজ ব্যবহারের জন্য সদ্য ক্রয় করা বহু মূল্যবান শালখানি উমেশচন্দ্রকে উপহার দিয়ে সংবৰ্দ্ধিত করেন। সভাপতি বেথুন তাঁর ভাষণে উমেশচন্দ্রের এই কৃতিত্বের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজকে গৌরবান্বিত করেছেন একথা তাঁর ভাষণে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সমিতি পরিচালিত সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উমেশ-চন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করে কৃষ্ণনগর কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এই পরীক্ষায় ইংরেজী 'কমপজিসনে' উমেশচন্দ্র ৬০ এর মধ্যে ৪৭ নম্বর লাভ করেন। তাঁর এই সাফল্যের জন্য ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজের "উমেশ দত্ত ইয়ার" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে জন ড্রিঙ্ক-ওয়াটার, বেথুন, স্যার সিসিল বীডন ও মৌয়াট সাহেব পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে পারিতোষিক বিতরণ করতে উপস্থিত হন। নব্যশিক্ষা প্রসারে কৃষ্ণনগর কলেজের এই শ্লাঘনীয় প্রতিষ্ঠা ও গৌরবকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তাঁর সভাপতির অভিভাষণে প্রাসঙ্গিকভাবে বলেন—

"I once more Congratulate Umesh Chandra Dutta upon the honour that he has gained for himself, that he has gained for the masters by whose able tuition he has been trained to occupy this produest position ; that he has reflected on the College to which he belongs, and which I trust, from one end of it to the others, sympathing with him in his success."

এই পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে নীলকমল ভাদুড়ী উৎকৃষ্ট বাঙলা নিবন্ধ রচনার জন্য "স্যার এইচ হ্যাডক সুবর্ণ পদক" লাভ করেন।

তৎকালীন শিক্ষা সমিতির সর্বোচ্চ পরীক্ষা ছিল লাইব্রেরী। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে লাইব্রেরী পরীক্ষায় শতকরা একশত নম্বর অর্জন করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এবারে তাঁকে 'লাইব্রেরী সুবর্ণপদক' দ্বারা সম্মানিত করা হয়। উমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি এখানেই। তাঁর ঝটিকাক্ষুব্ধ জীবন-প্রবাহ থেকে লক্ষ্য করেছি—শতধা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি নব্যবঙ্গের আধুনিক শিক্ষার প্রসাদ প্রাপ্ত হন। অদম্য উৎসাহ, অপরিসীম অধ্যবসায় এবং সুকঠিন তপস্যা ব্যতিরেকে এই সিদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এই দুর্জয় তপস্যার

মধ্যেই তাঁর কালরাত্রির অবসান হ'ল। অতঃপর সৌভাগ্য সূর্যের উদয় হল তাঁর জীবনে। কৃষ্ণনগর কলেজে কীর্তিভাস্কর তাঁর কিছু কিছু পরিচয় শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে আজও প্রচ্ছন্ন আছে। অধ্যক্ষ Kerr সাহেব তাঁর "Report of the Public Instruction, Bengal 1831-50" গ্রন্থে উমেশচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উত্তরপত্র সমূহের কিছু কিছু মুদ্রণ করে তাঁর গৌরবময় ছাত্র-জীবনের স্মৃতিরক্ষা করে গিয়েছেন। কৃষ্ণনগর কলেজের সূচনাপর্ব বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার যুগ। বস্তুতঃ কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে কলিকাতার বাইরে বৃহত্তর পল্লীবাঙলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়। কলেজের এই সূচনাপর্বে উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত সমগ্র বাঙলা দেশে প্রতিভাবান পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। আধুনিক শিক্ষা জগতে সে যুগে উমেশচন্দ্র এক কিংবদন্তী। সে যুগের বিভিন্ন ছড়া ও কবিতায় উমেশচন্দ্রের নাম গ্রথিত হয়েছিল। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। তাঁর 'সুধীরঞ্জন' (১৮৫৫ খৃঃ) কাব্যে "কৃষ্ণনগর কলেজের রোদন ও হিন্দু কলেজের সহিত কথোপকথন" কবিতায় অম্বিকাচরণ ঘোষ ও উমেশ দত্তের নাম উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধনী কাব্য ১৮৭ প্রথম ভাগে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

কৃষ্ণনগরেতে আছে কলেজ সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ তার শিক্ষক নিকর।
এ কলেজ একবার উমেশ প্রভায়
উঠেছিল সর্বোপরি বিদ্যা পরীক্ষায়।

কলেজের পাঠ সমাপন করে উমেশচন্দ্র কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তনের (১৮৫৭ খৃঃ) পূর্বেই এদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যা তিনি অর্জন করেছিলেন। অনায়াসে তিনি উচ্চ রাজকর্মচারী হতে পারতেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র বেছে নিলেন শিক্ষাব্রতীর পথ। নবীন যুগচেতনায় তিনি উদ্বেলিত। নবযুগের মন্ত্র প্রচার করে দীর্ঘকাল প্রযুক্ত তমসাচ্ছন্ন জাতিকে জাগ্রত করবেন— উত্তরীয় উড়বে নতুন যুগের—এমন একটা আদর্শ তাঁর মনে দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল। কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের পথে তাঁর এ আশা চরিতার্থ হতে পারে। সেজন্য সরল অনাড়ম্বর শিক্ষক জীবন তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। উমেশচন্দ্র আজীবন শিক্ষাব্রতী; এই নতুন যুগে নতুন মানুষ গড়বেন—দেশ জাগ্রত হয়ে উঠবে— এমন এক আশায় তাঁর চিত্তলোক আন্দোলিত। কারণ গুণবান, চরিত্রবান মানুষ

দিয়েই তো একটা দেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। উমেশচন্দ্রের দারিদ্র্যদুষ্ট সংসার-জীবনের কথা এই মুহূর্তে স্মরণ করা যেতে পারে। তখনো পর্যন্ত তাদের আর্থিক সংকট দূরীভূত হয়নি। জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তির টাকাতে কোনোরূপে তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হচ্ছিল। এমতাবস্থায় উমেশচন্দ্র বিপন্ন পরিবারকে অবহেলা করতে পারেননি। শিক্ষাসমিতি মফঃস্বল বাঙলার এই প্রতিভাবান ছাত্রটিকে শিক্ষা বিভাগের সেবায় নিয়োগ করার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। লাইব্রেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক ক্যাপ্টেন হেস্ উমেশচন্দ্রকে চট্টগ্রাম স্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন (১৮৫০ খৃঃ)।

উমেশচন্দ্র শিক্ষা বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ১০০ শত টাকা বেতনে চট্টগ্রাম স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন (১৮৫১ খৃঃ)। এই বৎসরেই হুগলীর সাবজজ কেশবচন্দ্র রায়ের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। চট্টগ্রাম বিদ্যালয়ের পদচ্যুত শিক্ষক M C Carthy-র স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। চট্টগ্রামে কয়েকমাস শিক্ষকতা করার পর উমেশচন্দ্র বদলি হয়ে এলেন কৃষ্ণনগর কলেজে (১৮৫১ খৃঃ। কলেজের জুনিয়র স্কুল বিভাগে তাঁকে প্রথম শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হল। অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁর বেতন দেড়শত টাকা হয়। চট্টগ্রামে কয়েক মাসের মধ্যে সুশিক্ষকরূপে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মভূমি কৃষ্ণনগরের এই বিদ্যামন্দিরেও উমেশচন্দ্রের যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের সিনিয়র স্কুল বিভাগে সহকারী তৃতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হলেন। এর পূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নর্মাল স্কুল পরীক্ষার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, Lopge ও Thwayte সাহেবও পরীক্ষক ছিলেন। উমেশচন্দ্র যোগ্যতার সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে ক্লার্মণ্ট সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হন বীনল্যাণ্ড এবং বীনল্যাণ্ডের পদে উন্নীত হন উমেশচন্দ্র। তাঁর বেতন ২০০ টাকা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে High first grade teachership দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর বেতন ছিল ২০০ টাকা। কলেজের প্রথিতযশা শিক্ষক বীটল্যাণ্ড বা বীনল্যাণ্ড দীর্ঘ ১৭ বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষককর্মে নিযুক্ত থেকে ১৮৬৩ (৩১, ডিসেম্বর) পরলোকগমন করেন। অচিরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং বেতন ৩০০ টাকায় উন্নীত হয়। ১৮৫১-১৮৬৫ সনের কয় বৎসরকাল একটানা কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষাদানকর্মে ব্যাপৃত থাকার পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বহু-শাস্ত্রবিদ, ছাত্রদরদী ও দেশপ্রেমিক শিক্ষকরূপে বাঙলার শিক্ষাজগতে উমেশচন্দ্র সেকালের এক বহু-কথিত নাম। সুদূর পূর্ববাঙলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহরের ছাত্র-অভিভাবক সমাজেও তিনি নতুন জীবন সঞ্চার করতে সক্ষম হলেন। জনমানসে ছড়িয়ে দিলেন বিপ্লবী ভাবধারা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানচিন্তা। বাস্তবিকই সমগ্র যুগচেতনা একটি উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির বিশাল চিত্ততলে আহুত হয়ে সেদিনের শিক্ষাজগতে নবপ্রাণ প্রীতির দিব্য দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা বিদ্যালয়ে তাঁর কার্যকাল দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। বৎসরকাল ঢাকা শহরে নতুন শিক্ষাচিন্তার দ্বারা জনমানসে আধুনিকতার বারিনিষেক করলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজে প্রথম এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় যথাক্রমে ১৮৬২ ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। এফ-এ ও বি-এ ক্লাস চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমেশচন্দ্র কলেজে উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র আবার কৃষ্ণনগর কলেজে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ১৮৬৭-৮৩ খৃষ্টাব্দে অবসরগ্রহণের দিন পর্যন্ত উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৬৩-১৮৭৫। মৃত্যু ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) পর্যন্ত প্যারীচরণ সরকার ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী অধ্যাপক। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উমেশচন্দ্র সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। রোগার লেথব্রীজ ও উড্রো সাহেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে উমেশচন্দ্র উপরোক্ত Higher Grade Bengal Educational Service, ও পরে I, E. S, পদ অলঙ্কৃত করতে সক্ষম হন। সটক্লিফ সাহেবের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খ্যাতকীর্তি রেভাঃ লালবিহারী দে বা মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কার্যতঃ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হন। বহরমপুর কলেজ থেকে আগত বাণেশ্বর মিত্র সে সময় এখানকার প্রধান শিক্ষক। ১৮৭৪-১৮৭৭ পর্যন্ত রোগার লেথব্রীজ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর কার্যকালে ১৮৭৪-১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র দুবার কৃষ্ণনগর কলেজে অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। উমেশচন্দ্রই কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। সেকালের অন্য কোনো শিক্ষিত বাঙালী এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন নি। উমেশচন্দ্র এর কয়েক বৎসর পরে কটক 'রাভেন শ' কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন (১৮৮১ খৃঃ)। ভগ্নস্বাস্থ্য উমেশচন্দ্র দুই বৎসরের ছুটি নেন। অতঃপর তিনি আর 'রাভেন শ' কলেজে যোগদান করেন নি।

উমেশচন্দ্র শিক্ষা বিভাগের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর অবসর গ্রহণের ফলে বাঙলার শিক্ষাজগত এক অসাধারণ প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত অবসর গ্রহণের পরেও সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (২২, জুন) ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি কৃষ্ণনগরস্থ নিজস্ব বাসভবনে পরলোকগমন করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩০, জুন তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

"The death of Babu Umesh Chandra Dutta, late Principal Krishnagar College took place on the morning of 22nd June last. As the oldest man of this place and as an old educationist, and erudite and profound scholar, he occupied a prominent place in Bengal. He was not ailing but the death was unexpected and sudden and none of his sons were present near him at the time of his death. We offer our condolence to his sons and widow" History and Register of Krishnagar College (1950, গ্রন্থে উমেশচন্দ্রের মৃত্যু তারিখ ৮ই জুলাই উল্লিখিত হয়েছে। এই সংবাদ প্রমাদপূর্ণ। অবসরান্তে উমেশচন্দ্র বার্ষিক চারি সহস্র টাকা বৃত্তি পেতেন। তার মৃত্যুতে ঊনবিংশ শতকের যুগন্ধর শিক্ষক সমাজের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু লুপ্ত হয়। তাঁর তিন পুত্র ও সাত কন্যা। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত ও অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত তাঁর দুই কৃতি পুত্র বহুপূর্বে পরলোকগমন করেছেন। মধ্যমপুত্র পূর্ত বিভাগের ভূতপূর্ব উচ্চপদস্থ অফিসার যোগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত এখনও জীবিত আছেন।

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত বাঙলার শিক্ষা সমাজে এক অবিস্মরণীয় নাম। বাঙালীর পুনর্জাগরণ লগ্নে তিনি নব্যশিক্ষার মন্ত্রদাতা গুরুরূপে পূজিত থাকবেন. বিদ্যালয়ের নিম্নতম শিক্ষক থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। কেবলমাত্র এই পদগৌরবের জন্য নয়—আদর্শ শিক্ষকের দুর্লভ গুণাবলীর জন্য তিনি সমগ্র বাঙলা দেশে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শ শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমিত ছিল না—মানবিকতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ঈশ্বরানুরাগ ও দেশভক্তি প্রভৃতি সেকালের আত্মজাগরণে বহুধা চিন্তা ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত করে দিতেন। পাণ্ডিত্য ও চরিত্র মহত্ত্বের জন্য শিক্ষক সমাজে তাঁর আসন ছিল অনেক উচ্চে। কৃষ্ণনগর কলেজের শ্রী ও সৌকর্য বিধানে তাঁর

নিরলস প্রচেষ্টার কাহিনী সুবিদিত। ইংরেজী ও ইতিহাসের এই স্মরণীয় অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তকে বহুবার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টা হয় কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। অধ্যক্ষ লর ও রোপার লেথব্রীজ শিক্ষা বিভাগকে জানান, কৃষ্ণনগর কলেজ উমেশচন্দ্রের সেবা থেকে বঞ্চিত হলে তাঁর স্থলে অন্ততঃ দুইজন অক্সফোর্ড বা কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রয়োজন; অনুমান করা যেতে পারে ইংরাজ শিক্ষাবিদদের কাছে উমেশচন্দ্রের আসন কত উচ্চে ছিল। প্রয়োজন হলে উমেশচন্দ্র বিদ্যালয় ও কলেজ উভয় বিভাগেই অধ্যাপনা করতেন। কলেজের আমোদ-প্রমোদ-খেলাধূলা ক্ষেত্রেও তিনি ছাত্র সমাজের বন্ধু ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কলেজ ক্রিকেট দল হুগলীতে স্থানীয় কলেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মূলক খেলায় জয়লাভ করে। শিক্ষাবিভাগের সচিব উড্রো সাহেব 'লালবিহারী দে অপেক্ষা উমেশচন্দ্রকে বেশী পছন্দ করতেন। লালবিহারী সম্বন্ধে মন্তব্যকালে তিনি একবার বলেছিলেন—'He has written one book, you could write twenty books'

বাঙলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনাপর্ব থেকে এদেশে ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে শেক্সপীয়র সাহিত্য-চর্চা বহুল প্রসিদ্ধিলাভ করে। শেক্সপীয়র চর্চায় বাঙালীর মনীষার কথা ইংরেজদেরও বিস্ময় উদ্রেক করে। উমেশচন্দ্র ছিলেন একজন শেক্সপীয়র বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত। শেক্সপীয়র সাহিত্যবিষয়ক তিনি কোনো মৌলিক গ্রন্থ উপহার দেননি বটে—তথাপি সেকালের বাঙলাদেশের উচ্চশিক্ষিত মহলে শেক্সপীয়র সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম প্রবক্তারূপে উমেশচন্দ্রের নাম দেশব্যাপ্ত হয়েছিল। বাঙলার শিক্ষাজগতের খ্যাতিমান ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক জর্জ বেলেট বলেছিলেন "শেক্সপীয়র বাঙালীর মধ্যে উমেশচন্দ্র জানে, আর কেহ জানে না।" বস্তুতঃ তখন ছাত্রমহলে, ছাত্রমহল কেন, দেশের শিক্ষিত দলে উমেশ দত্তগুপ্তের ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞরূপে মহাখ্যাতি ছিল। একবার রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের একটি ইংরেজী ব্যাখ্যায় জনৈক ছাত্র সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি উমেশচন্দ্রের সাহায্য নেন এবং ছাত্রটিকে বলেন, "আমি ঠিক ব্যাখ্যাই দিয়াছিলাম, তবে ওঁর মত আমার ইংরাজীতে বিদ্যা নেই, তাই অমন সুন্দরভাবে বুঝাতে পারি নাই—ওঁর মতো কয়টা মানুষ বাঙলাদেশে ইংরেজী জানে?" বাস্তবিকই ইংরাজী বিদ্যাবিষয়ে তাঁর বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বার্দ্ধক্যে ইংরাজী ভাষায় কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক হলে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে নজীরের মত উল্লেখ করে

বলতেন, 'উমেশের চেয়ে তোমরা ইংরেজী জান কিনা।" বঙ্গের প্রথম লেঃ গভর্ণর স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডের কৃষ্ণনগর পরিদর্শন উপলক্ষে (১৮৫৫ খৃঃ) তাঁকে নাগরিক সংবর্দ্ধনা ও মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রের রচনার ভাষায় মুগ্ধ হয়ে হ্যালিডে সাহেব মানপত্রের রচয়িতার অনুসন্ধান করেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর গ্রাজুয়েট ছাড়া এমন ইংরেজী লেখা সম্ভব নয়। উমেশচন্দ্র এই address রচনা করেন। এজন্য স্যার হ্যালিডে ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। ইংরেজী ভাষাভিত্তিক উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে এমন অনেক গল্প আজও লোকমুখে শোনা যায়।

আধুনিক শিক্ষার সুফল আপামর জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত না হলে—দেশের যথার্থ কল্যাণ সম্ভব নয়। ইংরেজী বিদ্যার অসুবিধা এই যে, এ ভাষা দেশের অধিকাংশ লোকের হৃদয় স্পর্শ করে না, ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিফল হয়। শিক্ষার মাধ্যম কি হবে—এ নিয়ে একালের বুদ্ধিজীবি মহলেও আলোচনার শেষ নেই। মাতৃভাষাই শিক্ষার যোগ্য মাধ্যম, এ বিষয়ে দেশ-বিদেশের বিদ্বজ্জনেরা সকলেই একমত। ইংরেজ আধিপত্যযুগে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। উমেশচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষিত এবং ইংরেজ সরকারের শিক্ষাবিভাগের উচ্চ রাজ-কর্মচারী হয়েও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্য শিক্ষাবিভাগের কাছে এক প্রতিবেদন উপস্থিত করেছিলেন। এ তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় গভীর দূরদৃষ্টি ও দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয় অচিরে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের জন্য তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। উমেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"...that is impossible Unless the Calcutta University changes its present attitude of insisting upon English as the medium of its answers even at the Entrance examination"

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে নানা দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। দারিদ্র্যের এই অসহনীয় জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। উত্তর কালে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে তাঁর জীবন চরিতার্থ হয়ে উঠলেও দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর অপরিমেয় সহানুভূতি ছিল। দয়া, মানব-হিতৈষণা, উদার মানবিকতা ও উদার মহানুভবতা তাঁর মহৎ চরিত্র লক্ষণ। দরিদ্র ও দুঃখীজন তাঁর অবাঞ্ছিত দাক্ষিণ্যে ধন্য হতো। অসহায়কে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। চট্টগ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরে

ফেরার পথে তাঁর পাল্কীবাহক পীড়িত হয়ে পড়লে—তিনি রোগাক্রান্ত ভৃত্যকে নিজ স্কন্ধে পাল্কীতে বহন করেন এবং চারদিন পরে কৃষ্ণনগরে পৌছান। তাঁর এই ত্যাগ ও সহানুভূতির আদর্শ শেষ জীবনেও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল। তাঁর সতীর্থ বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী অম্বিকাচরণ ঘোষ বসন্ত রোগে অকালে মৃত্যু বরণ করলে তিনি যে বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন, তা সর্বকালেই দুর্লভ। আত্মীয় পরিজন ও গুরুজনদের নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি রোগ কবলিত বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে আমৃত্যু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। মুখ্যতঃ তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতে কলেজ ভবনের প্রাচীর গাত্রে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একটি প্রস্তর ফলক উৎসর্গীত হয়। এই স্মৃতি সভায় সভাপতির ভাষণে শিক্ষা সমিতির সভাপতি বেথুন সাহেব উমেশচন্দ্রের এই বন্ধুপ্রীতির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে বলেছিলেন— "May such examples multiply among us" মনস্বিতার সঙ্গে হৃদয় মাধুর্যের এমন সম্মিলন দুর্লভ।

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত কেবলমাত্র বরেণ্য শিক্ষাব্রতীরূপেই নন—তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা দেশপ্রাণ ব্যক্তি। নিজ জন্মভূমি কৃষ্ণনগরের সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাঁর প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। এদিক থেকে তিনি একজন সমাজ বিপ্লবী—তথাপি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উপাসক হয়েও তিনি ভারতীয় দর্শনবিরোধী ছিলেন না। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ নয়, মানুষের প্রতি তাঁর যে অকৃপণ প্রেম ছিল, সেই প্রেমই সমাজে তাঁকে অনন্য মহিমা দান করেছে। অবসর গ্রহণের পর বহু বৎসর যাবৎ তিনি কৃষ্ণনগর শহরে অনারারী জেলা শাসকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এখানকার পৌরসভা, কলেজ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সর্বপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। কৃষ্ণনগর পৌরসভায় অন্ততঃ দুই বার (১৫, মার্চ, ১৮৭৯ ও ১৯শে মে, ১৯০০ খৃঃ) তিনি সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। তাঁর নিরলস প্রয়াসে কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রভূত উন্নতি হয়। সেই উৎকট নব্যতার যুগে যখন অনুকরণের বন্যাবেগে সব কিছুই প্লাবিত—ইংরেজী বিদ্যার মুগ্ধ উপাসক উমেশচন্দ্র বিলেতি শিক্ষার খাদ্য-পানীয় আকণ্ঠ গ্রহণ করেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে অগ্নিহোত্রীর অগ্নিরক্ষার মতো সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। চিত্তশুদ্ধিজনিত অচপল প্রজ্ঞার দিব্যালোকে তাঁর অন্তরাত্মা উদ্ভাসিত হয়েছিল। শিক্ষাজগতে ও সমাজে তাঁর এই অনন্য মহিমার জন্য তদানীন্তন ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্মানসূচক এক অভিজ্ঞানপত্রে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের সমগ্র জীবন মূলতঃ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কর্মে নিয়োজিত ছিল। তাঁর বিদ্যাগৌরব এত বেশী ছিল যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রমুখ বরণীয় বাঙালীরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিলাষী হয়ে মিলিত হতেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজির মধ্যে ডুবে থাকাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। জীবনের বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গ্রন্থ পাঠের মধ্যে তিনি পথের নির্দেশ পেতেন। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত-বিজ্ঞান ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুধা শাখায় তাঁর কৌতূহল ছিল অদম্য। মূল্যবান গ্রন্থপাঠকে তিনি স্বাধ্যায় মনে করতেন। জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে—তথাপি নব নব গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা চির জাগরূক ছিল। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র (পরলোকগত অধ্যাপক হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত মহাশয়) লিখেছিলেন—"But books are his chief attraction. His life was always a studius one, and till very lately he was engaged in earnest studies in the departments of History, English, Literature and Mathematics. He is compelled to leave his books now for his eyes have lost their sights, but his sons read to him"

তাঁর বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসা কত তীব্র ছিল উদ্ধৃত উক্তি হতে তা অনুমান করা যায়।

কৃতি ছাত্রেরাই শিক্ষকের গৌরব। তিরিশ বৎসরের অধিককাল তিনি নব্যবঙ্গের শিক্ষা প্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মনন চিন্তার কথঞ্চিৎ পরিচয় এই নিবন্ধে উপস্থিত করেছি। তাঁর অগণ্য কৃতী ছাত্র নব জাগৃতির বাঙলাদেশে জ্ঞানে কর্মে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সঞ্চার করেছিলেন। বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, বিচারপতি লালমোহন দাস, অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, বৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ বসু, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ, ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ রায় উমেশচন্দ্রের কৃতি ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। নব ভারত নির্মাণে এঁদের কর্ম-কীর্তির কাহিনী চিরকালের জন্য অম্লান হয়ে থাকবে।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে উমেশচন্দ্র লোকান্তরিত হয়েছেন। বাঙলার শিক্ষাজগতে এসেছে কত রূপান্তর। কিন্তু আমাদের জড়ত্বমোচনের শুভ সূচনা ঊনবিংশ শতকের বাঙলাদেশে। শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিনের সেই প্রচণ্ড আঘাত জাতিকে বিপর্যস্ত বা বিমূঢ় করেনি—বরং এই আঘাত আত্মরক্ষার সহজাত

বৃত্তিকে সতেজ করেছিল। সেদিনের সেই আলোড়নের বহিঃপ্রকাশ সমাজের মধ্যে কতকগুলি পর্বততুল্য সুদৃঢ় ও সমুন্নত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। উমেশচন্দ্র সে যুগের শিক্ষাজগতে এমনই এক ব্যক্তিত্ব। ঐতিহ্যশাসিত বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আপন স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কর্মে, চেষ্টায়, উদ্যমে, বীর্যে, তপস্যায় এবং বিচিত্র সার্থকতায়। জীবন গঙ্গোত্রীর শিলীভূত অতীতের গুহাবরোধ চূর্ণ করে তিনি নিজেকে শতধা ধারায় প্রবাহিত করে দেন। উমেশচন্দ্রের সংগ্রাম বিক্ষুব্ধ—সাফল্য—অসাফল্যের সেই রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী আমরা মনে রাখিনি। আজিকার শিক্ষাজগতের শতধা নৈরাজ্যের যুগে উমেশচন্দ্রের জীবনকাহিনী পথভ্রষ্ট জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেবে—এই প্রত্যাশা নিয়ে বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

উল্লেখ পঞ্জী

১। T. N. Talukdar & N. K. Majumdar—History and Register of Krishnagar College (1950).

২। বিপিন বিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ (বিদ্যাভারতী সং, শ্রাবণ, ১৩৭৩)।

৩। Prof. Hemchandra Dutta Gupta—Mr. Umesh Chandra Dutta, late of the Bengal Educational Service, Krishnagar College Magazine (1915. 1916).

৪। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, মানসী ও মর্ম্মবাণী, শ্রাবণ, ১৩২৩।

৫। Principal Karr. Report of the Public Instruction Bengal 1818-1850.

৬। General Report of the Public Instruction 1848-49.

৭। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৩।

৮। কৃষ্ণনগর পৌরসভা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৯৬৪)।

হরিচরণ দাস

নতুন যুগের সূর্যোদয় হয়েছিল কোলকাতা শহরে। তার রশ্মিচ্ছটা সারা বাঙলাকে আলো যুগিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা এই নতুনের আগুন। আমাদের নবজাগৃতির সর্ব অংশে তার প্রভাব। নবযুগের এই সূর্যোদয়কে অভিনন্দন জানিয়েছিল গত শতকের কৃতবিদ্য যে বাঙালী সন্তানেরা, তাঁদের কীর্ত্তির কথা ইতিহাসের জীবন্ত অধ্যায়। এ যুগের নতুন মানুষ তৈরীর সাধনায় সেকালের শিক্ষকসমাজের অবদান নগণ্য নয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, সুপণ্ডিত সেকালের বাঙালী শিক্ষক সমাজের পূর্ণ ইতিকথা বোধকরি এখনও রচিত হয়নি। হয়ত বা বিচ্ছিন্ন কোন কোন ব্যক্তির প্রাগ্রসর প্রচেষ্টার কথা কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। হরিচরণ দাস সেকালের একজন স্মরণীয় শিক্ষক। অনেকের মত তিনিও বিস্মৃতির অতলে। হরিচরণ একজন সাধারণ শিক্ষক। কিন্তু তাঁর জীবনে এমন কতকগুলি চরিত্র লক্ষণ যুক্ত হয়েছিল যা একান্তভাবেই প্রাগ্রসর উনিশ শতকীয়। নানা বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে নতুন যুগের শিক্ষাকে তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন—কেবল তাই নয়, নিজ জীবন এই কল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছিলেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার উষালগ্নেই তিনি ইংরেজী বিদ্যায় নিপুণ। নানা প্রলোভনের বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ শিক্ষকবৃত্তিকে বরণ করেছিলেন; ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনায় তাঁর শিক্ষাব্রতী জীবনকে শ্লাঘনীয় করেছিলেন। হরিচরণের সাধারণ শিক্ষক জীবনে লিপিবদ্ধ করার মত হয়ত কিছু ঘটেনি। তথাপি আজিকার বাঙালীর সর্বপ্রকার অস্থৈর্য্য ও চিত্তসংকটের কালে হরিচরণের সাধারণ জীবন-কথাও লিপিবদ্ধ করার যোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ। গতশতকে ইংরেজী শিক্ষা-বিপ্লবের সেই প্রথমযুগে, বহু উৎপাতকে অস্বীকার করে হরিচরণকে নবশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করতে হয়; কর্মজীবনে অনেক প্রলোভনের বৃত্তিকে পরিত্যাগ করে—নতুন শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তিনি এক অনন্যব্রতী সৈনিকের ভূমিকা নেন। গতযুগের কৃতবিদ্য শিক্ষকসমাজে হরিচরণ নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। অধুনা বিস্মৃত আজীবন শিক্ষাব্রতী হরিচরণ দাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করা এ রচনার উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের নাম স্মরণীয়। বাঙলা শিক্ষার প্রচলন, মডেল স্কুল স্থাপন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, এগুলি নিয়েই তাঁর

জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিচরণের তুলনা চলেনা। তথাপি হরিচরণেরও আদর্শ ছিল এইগুলি। বিদ্যাসাগবের জীবনাদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। হরিচরণ বয়সের দিক থেকে বিদ্যাসাগর অপেক্ষা ন'.বছরের ছোট। বিদ্যাসাগর যেখানে অসাধারণ, হরিচরণ অতিসাধারণ। তথাপি সেকালের শিক্ষা প্রসারে হরিচরণ বিদ্যাসাগর পন্থার অনুরাগী ও সহযোগী ছিলেন। সেযুগের শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে হরিচরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে একজন সাধারণ শিক্ষক হিসেবে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন—তা একালের শিক্ষক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করতে পারে। হরিচরণ সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি। একটা যুগ অস্ত যায়—আর এক যুগের উদয় হয় ইতিহাসে। উদীয়মান যুগে বিলীয়মান যুগের স্মৃতি ও ঐতিহ্য মুছে যায় না। হরিচরণ ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করে নতুন যুগেব মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার্থী জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেখানে ছিল ঘাত-প্রতিঘাত—পুবাতন ও নূতনের হাতছানি। হরিচরণ যেভাবে ইংবেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন, সে বৃত্তান্ত অনুসরণ করলে—বাঁকুড়ায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কাহিনীর-ইতিবৃত্তও অনুধাবন করা যাবে।

হরিচরণ বাঁকুড়ার লোক। জন্ম তারিখ ১৮২০ সাল, ৩১শে জানুয়াবী। জন্মস্থান কোতুলপুর। সে সময় কোতুলপুর বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ছিল। হরিচরণের পিতা ঠাকুরদাস দাস। এঁদের পূর্বনিবাস ছিল হুগলী জেলার সামন্তখণ্ড বা সাতখণ্ডে। বাঁকুড়া জেলা ও শহর স্থাপিত হলে ঠাকুরদাস দাস ব্যবসা উপলক্ষে বাঁকুড়ার নতুনচটীতে আসেন, নতুনচটী তখন বাঁকুড়ার নতুন গঞ্জ। কোতুলপুরেই হরিচরণের বিদ্যারম্ভ। এখানে রাধারমণ জীউর মন্দিরের মণ্ডপে শিবু সরকারেব পাঠশালায় তিনি পড়তেন। পিতা নতুনচটীতে তাঁকে ব্যবসা শিক্ষায় পারঙ্গম করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষায় ছিল হরিচরণের প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই পিতার ইচ্ছা ফলবতী হয়নি। হরিচরণের বয়স যখন আট—তখন তিনি কোতুলপুর থেকে নতুনচটীতে আসেন। কোতুলপুরের পাঠশালায় অষ্টশব্দ, শব্দ-সুবন্ত, অমরকোষ প্রভৃতি পুস্তক তাঁর পাঠ্য ছিল। পরে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতির পাঠ শেষ করেন। পাঠশালার স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেছিলেন—"ভূমিতে খড়ির সাহায্যে দাগা বুলাইয়া আমাদের অক্ষর পরিচয় হইত। মাটিতে দাগা বুলানো শেষ হইলে, আমরা তালপাতায়, ক, খ, শিখিতাম,

তালপাতার পর কলাপাতায়, সর্বশেষে কাগজে। শ্লেট ছিল না। তক্তিতে আমরা অঙ্ক কষিতাম। একটা লোহার কলমে কালী মাখাইয়া তক্তিতে লিখিতাম। তখন পাঠশালায় মৌখিক অঙ্ককে ডাক-বলাবলি বলিত।”

নতুনচটীতে তখন পাঠশালা ছিল না। হরিচরণের পিতাঠাকুর সেজন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই শিক্ষকের নাম জনার্দন সরকার। ইনি হরিচরণের পিতার কারবারের হিসাবও লিখতেন। সেকালে প্রচলিত বিদ্যার হিসেবে ইনি পণ্ডিত ছিলেন। বাঙলা ভাষা ছাড়াও, ফার্সিতে তাঁর দখল ছিল। হরিচরণ এই জনার্দন সরকারের কাছে বাঙলা ও ফার্সি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। অবসর সময়ে হরিচরণ সংস্কৃত টোলের পড়ুয়া ছাত্রের কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র এবং ‘অমরকোষের’ অভিধান সম্বন্ধে পাঠ নিতেন এবং মুখস্থ করতেন। এ সময়েই তিনি দাতাকর্ণের পালা ও প্রহ্লাদ চরিত্র নামে দুখানি পুঁথির লিখন কাজ সমাপ্ত করেন।

বাঁকুড়ায় তখন সীতানাথ চক্রবর্তীর গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বাঙলা পাঠশালা স্থাপিত হয়। হরিচরণ শিক্ষার্থী হিসাবে এই পাঠশালায় এসে যোগ দিলেন। এই বাঙলা ফ্রী স্কুলেই হরিচরণ সর্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করলেন। পুস্তকের নাম ‘মনোরঞ্জন।’ হরিচরণ তাঁর স্মৃতিচারণে তাঁর প্রথম মুদ্রিত বইয়ের সাক্ষাৎলাভ প্রসঙ্গে মনোরঞ্জনেরই নাম করেছেন। বর্তমান লেখকের ধারণা বইখানি সম্ভবতঃ তারাচরণ দত্তের ‘মনোরম্যতিহাস।’ এ বইখানি ছিল “ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি”র। এ পাঠশালাতে হরিচরণ বেশী দিন পড়েননি।

আবার বিদ্যালয় বদলাতে হোল। হরিচরণের মধ্যে নতুন শিক্ষা লাভের অদম্য আগ্রহ। এ সময় যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় আর একটি ইংরেজী ফ্রী স্কুল স্থাপন করলেন। বাঁকুড়ায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ চীক্ (Dr. Cheek) ও জর্জ গোল্ডস্‌বারি (Mr. Goldsbury) এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ যত্ন নিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট জর্জ লক্ (George Lock) এই স্কুলে প্রত্যহ একঘণ্টা করে পড়াতে লাগলেন। হরিচরণ ইংরেজী বিদ্যা অর্জনের গভীর আগ্রহে এই নতুন বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। কিন্তু হরিচরণের পিতা পুত্রের ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করেন। হরিচরণের তীব্র বিদ্যানুরাগ এক্ষেত্রেও হল জয়যুক্ত। তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে এই ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। শানবাধা গ্রামের মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কিছু অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনিও এই বিদ্যালয়ের অগ্রবর্তী ছাত্র ছিলেন। এ স্কুলে হরিচরণ যে

প্রথম ইংরেজী পুস্তক পড়েন তা হচ্ছে—Murray's Spelling. তখন এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ দত্ত ও সেকেণ্ড মাষ্টার শ্যামানন্দ মুখোপাধ্যায়। হরিচরণ বারো বছর বয়সে এই স্কুলে আসেন। ময়নাপুরের তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়ের তিন পুত্র—বরদানন্দ, গঙ্গানন্দ ও মহেশানন্দও এই ফ্রী স্কুলের ছাত্র ছিলেন। হরিচরণের অন্য সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন—সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গানারায়ণ বারিক। এই ফ্রী স্কুলে হরিচরণ তিন বৎসব অধ্যয়ন করেন।

১৮৪৬ সাল। বাঁকুড়ায় গভর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হল। কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রী স্কুল গেল উঠে। হরিচরণ এই নতুন বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলেন। এখানেও তিনি তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। তখন হরিচরণদের বেতন ছিল আট আনা। স্কুলের প্রথম হেডমাষ্টার ছিলেন—নবীনকৃষ্ণ সরকার। পরে হেডমাষ্টার হয়ে এলেন—বীট্‌সন সাহেব, ওয়াট্‌সন সাহেব ও স্পীয়ার সাহেব। স্পীয়ার সাহেব খুব পণ্ডিত ছিলেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকুড়ায় প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে হরিচরণের সহপাঠীদের মধ্যে কাঁকটার যদুনাথ রায় ইঞ্জিনীয়ার হন এবং রায়বাহাদুর উপাধি পান। হাইকোর্টের ট্রানস্লেটর রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলেব শিক্ষক গঙ্গানারায়ণ বারিক, রায়বাহাদুর দুর্গাগতি বন্দোপাধ্যায় সি, আই, ই, হাড়মাসরার গঙ্গাধর রায় ও নন্দকুমার রায় প্রভৃতি সহপাঠীদেব নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা পরবর্তীকালে প্রত্যেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে দেশ ও জাতির গৌরব বাড়ান। হরিচরণ ক্লাসের প্রত্যেক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করতেন। এজন্য প্রত্যেক বৎসরই তিনি পারিতোষিক লাভ করতেন। Dr. Richardson's Selections from British Poets দু'ভল্যুম এবং Addison's Spectator এবং অন্যান্য অনেক পুস্তক তিনি উপহার হিসেবে প্রাপ্ত হন। বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রথম ব্যাচে জুনিয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় ব্যাচে উত্তীর্ণ হন কোলকাতা হাইকোর্টের উকীল মহেশচন্দ্র চৌধুরী ও মুর্শিদাবাদ নবাব হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার হারাণচন্দ্র মৈত্র। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫০-৫১ সালে যে পরীক্ষা হয়, সে পরীক্ষায় হরিচরণ জুনিয়র স্কলারশিপ অর্জন করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই বৎসর যদুনাথ রায়, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়ও জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় হরিচরণ যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করেন, এখানে সেগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইংরেজীর জন্য নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তথাপি হরিচরণ Goldsmith's Essays and Vicar of Wakefield, Addison's Spectator এবং Dr. Richardson's Selections from British Poets এই ইংরেজী পুস্তকগুলি পড়েছিলেন। ইংরেজী ব্যাকরণ ছিল Lennie's Grammar. ইতিহাসের মধ্যে History of Rome, History of Greece, History of England, Marshman's History of India, Stewart's History of Bengal অবশ্যপাঠ্য ছিল। এছাড়া Crombe's Etymology and Syntax, অঙ্কের মধ্যে Arithmetic, জ্যামিতির First Six Books, Algebra, upto Property of Numbers, এবং বাঙলা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা', তাঁদের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল। জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় হরিচরণ এই পাঠ্যসূচী অনুসরণ করেন। বাঁকুড়ার স্কুল জীবনেই হরিচরণ ডক্টর জনসনের অভিধানখানি আগাগোড়া মুখস্ত করে ফেলেন।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করে হরিচরণের অধ্যয়নস্পৃহা বেড়ে গেল। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি তৎপর হলেন। কিন্তু বাঁকুড়ায় তখন এরূপ শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কৃষ্ণনগর কলেজ, কোলকাতা হিন্দু কলেজ ও হুগলী কলেজে সিনিয়র স্কলারশিপে অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। তখন হুগলী ও কোলকাতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল না থাকায়, হরিচরণ কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নের মনস্থ করেন। তদনুসারে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন। সে ১৮৫০-৫১ সালের সেসনে। সে সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্রুতকীর্তি অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন বিদায় নিয়েছেন। তখন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন M. G. Rochfort. রক্ফোর্ট সাহেব ইতিপূর্বে কোলকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং হুগলী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাঁকুড়া থেকে কৃষ্ণনগরের পথ তখন দুর্গম ছিল। রেলপথ ছিল না। বাঁকুড়া থেকে বর্দ্ধমান—পরে বর্দ্ধমান থেকে অম্বিকা কালনায় এসে, গঙ্গা পার হয়ে হাঁটাপথে কৃষ্ণনগরে আসতে হোত। পথ নিরাপদ ছিল না, দস্যুডাকাতে পরিপূর্ণ। তথাপি হরিচরণ কৃষ্ণনগরে অবস্থান করে উচ্চশিক্ষালাভে নিরস্ত হননি। কৃষ্ণনগর কলেজে হরিচরণ চার বৎসর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়-সমূহ অধ্যয়ন করেন। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত History and Register of

Krishnagar College-নামক গ্রন্থে হরিচরণের ছাত্রজীবনের কথা আছে। এই কলেজেই উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত ১৮৪৯ সনে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। উমেশচন্দ্রও হরিচরণের মত ১৮২৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত "পুরাতন প্রসঙ্গে" উমেশচন্দ্র ও ব্রহ্মমোহন মল্লিকের স্মৃতিকথায় সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যবিষয়ের উল্লেখ আছে—তা থেকেই এই বৃত্তি পরীক্ষার গুরুত্ব অনুভব করা যায়। কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন শেষে হরিচরণ বাঁকুড়ায় ফিরে আসেন। সেই বৎসরেই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

১৮৫৫ সাল। হরিচরণ বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সেকালে ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক পদের গৌরব ছিল। শিক্ষকদের সম্মানও ছিল। ইংরেজী শিক্ষার সেই প্রত্যুষলগ্নে হরিচরণ যে ইংরেজী বিদ্যা অর্জন করেছিলেন—তা দিয়ে তিনি আরও প্রলোভনযুক্ত অর্থকরী চাকুরী লাভ করতে পারতেন। কিন্তু হরিচরণ শিক্ষকের বৃত্তিকেই বরণ করে নেন। হরিচরণ অতঃপর 'হরিমাষ্টার, নামে সমধিক পরিচিত হন। এখনও বাঁকুড়ায় তাঁদের বংশ হরিমাষ্টারের বংশ বলে পরিচিত। তাঁর নিপুণ অধ্যাপনা প্রণালীর জন্য তাঁর পদোন্নতি ঘটল। তিনি ক্রমে তৃতীয় শিক্ষক এবং আরও কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। ইংরেজী ও গণিত শাস্ত্রে হরিচরণের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কর্মজীবনে থেকেও তাঁর বিদ্যার্জন স্পৃহা অব্যাহত রইল। ১৮৫৭ সাল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন—সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্তিত হ'ল এনট্রান্স পরীক্ষা। শিক্ষকরূপে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে সঙ্গে নিয়ে হরিচরণ এলেন হুগলী পরীক্ষাকেন্দ্রে। এ ১৮৬০ সালের কথা। হরিচরণ এ বৎসরেই কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গেই এনট্রান্স পরীক্ষায় বসে গেলেন। এ বৎসর স্যার রাসবিহারী ঘোষও হুগলী কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ছিলেন। এ পরীক্ষায় হরিচরণ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পরেও শিক্ষক জীবনে থেকেও প্রথম বিভাগে এফ. এ. পাশ করেন। বি. এ. পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হয়েছিলেন—কিন্তু তা অসমাপ্ত রয়ে যায়।

ইতিমধ্যে হরিচরণ শিক্ষকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর অধ্যাপনাপ্রণালী ও স্বাধীন চিন্তার কথা অচিরে ঊর্দ্ধতন মহলে পৌঁছে যায়। বাঁকুড়ার ছাত্র-সমাজে তাঁর গুণগান ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাবিভাগও হরিচরণের কৃতিত্বকে তারিফ করলেন। তাঁর পদোন্নতি হলো। বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ১৫ বৎসর শিক্ষকতা করার পর তিনি Deputy Inspector of Schools-এর পদে উন্নীত হলেন।

এবার কর্মস্থল পরিবর্তিত হলো মেদিনীপুর শহরে। ১৮৬৯ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হলেন। অল্পদিনের মধ্যে এখানে তিনি সাঁওতালী ভাষা শিক্ষা করে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন। মেদিনীপুর কর্মস্থলে তিনি উনিশ শতকের যুগন্ধর হিউম্যানিষ্ট বিদ্যাসাগরেব সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রমে তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে গভীর সখ্যতা হয়। শিক্ষার সেবা ও প্রচারকে তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের কাছেই হরিচরণ লাভ করলেন নতুন প্রাণশক্তি। হরিচরণ অতঃপর তাঁর সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী বিদ্যাসাগরের শিক্ষাপ্রচার ব্রতকে চরিতার্থ করার সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করলেন। এক্ষেত্রে একজন সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে যা সম্ভব হরিচরণ তা সম্পন্ন করতে কার্পণ্য করেননি। কোতুলপুর নিবাসী স্বর্গীয় ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ ১১৩৪ বঙ্গাব্দে হরিচরণের যে জীবনচিত্র প্রচার করেন, তা এ বিষয়ে আলোকপাত করে।

মেদিনীপুর থেকে কিছু দিনের জন্য তিনি বর্দ্ধমানে বদলি হলেন—কিন্তু পুনরায় তাঁকে মেদিনীপুরে ফিরে আসতে হয়। মেদিনীপুরের তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর Sir Henry Harrison তাঁর বিদ্যানুরাগ ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করতেন। ১১৭৪ সালে হরিচরণ মেদিনীপুর থেকে রাঁচীতে বদলি হয়ে আসেন। রাঁচীতে তিনি প্রায় দশ বছর ছিলেন। এখানে অবস্থান কালে হরিচরণ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের গুরুদায়িত্বে ন্যস্ত হন। সে জন্য প্রথমে তিনি কোল, ওঁরাও ও মুণ্ডারী প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। ছোটনাগপুরের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় হরিচরণের নাম প্রথম সারিতে লিপিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য। তিনি এ ব্যাপারে যে সাহস, ধৈর্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন—তার জন্য সরকারের অসীম প্রশংসাভাজন হন। রাঁচীর কর্মজীবনেই হরিচরণ তদানীন্তন স্কুল-ইনস্পেক্টর ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিত Mr. C. B. Clarke-এর সংস্পর্শে আসেন। উদ্ভিদতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়নে হরিচরণ Clarke-এর সহযোগী হন। গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে হরিচরণ C. B. Clarke-এর সহযোগী রূপে যশপুর নামক মিত্ররাজ্যে গমন করে প্রথম সেখানে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে হরিচরণ রাঁচী থেকে পুরুলিয়ায় বদলি হয়ে আসেন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকুরীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, ২০শে নভেম্বর হরিচরণ ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। হরিচরণের মৃত্যু সংবাদে তদানীন্তন বাঙলার

ছোট লাট স্যার এডওয়ার্ড নর্ম্মান বেকার (Sir E. N. Baker) তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী Capt. Allanson মারফত ১৯০৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিত শোক-লিপিতে তাঁর পুত্রকে সমবেদনা জানিয়ে লিখেছিলেন—"His Honour has heard with considerable regret the sad news of your father's death, the late Badu Haricharan Das, a distinguished educationist of Bengal. He desires me to offer to you his sincere sympathy in your bereavement."

হরিচরণ সেকালের শিক্ষক। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে যে নতুন শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছিল—হরিচরণ সেই নতুন সমাজের মানুষ। তিনি বাঁকুড়া জেলার প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তার শিক্ষাগ্রহণের ইতিবৃত্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক; তার আভাস আগেই দিয়েছি। নব্য শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রচার এ দুয়েই ছিল তাঁর অধীর আগ্রহ। হরিচরণ সুপণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ ছিলেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী, হিন্দী, সাঁওতালী, ওরাও, মুণ্ডারী প্রভৃতি ভাষা সমূহে তাঁর প্রচুর অধিকার ছিল। ইহা কম নৈপুণ্যের কথা নয়। নবশিক্ষার প্রথম যুগে উৎকট নব্যতার তোষামোদ ও অনুকরণের সমাজপ্লাবী জোয়ার এসেছিল—আবেগ-উচ্ছ্বাস ও উৎকেন্দ্রিকতার প্লাবন এসেছিল। হরিচরণ এই শিক্ষার আওতাতে এসেও নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। বরং তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন—স্বধর্ম্মে ছিল তাঁর অতিশয় অনুরাগ ও বিশ্বাস, তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রবিষয়ক অসংখ্য পুঁথি ও গ্রন্থ নিজ গৃহে সংগ্রহ করেন। গ্রন্থ সংগ্রহে ছিল তাঁর নেশা। নিজ গৃহেই তিনি একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। বৃদ্ধ বয়সেও নতুন প্রকাশিত ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনলেই তিনি তা কিনে সংগ্রহ করতেন ও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতেন। জ্ঞানার্জনে তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। হরিচরণ দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর জীবনে তিনি শত শত পাঠশালা ও বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। এ জন্য তিনি গৌরববোধ করতেন। হরিচরণেরই উদ্যোগে আদিবাসীদের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক শত শত পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে হরিচরণের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এঁর ইংরেজী পাঠ ও আবৃত্তি ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ ছিল। Sir Henry Harrison যে সময়ে স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর ছিলেন—সে সময়ে তিনি

হরিচরণকে একবার আলাপান্তে বলেছিলেন—"But for your occasional hesitations, one who hears you would take you for an Englishman." রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বন্ধু ও সহপাঠী অবিনাশচন্দ্র দাসের মৃত্যু সংবাদ প্রবাসীতে লিপিবদ্ধকালে লিখেছিলেন—"তাঁহার পিতা হরিচরণ দাস স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর, বিদ্বান ও শিক্ষাদানে দক্ষ ছিলেন। অবিনাশের স্বভাবচরিত্র তাঁহার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। শানবাঁধা গ্রামের মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, নূতনচটীর হরিচরণ দাস প্রভৃতি বোধ হয় সেকালে বাঁকুড়ায় প্রথম ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।" (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৩)। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ব্যাপারেও তিনি প্রভূত শ্রম স্বীকার করেন। তিনি নিজ কন্যাদিগকে গৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এক কন্যা সেকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বাঁকুড়া জেলার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

তাঁর কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দেশ ও জাতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র স্যার রাসবিহারী ঘোষ তাঁর প্রিয় ছাত্রগণের মধ্যে প্রধান। বাঁকুড়া জেলায় একদা প্রসিদ্ধ, কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর বসন্তকুমার নিয়োগী, তেলিবেড়িয়া গ্রামের হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ হরিচরণের ছাত্র ছিলেন। তাঁর মধ্যমপুত্র স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দাস বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তৃতীয় পুত্র ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস বঙ্গ সাহিত্যসেবা, ঋগ্বেদচর্চা ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে বাঁকুড়ার গৌরব বৃদ্ধি করেন। অবিনাশচন্দ্র তাঁর Rigvedic India ও Rigvedic Culture—যে গ্রন্থ দুখানির জন্য একদা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন—সে গবেষণার প্রেরণাস্থল ছিল হরিচরণের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তাঁর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ। অবিনাশচন্দ্র, ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে, 'বাঁকুড়ায় ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের ইতিহাস' নিবন্ধে হরিচরণের স্মৃতি তর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

১৯০৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখের Englishman পত্রে হরিচরণের মৃত্যু সংবাদকে কেন্দ্র করে যে জীবন কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। "On the 20th Nov. 1909, passed away a remarkable Bengali gentleman in the person of Babu Haricharan Das of Bankura. He was born on 31st January 1829 and was

thus about 81 years old at the time of his death. He belonged to the early generation of English-educated Bengalees. and was educated at the Bankura School and the Krishnagar College. Among his class-fellows may be mentioned the names of late Babu Mahesh Chandra Chowdhury and Mohinimohan Roy, both distinguished vakils of the Calcutta High Court, and the late Rai Bahadur Durgagati Banerjee, C. I. E. He as a sound English scholar and aveteran educationist, having served under Government for over 30 years, first as a teacher of the Bankura Zilla School and afterwards as Deputy Inspector of Schools in the Districts of Midnapur, Lohardanga (now Ranchi and Palamau) and Manbhum. He helped Government in spreading knowledge in their own vernaculars among the aboriginal population of Bengal and Chotanagpur, viz., the Santhals, Cols, Oraons, and Mundas, by establishing innumerable village-schools and Pathshalas and thoroughly mastering their dialects He was also a great advocate of female education and established many Government-aided Girls' Schools in all districts where he served. In the early eighties of the last century, he was selected by Government to help Mr. C. B. Clarke, the wellknown Botanist and the then Inspector of Schools of the Presidency Division in inaugurating the English system of education in the Feudatory State of Jashpur. After 3o years of useful activity in the cause of education he retired from Government services in 1882 (১৮৮৯ হবে) and enjoyed his well-earned pension for about 25 years. High English officials, like the late Sir Henry Harrison, then the Collector of Midnapur, Sir Edward Norman Baker, the Deputy Commissioner of Manbhum, Messrs. Martin and Woodrow and Sir Alfred Croft, all Directors of Public Instruction, Bengal, bore testimony to his high ability and scholarship.

Unlike the early generation of English educated Bengalis, he was an orthodox and pious Hindu. He realised in his

own life the ideal of plain living and high thinking and fully represented the superior old type of cultured Hindus, which is fast disappearing from the country." আগামী দিনে হয়ত বাঙলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিপ্লব নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা হবে। হরিচরণের ন্যায় স্মরণীয় শিক্ষক সমাজের ভূমিকা বাঙলার নবজাগৃতির সে ইতিহাস থেকে মুছে যাবার নয়।

গণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা অবিদিত ছিল না। বিশ্বসভ্যতায় জ্ঞান বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের স্থান নগণ্য নয়। এ সব বিষয়ে ইতিমধ্যে অনেকেই প্রণিধান-যোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের The Positive Science of the Ancient Hindus (1915) এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দু'খণ্ড History of Hindu Chemistry (1902, 1908) তথ্যনির্ভর গ্রন্থ সমূহের কথা বলা যেতে পারে। গণিতচর্চাতেও ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিল। ডক্টর বি, বি, দত্ত ও সিং প্রণীত, "দি হিষ্ট্রি অব হিন্দু ম্যাথামেটিকস্ (১৯৫২) এক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। বস্তুত প্রাচীন ভারতে গণিত বিজ্ঞানের চর্চায় আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য, লীলাবতী, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণ আমাদের গণিত বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। O P Jaggi প্রণীত Scientist of Ancient India 1956) গ্রন্থে এসব গণিতজ্ঞদের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। বৃটিশ ভারতে বঙ্গীয় গণিতসাধক আচার্য গৌরীশঙ্কর দে ভারতবাসীকে গণিত বিদ্যায় প্রবুদ্ধ করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাতি গঠনে আচার্য গৌরী-শঙ্করের অবদান নগণ্য নয়। তিনি কোন মৌলিক গণিত বিদ্যার প্রবর্তক ছিলেন না, তৎসত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে গৌরীশঙ্কর এক অবিস্মরণীয় নাম। বর্তমান নিবন্ধে 'অধুনা-বিস্মৃত' এই গণিতসাধকের পূত জীবনকাহিনীর কথঞ্চিৎ আস্বাদ আমাদের লক্ষ্য।

নবাবীযুগের বাঙলাদেশে শুভঙ্কর তাঁর গণিত পদ্ধতি প্রচার করেন। প্রায় আড়াইশত বৎসর কাল শুভঙ্করের গণিত পদ্ধতি বাঙলা-বিহার-আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। শুভঙ্কর ছিলেন বাঙালীর অদ্বিতীয় গণিত প্রতিভা। শুভঙ্করের গণিত প্রতিভা সম্পর্কে বর্তমান লেখকের অচিরে প্রকাশিতব্য একটি নিবন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। ইংরেজী-শিক্ষা বিস্তারের যুগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী (১৮২৫—১৮৮৭) পাটীগণিত (১২৬২) ও বীজগণিত (১২৭০) প্রণয়ন করে, গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। এর পরেই আধুনিক গণিত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম আচার্য গৌরীশঙ্কর দে। উনিশ শতকের বাঙলাদেশে

গণিত শিক্ষাবিস্তারের জগতে গৌরীশঙ্কর একটা ইতিহাস। এ যুগে গণিত চর্চার ক্ষেত্রে গৌরীশঙ্কর একটা আলোকবর্তিকা—একটা কিংবদন্তী। দুঃখের বিষয় একালের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে গৌরীশঙ্কর একটি প্রায়-বিস্মৃত নাম।

'সেকালের শিক্ষক' এই পর্যায়ের আলোচনা-ধারায় চরিত্র নির্বাচন, মূলত বিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। এক্ষেত্রে গৌরীশঙ্কর ব্যতিক্রম। গৌরীশঙ্কর আজীবন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে ওতঃপ্রোত ছিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর প্রণীত পাঠ্যপুস্তকরাজি বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী 'প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই কারণেই গৌরীশঙ্করকে 'সেকালের শিক্ষক' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা গেল। ভবিষ্যতে খ্যাতকীর্তি কলেজ শিক্ষক সমাজের চরিতকথা প্রচারের বাসনা আছে। গৌরী-শঙ্করের জীবন-কথায় প্রবেশ করার পূর্বে এই সামান্য কৈফিয়ৎ অনিবার্য কারণে উপস্থিত করা গেল।

প্রাচীন কোলকাতার পত্তনে বণিক ও তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ গণনীয়। Dr. Busteed-এর Echoes from old Calcutta (1899) কিংবা A. K. Roy এর A Short history of Calcutta (1901) ও H A. Cotton এর দু' খণ্ড Calcutta old and new (1907) প্রভৃতি গ্রন্থে এসব তথ্যের নির্দেশ আছে। গৌরীশঙ্কর দে প্রাচীন কোলকাতার সম্ভ্রান্ত তন্তুবায় পরিবারের সন্তান। গণিতাচার্য গৌরীশঙ্করের পূর্বপুরুষগণ কোলকাতার উপকণ্ঠ বরাহনগরে বসবাস করতেন। প্রায় দু' শত বৎসর পূর্বে তাঁর পিতামহ বা প্রপিতামহ কোলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তর কোলকাতার নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটে তাঁদের বসতবাটী ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ, সাল ১২৫১) কোলকাতার এই বাসভবনে গৌরীশঙ্করের জন্ম। পিতা মধুসূদন দে, মাতা শিবসুন্দরী। মধুসূদনের চারি পুত্র, তন্মধ্যে গৌরীশঙ্কর মধ্যম। জ্যেষ্ঠ হরশঙ্কর, তৃতীয় ভবানীশঙ্কর এবং কনিষ্ঠ দেবশঙ্কর। হরশঙ্কর রাধাবাজারে ক্ষেত্রমোহন দে কোম্পানীর দোকানে কাজ করতেন। কেউ কেউ বলেছেন তিনি মেট্রোপলিটান্ স্কুলের গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ভবানীশঙ্কর গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী করতেন। দেবশঙ্কর অধ্যাপনা কর্মে লিপ্ত ছিলেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রিপন কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদে থাকাকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১]

১ সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (১৯৫১) গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য।

সভ্যতার কনকপদ্ম কোলকাতায় তখন আধুনিক শিক্ষার কলগুঞ্জন। পিতা মধুসূদন পুত্রগণকে দেশীয় ও আধুনিক উভয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা এবং যুগ-শিক্ষা এই উভয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। পুত্রগণকে এই উভয় শিক্ষা ধারায় অনুপ্রাণিত করতে তাঁর যত্নের ত্রুটি ছিল না। অতি তরুণ বয়সে গৌরীশঙ্কর আহিরীটোলা বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ে তিনি মাতৃভাষা, ব্যাকরণ, এবং দেশীয় গণিত পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন তিনি প্রথমে ফ্রী চার্চ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে গৌরীশঙ্কর অসাধারণ প্রতিভা-ধর ছাত্র হিসাবে, ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের বিস্ময় উদ্রেক করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে M. V. পরীক্ষায় গৌরীশঙ্কর অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। নবীন প্রভাতে বৃহতের সম্ভাবনা মুকুলিত হয়ে ওঠে।

নব্যবাঙলাই আধুনিক ভারতবর্ষের জাগরণী গানে দিকদেশ মথিত করে। কোলকাতা সেই নবজাগরণের বোধন কেন্দ্র। হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজে সেই অভ্যুদয়ের নান্দীপাঠ। আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় ও ফ্রী চার্চ স্কুল থেকে গৌরীশঙ্কর নব্যশিক্ষার তীর্থমন্দির হিন্দু স্কুলে যোগদান করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে গৌরীশঙ্কর এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করলেন। গৌরীশঙ্কর এবারে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী থেকে ১২ই এপ্রিল ১৮৫৫ পর্যন্ত এই কলেজ হিন্দু কলেজ নামে পরিচিত। নবযুগের বহু কৃতী বাঙালী মনস্বী হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে আধুনিক ভারতবর্ষের বুনিয়াদ রচনা করেন। ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং গৌরীশঙ্কর বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র গৌরীশঙ্কর এফ, এ, পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীর স্কলারশিপ পেলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার্থী সমূহের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন রেগুলেশন্ অনুযায়ী গৌরীশঙ্কর এম, এ, (অনার্স ইন আর্টস্) উপাধিতে ভূষিত হন।২

২ Presidency College Centenary Volume (1867)

কেবলমাত্র আর একজন বাঙালী, পুণ্যশ্লোক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করের আগে অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গণিতে প্রথম স্থান লাভ করে এম, এ, (অনার্স ইন আর্টস্) উপাধি প্রাপ্ত হন। বহু পুরস্কার, পদক, পারিতোষিক লাভ করলেন গৌরীশঙ্কর। সাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেব গৌরীশঙ্করের এই কৃতিত্বে কেবল আনন্দিত নয় অভিভূত হলেন। কিন্তু এখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ নয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর বি, এল পাশ করলেন। এ সময়ে তিনি কলেজের অধ্যাপক। আরও তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' উপাধি লাভ করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। এই সূত্রে তিনি একজনকে বলেছিলেন,—"It had been a firm belief of everybody in those days that to make one's education complete, he must be adorned with all the University degrees." P. R. S. লাভ করার ফলে গৌরীশঙ্কর দশ সহস্র মুদ্রা লাভ করেন। ইনি আনন্দমোহনের এক বৎসর পূর্বে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও, তাঁর এক বৎসর পরে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। গৌরীশঙ্কর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পি, আর, এস। সাধারণ অর্থে, তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি এখানেই। গৌরীশঙ্কর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল রত্ন। প্রতিভাদীপ্ত তাঁর সমগ্র ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

গৌরীশঙ্কর বি, এল উপাধি লাভের পর হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ী হিসেবে নাম তালিকাভুক্ত করেন। সে সময়ে দেশে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ব্যবহারজীবির সংখ্যাও বেশী ছিল না। অর্থোপার্জনকে জীবনের চরম ব্রত হিসেবে গ্রাহ্য করলে গৌরীশঙ্করের ন্যায় প্রতিভা ও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দুইই লাভ করতে পারতেন, সুপ্রচুর অর্থোপার্জনও কঠিন ছিল না। কিন্তু হাইকোর্টে তিনি কোনদিন যোগদান করেননি। নির্লোভ গৌরীশঙ্কর অনাড়ম্বর তথা লোকহিতকর অধ্যাপকের কাজকে বেছে নিলেন। কর্মজীবনে প্রবেশের এই মুহূর্তে তরুণ গৌরীশঙ্কর "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" গীতার সেই অমোঘবাণীকে শিরোধার্য করে নিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গণিতে এম, এ, পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বেনারসে সরকারী কলেজে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান আসে। কিন্তু পিতামাতার স্নেহনীড় ছেড়ে দূর দেশে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ কর্মজীবন তাকে আকর্ষণ করেনি। এই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথিতযশা অধ্যক্ষ Ogilvie সাহেবের আহ্বানে

'জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে' (বর্তমান 'স্কটিশ চার্চ কলেজ') একশত টাকার বেতনে গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুকাল এই পদে কাজ করেছিলেন। গৌরীশঙ্কর অতঃপর আমৃত্যু (৪ঠা এপ্রিল-১৯১৩) প্রায় ৪৭ বৎসর কাল এই একটি কলেজেই অধ্যাপনা করে গেছেন। সরকারী শিক্ষা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান উচ্চ বেতনের প্রলোভনে তাঁকে আহ্বান করেছে, কিন্তু কোন প্রলোভনই গৌরীশঙ্করকে বিচলিত করেনি। তিনি দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটার ন্যায় এই কলেজেই শিক্ষাদানের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। মৃত্যুকালেও তাঁর বেতন তিনশত টাকার বেশী ছিল না। এ জন্য তাঁর কোনরূপ ক্ষোভ ছিল না। অগণিত শিক্ষার্থীর মনে গণিত ও বিজ্ঞান চেতনা মুদ্রিত করে দিতে পারলেই তিনি সুগভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। আর এই কারণেই তিনি অগণিত ছাত্রের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। গৌরীশঙ্কর আধুনিক শিক্ষার আলোকে স্নান করলেও আদর্শ ও চরিত্রধর্মে তিনি ছিলেন প্রাচীন হিন্দু ভারতের আচার্যগণের মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র শিক্ষাসমাপনান্তে জ্ঞানার্জনকে বর্জন করে, প্রায়শঃ অর্থোপার্জনকেই চরম করে নেন। এর দ্বারা সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণ হয় না। একালের সমাজ জীবনে এই প্রবণতা উৎকট ব্যাধির মত আত্মপ্রকাশ করেছে। গৌরীশঙ্করের শিক্ষক জীবন থেকে সর্বকালের ছাত্র-সমাজ, সত্যজীবন পথের নিশানা খুঁজে পাবে। কতকগুলি উচ্চপদস্থ কেরানী সৃষ্টির দ্বারা উচ্চশিক্ষার গৌরব রক্ষিত হতে পারে না। দেশ ও জাতির জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চিন্তা ভাণ্ডারকে নিয়ত সমৃদ্ধ করার প্রবণতার মধ্যেই শিক্ষার যথার্থ মূল্য। এই উদার মন্ত্রে প্রবুদ্ধ হয়ে গৌরীশঙ্কর জ্ঞান বিস্তারের সাধনাতে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। জীবনী সাহিত্যের অন্যতম রূপকার মন্মথনাথ ঘোষ কথিত একটি আখ্যান প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে। বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা এবং কেম্ব্রিজের প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক চার্লস ব্যারেজের বিশিষ্ট ছাত্র মিঃ মল্ সিনিয়র। ব্যাংলার হওয়ার পর মল্ সিনিয়র ব্যারিষ্টারীতে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে বিচারপতি পদে অভিষিক্ত হন। কোন এক সময়ে জনৈক ব্যক্তি অধ্যাপক ব্যারেজকে তাঁর ছাত্রের কৃতিত্বের কথা নিবেদনচ্ছলে বলেছিলেন হয়ত মিষ্টার মল, একদিন ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলর হবেন। প্রত্যুত্তরে ব্যারেজ্ বলেন এর দ্বারা জগতের কোন উপকারই হবে না। মল্ যদি গণিত শাস্ত্রের চর্চাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে জগতের অশেষ

কল্যাণ হোত। শিক্ষক জীবনের এই আদর্শ অধুনা দুর্লভ। অথচ আমাদের দেশেও একদিন এই আদর্শ ছিল। নির্মোহ জ্ঞানচর্চাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হোত। ইংরেজী শিক্ষার বয়:সন্ধিলগ্নে আচার্য গৌরীশঙ্করের চরিত্রে এই আদর্শের স্ফুরণ ঘটেছিল। গৌরীশঙ্কর তাঁর জীবৎকালে দেশ ও জাতির কাছ থেকে কম সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হননি। এই জ্ঞানতাপস গণিতাধ্যাপকের কথা বাঙলাদেশ নামক জনপদের সীমা অতিক্রম করে ভারত ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

ছাত্রগণকে শিক্ষাপ্রদান গৌরীশঙ্করের জীবনের প্রধান কর্তব্য ছিল। বিদ্যাদানে তিনি মহাপুণ্য সঞ্চয় করেছেন, এ ছিল তাঁর ধারণা। শিক্ষাদান যেন তাঁর ধর্ম। শিক্ষার খাতিরে তিনি শিক্ষকতাকে ভালবাসতেন। শিক্ষাপ্রদানই তাঁর দিনযাপনের ও অবসর বিনোদনের পথ ছিল। তাঁর শিক্ষক জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একজন লিখেছেন "Having no ambition to rise in wealth, fame or powers, he was not attracted by the emoluments of other professions. He derived a peculiar pleasure in teaching and thus embraced it so heartly. His system was to explain clearly the principles of Mathematics and to solve some illustrative typical examples of a difficult nature. His mental absorption in solving a problem was wonderful. He had the rare gift of Concentrating all the faculties to one thing and thus he had a thorough grasp of the important propositions of both Pure and Mixed Mathematics. His knowledge of Astronomy was equally deep and extensive." জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে তিনি দীর্ঘকাল গণিতবিজ্ঞানের একক অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু কর্তব্যপালনে তাঁর কোন ত্রুটি ছিল না। প্রথম বার্ষিকী থেকে এম. এ. পর্যন্ত কলেজের সর্বশ্রেণীর অধ্যাপনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এতগুলি শ্রেণীতে অধ্যাপনা করতে গিয়ে তাঁর অবসর মিলতো না। সেজন্য এম. এ. ক্লাসের ছাত্রগণকে তিনি প্রধানত: গ্রীষ্ম বা পূজার ছুটিতে শিক্ষা- প্রদান করতেন। সংক্ষিপ্ত সময়ে এম. এ. ক্লাসের সমস্ত পাঠসূচী সম্পন্ন হবে না বিবেচনা করে, অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রন্থগুলি ছাত্রগণকে বাড়ীতে পড়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি যখন অন্য শ্রেণীতে অধ্যাপনা কাজে ব্যাপৃত, সে সময়ে এম, এ'র ছাত্রবৃন্দ কলেজে বসে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতো। উত্তরপত্রগুলি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সযত্নে সংশোধন করে আনতেন। এমনি করে বছরের পর বছর ধরে, প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বাঙালী শিক্ষার্থীগণকে গণিত বিদ্যায় প্রবুদ্ধ করে

তুলেছিলেন। গাধা পিটিয়ে কি করে মানুষ করা যায়, গৌরীশঙ্কর শিক্ষক হিসেবে তা সপ্রমাণ করেছিলেন। ছাত্রসমাজের প্রতি ছিল তাঁর অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসা ও মমতা। অধ্যাপক গৌরীশঙ্করের এই চরিত্র-গৌরব শত শত ছাত্রের হৃদয় জয় করতে সহায়ক হয়েছিল। সেকালের শিক্ষণ জগতে এমন কেউ ছিলেন না যিনি গৌরীশঙ্করের নাম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারণ করতেন না। বহু বৎসর ধরে বিশুদ্ধ গণিতে কেবলমাত্র তাঁব ছাত্রবৃন্দই এম, এ, উপাধি লাভের গৌরব অর্জন করেছিল। স্যাব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেজন্যই গৌরীশঙ্কর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "Why the present generation of our country are looking to the West for models and ideals when there are such priceless jewels as Gourisankar Babu and such others in our very midst, in our own land? He has virtues manifold in him, worth imitating."

আচার্য গৌরীশঙ্কর বাংলা দেশের শিক্ষক সমাজের গৌরব। শত শত ছাত্র তাঁর শিক্ষালব্ধ বহ্নিকণা সংগ্রহ করে উনিশ শতকের বাংলা দেশে বাঙালী জীবনের জাড্য মোচন করে। নবযুগের প্রাচীনধারায় গণিতাধ্যাপক গৌরীশঙ্কর আবর্ত ও গতিবেগ সৃষ্টির সহায়তা করেন। প্রবল পাশ্চাত্য উপপ্লবের যুগে গৌরীশঙ্কর প্রতীচ্য জ্ঞানবিদ্যা আকণ্ঠ পান করেন, কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করেননি। এ যুগের জ্ঞানচর্চায় তিনি ছিলেন সমন্বয়সাধক। বিখ্যাত জীবনীকার ও সাহিত্য-সেবী মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য গৌরীশঙ্করের শেষ জীবনের ছাত্র। জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে তিনি পাঁচ বৎসর কাল (১৯০০-০৫) গৌরীশঙ্করের পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করেছিলেন। গৌরীশঙ্কর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখছেন—"এম, এ, পড়িবাব সময় আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকটও গণিত শাস্ত্রে উপদেশ লইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। গণিতের কোন কোন দুরূহ প্রশ্নের সমাধান উভয়েই করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু গৌরীশঙ্কর যেরূপ সরল ও সহজ প্রথায় সমাধান করিয়া দিতেন, তাহাতে বিস্মিত হইতাম। তিনি তাঁহার বিরলপ্রাপ্ত অবসরটুকু এম, এ, পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করিতেন।...তাঁহার গণিত বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁহার অসামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। মানুষ হিসাবে এরূপ সরল, নিরহঙ্কার ও ধর্মভীরু ব্যক্তি আমরা অতি অল্প দেখিয়াছি। Plain living and high thinking-এর এমন জীবন্ত আদর্শ দৃষ্টির সম্মুখে থাকায় আমাদের জীবনের দুর্বল মুহূর্তে অনেক সময় আমরা বল

সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ ব্যক্তির সৃষ্টি করিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারে।৩

গণিতে গৌরীশঙ্কর কোন মৌলিক অবদান রেখে যাননি—সে চেষ্টাও করেননি। কিন্তু দেশে গণিত বিদ্যার সম্প্রসারণে গৌরীশঙ্করের কৃতিত্ব সন্দেহাতীত। তৎকালে ভাল গণিত পুস্তকের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিল। সেজন্য তৎকালীন স্কুল কলেজে প্রচলিত সকল শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুসারে গৌরীশঙ্কর বিবিধ গণিত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। পাটীগণিত, বীজগণিত জ্যামিতি, ট্রিগনোমেটরী প্রভৃতি তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলির ইংরেজী ও বাঙলা সংস্করণ কেবলমাত্র বাঙলাদেশের শিক্ষা-সমাজেই নয়—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরে বহুল প্রচারিত গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ অনুসন্ধান করলে তৎকৃত পাঠ্যপুস্তকগুলির পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন সম্ভব। স্কুল কলেজ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৌরীশঙ্করের গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতে যে সমাদর লাভ করেছিল তা একালেও বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। বিজ্ঞানচিন্তার নিয়ত পরিবর্তনের ফলে গৌরীশঙ্করের গ্রন্থগুলি আজ একপ্রকার প্রায়-বিস্মৃত। তৎসত্ত্বেও আধুনিক ভারতে গণিতবিদ্যা প্রসারের জগতে গৌরীশঙ্কর প্রণীত গ্রন্থগুলি একপ্রকার ইতিহাস। সেকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক ডক্টর সি-ই-কালিশ মিশ্রগণিতে এম, এ ক্লাসে অধ্যাপনা করতেন। গৌরীশঙ্কর কালিশ অপেক্ষা সহজ ও সরলভাবে বোঝাতেন। বীজগণিতে Theory of determinants এফ, এ-তে পাঠ্য ছিল না। কিন্তু বিষয়টি আয়ত্ত করতে সক্ষম হলে উচ্চতর গণিত শিক্ষায় সুবিধা হয়। এজন্য এফ, এ, পরীক্ষার্থীদের জন্য রচিত তৎকৃত কলেজপাঠ্য বীজগণিতে তিনি বিষয়টি সন্নিবেশিত করে দেন। প্রাগ্রসরমান বিজ্ঞান চেতনার যুগে দেশ ও জাতিকে নবচেতনায় প্রবুদ্ধ করা ছিল তাঁর শিক্ষকজীবনের ব্রত, ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা। আপামর জনসাধারণের মধ্যে গণিত-ভাবনাকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্যই তিনি অনুপম পাঠ্যপুস্তকগুলি প্রণয়নের কাজে ব্রতী হন।

শিক্ষক হিসেবে গৌরীশঙ্করের খ্যাতি কেবলমাত্র জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। মহানগরী কোলকাতার শিক্ষাজগতে গৌরীশঙ্করের শিক্ষক-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। গণিতাধ্যাপক গৌরী-

৩ বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্জীর একপৃষ্ঠা। পঞ্চপুষ্প—জ্যৈষ্ঠ-১৩৩৮

শঙ্করের নাম ক্রমে বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই গৌরীশঙ্করের নামে শ্রদ্ধাবনত। গণিতবিদ্যায় তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা, বিনয়নম্র ব্যবহার ও দেবদুর্লভ চরিত্র Dr. Jardine, Dr Hastie, Dr Smith, Dr. Morrison প্রভৃতি এই কলেজের খ্যাতিমান অধ্যক্ষ সমূহের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করলো। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত একজন বাঙালীর এই গণিত প্রতিভা য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াল। অধ্যক্ষ ডক্টর হেষ্টীর পৃষ্ঠপোষণা ও সুপারিশ-ক্রমে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হন। অতঃপর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌরীশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বৎসরেই গৌরীশঙ্কর নতুন রেগুলেশন বলে Honourary fellow-র পদে উন্নীত হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সিণ্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে গৌরীশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ সালে এফ, এ, এবং আরও পরে বি, এ, ও এম, এ গণিত বিষয়ের পরীক্ষকপদ তিনি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধানবলে গৌরীশঙ্কর অতঃপর আই. এ, আই, এস-সি এবং বি, এ, পরীক্ষায় স্থায়ী প্রধান পরীক্ষকের গৌরব লাভ করেন। Board of Studies of Mathematics নামক গণিত শিক্ষাবিষয়ক সংস্থার মাননীয় সদস্য ছিলেন গৌরীশঙ্কর। এইরূপে গৌরীশঙ্কর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। উনিশ শতকে নব্য শিক্ষাধারার প্রবর্তনে গৌরীশঙ্কর একটি অবিস্মরণীয় নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজ আত্মসম্মানকে তিনি কখনও বিক্রয় করেননি। গৌরী-শঙ্করের জীবনীকার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"His honour and independence he fully maintained in all affairs in the University, and never showed even the least shadow of slave mentality."

উনিশ শতকে বাঙলাদেশে নব জাগৃতি, জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার পদসঞ্চারণ ঘটে। গৌরীশঙ্কর ছিলেন এই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। বাঙলাদেশে স্বাদেশিকতার এই ধূমায়মান্ বহ্নিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। আচার-আচরণ-আহার-পোষাক-চরিত্রধর্ম তাঁর সব কিছুতেই ছিল স্বাদেশিকতার ছাপ। ঋষি বঙ্কিমের হৃদয় নির্গত 'বন্দেমাতরম' কেবলমাত্র অসার উচ্চারণ নয়, গৌরীশঙ্করের কাছে তা তাৎপর্যপূর্ণ মন্ত্র। মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির জন্য তিনি

অধীর হয়েছিলেন। মাতৃমুক্তিপণ গৌরীশঙ্কর স্বাধীনতার জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁর প্রতিটি কর্ম ও আচরণে দেশপ্রেমিক গৌরীশঙ্করের ভাবরূপ মূর্ত হয়ে উঠতো। বঙ্গভঙ্গ বা ১৯০৫ সাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা লাল তারিখ। এই সময়ে দেশীয় শিল্পকলার পুনর্জাগরণের সূচনা। দেশ তখন প্রাচীন ভারত আবিষ্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে যে অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, গৌরীশঙ্কর সেই ভারত ঐতিহ্যের মুগ্ধ উপাসক ছিলেন। সতীর্থ ও সহকর্মী দেশগৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গৌরীশঙ্করও শিক্ষিত বাঙালীর এই জাতীয়তাবোধকে অতিশয় শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

গৌরীশঙ্কর সহজ সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সম্মান, যশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এসব বিষয়ে তাঁর কোন মোহ ছিল না। সেজন্য নীরবে ও নিভৃতে দিনযাপন করতে তিনি ভালবাসতেন। গণিতশাস্ত্র বিষয়ক বোর্ডে তাঁকে সভাপতি করার জন্য প্রস্তাব উঠলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি নিজেই ঐ পদে স্যার আশুতোষের নাম প্রস্তাব করেন। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল। পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে বঙ্গাব্দ ১৩১০ থেকে ১৩১৯ সাল পর্যন্ত গৌরীশঙ্কর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র আয়-ব্যয় পরীক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন।৪ নিজ পল্লীতে 'চন্দ্রপণ্ডিতের মাইনর স্কুলটি তাঁর তত্ত্বাবধানে চলতো। এইরূপ ছোটখাটো নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন। গৌরীশঙ্করের অনাসক্তি ও নির্মোহ চরিত্রধর্মকে উপলব্ধি করে অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিসভায় বলেছিলেন, "গৌরীবাবু কেবল গীতার উপদেশ পাঠ করেন নাই। সমস্ত জীবন গীতার উপদেশানুসারে যাপন করেছেন।"

গৌরীশঙ্কর যশঃপ্রার্থী সাংসারিক উচ্চাকাঙ্খী লোক ছিলেন না। তিনি নীরবে নিভৃতে কাল কাটাতে ভালবাসতেন। প্রবল ইংরেজ আধিপত্যের যুগে তিনি তাঁর হিন্দুত্ব বিসর্জন দেননি। এদিক থেকে গৌরীশঙ্কর সত্য সনাতন নিষ্কাম ধর্মের উপাসক। বিষ্ণুভক্ত গৌরীশঙ্কর প্রত্যহ নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ শিলার পূজা অর্চনা করতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি ভবানী দত্ত লেনে সাধনাগারে

৪ পরিষৎ পরিচয় (১৩৪৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্মালোচনা করতেন। মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় লিখেছেন গৌরীশঙ্কর কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোক। ধর্মাদর্শের কথা প্রসঙ্গে তিনি একজনকে বলেছিলেন—

"Though, I am a weaver by caste and quite ignorent of your Japa, Tapa etc. yet my love and devotion to Shri Krishna are unquestioning and unshaken. I rely solely on him alone for my peace, welfare and hapiness" "হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে তার অবাধ অধিকার ছিল। বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদ-পুরাণ-মহাকাব্য প্রভৃতি হিন্দুর শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনকে তিনি ধর্মপালনের মত মনে করতেন। শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা গৌরীশঙ্করের নিত্যপাঠ্য নিত্য সঙ্গী ছিল। সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি কথা প্রসঙ্গ বলেছিলেন—"Why the young generation are not reading the Ramayana and the Mahabharata again and again, instead of killing time in wild goose chase ? The epics are rich store of knowledge and wisdom." এমনি ছিল গৌরীশঙ্করের ধর্মবিশ্বাস।

সরল নিরহঙ্কার ধর্মপরায়ণ গৌরীশঙ্করের ন্যায় শিক্ষক যে কোন দেশের গৌরব। কোমলপ্রবৃত্তি ও দয়ার্দ্রচিত্ততা গৌরীশঙ্করের চরিত্র লক্ষণ। প্রেম ও পবিত্রতা তাঁর সর্বপ্রকার কর্মধারার উৎসভূমি। পরদুঃখে তিনি অশ্রুবিগলিত। দুঃখীজনের সেবায় তিনি উৎসর্গীকৃত। এসব ক্ষেত্রে His piety gave ere charity began. উচ্চচিন্তা ও সত্যনিষ্ঠা তাঁর জীবনাদর্শের রক্ষা কবচ। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার যথার্থই বলেছিলেন—"That a single word from Gourisankar Babu is worth more than a lakh of rupees." প্রাচীন কোলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কথা বলতে গিয়ে হরিহর শেঠ মহাশয় লিখেছিলেন "তিনি একাধারে যেমন অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই কর্তব্য-পরায়ণতা, শ্রমশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি বহু সদগুণে বিভূষিত ছিলেন।"[৫] গৌরীশঙ্করের দেবদুর্লভ চরিত্রগৌরবের কথা বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তা সম্ভব নয়। আমরা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সেকালের শিক্ষকসমাজের গৌরব গৌরীশঙ্করকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রদক্ষিণ করলাম মাত্র।

ইংরেজী ১৯১৩ সাল। এ বৎসরের ৪ঠা এপ্রিল (২২শে চৈত্র ১৩১৯) তারিখে দেশবরেণ্য ও বিশ্রুতকীর্তি গণিতাধ্যাপক গৌরীশঙ্কর পরলোকগমন

৫ প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়। হরিহর শেঠ। ভারতবর্ষ।

করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলার শিক্ষাজগতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবনে শত শত বাঙালী তরুণকে গণিত বিদ্যায় প্রবুদ্ধ করে বাঙালী নবজাগরণকে যৌবনধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর সেই সব ছাত্র সমাজের বিস্তৃত বিবরণ দান বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু সারদারঞ্জন, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি মনস্বী বাঙালী, গণিতচর্চায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নব্য বাঙলায় গণিত বিদ্যার জগতে গৌরীশঙ্কর একটা ইতিহাস। গৌরীশঙ্করের কাহিনী আজ অতীত ইতিহাসের বিস্মৃতির গর্ভে লীন। তবুও এদেশে গণিত শিক্ষার জগতে গৌরীশঙ্কর একটি বরণীয় নাম। গৌরীশঙ্কর বাঙলার শিক্ষককুলের গর্ব। একালের ছাত্র-শিক্ষক সমাজের এই ঘোর যুগসঙ্কটে গৌরীশঙ্করের জীবনালেখ্য একালের সমাজকে নতুন পথের ইঙ্গিত দেবে। স্কটিশ চার্চ কলেজে গৌরীশঙ্করের তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। উত্তর কোলকাতার একটি রাস্তা আজও তাঁর নামের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

গণিতাচার্য গৌরীশঙ্করের তিরোধানে সেদিনের বাঙলাদেশ শোকাভিভূত হয়েছিল। এদেশের তাবৎ পত্র পত্রিকা শোকাশ্রু নিবেদন করেছিল—শোকসভা হয়েছিল শিক্ষা-মন্দিরে, শহরে, নগরে, গ্রামে। এ সবের পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য নয়। উপসংহারচ্ছলে দু'জন মনস্বী বাঙালীর শোক-প্রশস্তি বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই দুই কৃতী বাঙালীর রচনা থেকে গৌরীশঙ্করের শিক্ষক জীবনের মহত্ব পাঠক সমাজের গোচরীভূত হবে এমন কি হৃদয়ে মুদ্রিত হতে পারবে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীর মত Modern Reviewতে লিখেছিলেন—

"Professor Gourisankar Dey, who died last month at the age of 69, was well-known, as a sound mathematician and a very able teacher. He crowned a brilliant academical career by winning the Premchand Raychand Scholarship. He had to his credit, nearly half a century's quiet unostentatious and conscientious work. Many educated men who are now themselves elderly and occupy distinguished positions in many walks life, were his pupils. He was as distinguished for his character as for his scholarship. In him the country loses one of its men of sterling worth."৬

৬ Modern Review (Notes), May, 1913.

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্করের তিরোধানে যে অশেষ শোকাভিভূত হয়েছিলেন পরবর্তী সমাবর্তন উৎসবে তাঁর প্রদত্ত অভিভাষণে সেই দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত। আশুতোষের হৃদয়-উৎসারিত এই শোকোচ্ছ্বাস গৌরীশঙ্করের শিক্ষক জীবনের মূল্যায়নে বহু মূল্যবান বস্তু বলে বিবেচিত হবে। আশুতোষের সেই অমোঘ উচ্চারণকে স্মরণ করে গৌরীশঙ্কর প্রসঙ্গের উপসংহার করি। "By the death of Babu Gourisankar De, we have lost a veteran Professor, who was rightly regarded as a tower of strength to the cause of education in these provinces After an academic career of exceptional, brilliance he attached himself to the cause of instruction of our youths and unremittingly tolled in the performance of his task for forty-six years to the very day of his death. His extensive knowledge of mathematics, his powers of exposion, the accuracy and thoroughness with which he accomplished whatever he undertook, the innete modesty of his nature, secured for him the spontaneous admiration of all whoever came into contact with him. His services to the institution to which he adhered through life, with a fine sense of loyalty which would not even tolerate the thought of preferment elsewhere, in his own line, and his services to the University as a member of the Senate, of the Board of Studies in Mathematics and of the Board of Examiners, for more than quarter of a century, will be held in grateful remembrance by all who are interested in the progress of education emongst our people

অন্যান্য উল্লেখ পঞ্জী :

(১) জীবনীকোষ, ৩য় খণ্ড, (১:৪৫) শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার।

(২) আচার্য গৌরীশঙ্কর দে—মন্মথনাথ ঘোষ, ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৫।

(৩) আচার্য গৌরীশঙ্কর—কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, মানসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

(৪) Late Professor Gourisankar De—S. K. Mukherjee, Calcutta Review, April, 1924.

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী

বাঙলার শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রায়-বিস্মৃত নাম। উনবিংশ শতকে প্রতীচ্য শিক্ষার আগমনে শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রাণচাঞ্চল্য সূচিত হয়েছিল তার যথাযথ বিবরণ বোধ করি এখনও লিখিত হয়নি। শিক্ষা-ক্ষেত্রে নবজাগরণের যুগপতাকাবাহী বহু বরণীয় বাঙালীর কথা আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। যে যুগে ডিরোজিও, রিচার্ডসন ও হেয়ার শিষ্য রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ পুণ্যশ্লোক শিক্ষাবিদেরা বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছিলেন—ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ছিলেন সেই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষক সমাজের অগ্রদূত। সেকালের শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীব অভ্যুদয় বৃত্তান্ত বাঙলার নব জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। অধুনা বিস্মৃত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর অনন্যশিক্ষাদানব্রত ও সাহিত্য সাধনা বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য।

ক্ষীরোদচন্দ্রের আবিভাব বঙ্গের এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে. বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কোলকাতা নগরী পত্তনের ইতিহাসের সঙ্গে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের নাম অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত. এই বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী, (মজুমদার ইং ১৫৭০-১৬৪৯) সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কোলকাতা নগরীর ইতিহাস অথবা সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। তথাপি ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর বংশবৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অবান্তর নয়। ষোড়শ শতকের অষ্টম দশকে বঙ্গদেশ মুঘল শাসনে অশান্ত ও অস্থির ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল রাজা মানসিংহ ছিলেন বাঙলাদেশের শাসনকর্তা। এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন ছিল। বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের পূর্ব-পুরুষগণ তন্ত্রশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। এঁরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আমেটের গাঙ্গুলীবংশ। আমেট বীরভূম জেলায়। বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলীর (মজুমদার) অন্যতম পূর্বপুরুষ শিস্ গাঙ্গুলী। লক্ষ্মীকান্তের পিতা জিয়া গাঙ্গুলী পাঁচু গাঙ্গুলীর পুত্র। জিয়া রাজ্যের একজন প্রশাসক হিসাবে শক্তি খাঁ উপাধি পান। পরবর্তীকালে জিয়া কামদেব ব্রহ্মচারী হন। তাঁর

পত্নী একটি শিশু প্রসব কালে মৃত্যুবরণ করেন। কামদেবের এই শিশু পুত্রই লক্ষ্মীকান্ত। কামদেব শেষ জীবনে কালী উপাসনা করতেন। রাজা মানসিংহ ছিলেন এই কামদেবের শিষ্য। কামদেবের উপদেশ ও নির্দেশে মানসিংহ বহু বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত সেকালের একজন বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি নিজ কৃতিত্বে রাজা প্রতাপাদিত্যের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। দিল্লীর মুঘল শাসনের সঙ্গে তখন প্রতাপাদিত্যের বিরোধ। রাজা মানসিংহ এই সময়ে বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়ানন্দের সাহায্যে লক্ষ্মীকান্তকে প্রতাপাদিত্যের চাকুরী থেকে মুক্ত করে আনেন। মুঘল শক্তির কাছে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও তাঁর মৃত্যুর পর রাজা মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তকে মাগুরা, খাসপুর, কোলকাতা, পৈকান ও আলোয়ারপুর-এই পাঁচটি পরগণা ও হেতেগড় পরগণার কিয়দংশের জায়গীর সনন্দ আনিয়ে দেন। হুগলী জেলার উত্তরাংশে গোহট্ট গোপালপুরে তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান ছিল। জায়গীর লাভের পর তিনি নিমতা-বিরাটিতে বসবাস করতে থাকেন। লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র কেশবরাম মজুমদার নিমতা থেকে বড়িষায় বসবাস আরম্ভ করেন। তদবধি সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশ বড়িষায় বসবাস করছেন। রাজা মানসিংহের কাছ থেকে লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী 'মজুমদার' উপাধিপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কেশবরামকে দক্ষিণবঙ্গের রাজস্বসচিব নিযুক্ত করেন—কেশবরাম তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য নবাব দরকার থেকে 'রায়চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। সাবর্ণ ঋষির সন্তান হিসেবে এঁরা সাবর্ণ রায়চৌধুরী নামে খ্যাত। শোনা যায় কালীঘাটের কালীমাতা এঁদের পূর্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত। এই বংশের সন্তোষ রায়চৌধুরী কালীঘাটের কালীমাতার নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সন্তোষ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পর ঐ মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। কোলকাতা লালদীঘির উপকণ্ঠে রায়চৌধুরীদের কাছারীবাড়ী ও শ্যামরায়ের মন্দির ছিল। দোল উৎসবের সময় দীঘির জল লোহিতবর্ণে রূপান্তরিত হত। সেজন্যই দীঘির নাম লালদীঘি। পরে শ্যামরায়ের মন্দিরে ইংরাজ অনুপ্রবেশের আতঙ্কে শ্যামরায়ের বিগ্রহ কালীঘাটে কালীমাতার সংলগ্ন স্থলে স্থানান্তরিত হয়। কালীঘাটে সেই শ্যামরায় বিগ্রহ আজও পূজিত হয়। বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশীয়গণ বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতকীয় পোড়ামাটির শিল্পরীতির অনেক মন্দির ও স্থাপত্য নিদর্শনের প্রবর্তক। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে মুঘল পৃষ্ঠ-পোষকতায় তিনটি হিন্দু জমিদার বংশের পত্তন হয়। কৃষ্ণনগর (নদীয়া),

রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ, বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের জয়ানন্দ এবং বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত—এই তিনজনেই ছিলেন সমসাময়িক এবং বন্ধুগোত্রীয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্বভারতের সমুদ্র সংলগ্ন জনপদে দাড়াবার স্থান পেয়েছিল কোলকাতা-সুতানটী ও গোবিন্দপুরের জমিদারী ক্রয়ের মাধ্যমে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা প্রথমতঃ এই জমিদারী বিক্রয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু দিল্লীর মুঘল শাসকদের চাপে এই জমিদারী মাত্র ১৩০০ টাকায় বিক্রীত হয়। সে সময়ে ঔরঙ্গজীবের পুত্র আজীম ওসমান বাঙলার শাসনকর্তা (১৭০০খৃঃ)। এই বিক্রয়কর্ম সম্পন্ন করার জন্য তদানীন্তন বাঙলার সুবাদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ১৬০০০ টাকা নজরনা প্রাপ্ত হন। এর ফলে পালাবদলের সূচনা হয়। 'লক্ষ্মীকান্ত' নামক একখানি ইংরেজী পুস্তকে এই বংশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকখানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। এই পরিবারের বংশধরেরা এখনও কোলকাতার দক্ষিণে বড়িষায় ও ২৪ পরগণা জেলার হালিসহরে বসবাস করছেন। কোলকাতা নগরীর প্রাচীন ইতিহাসে সাবর্ণ রায়চৌধুরী বংশ একটি স্মরণীয় নাম। কোলকাতা নগরীর ইতিহাস ভূরি ভূরি রচিত হয়েছে। এই নগরীর প্রথম ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব বোধহয় এইচ, বেভারলির। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর সেনসাস্ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর পরে বাস্টিড, এইচ, এ, কটন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কোলকাতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব বোধহয় এ, কে, রায়ের। রায় মহাশয় নিজে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারভুক্ত। তিনি দীর্ঘকাল সহকারী সেনসাস্ অফিসারের পদ অলঙ্কৃত করেন।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১৭, সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণার অনন্তর্গত বড়িষা গ্রামে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন এই বংশের সৌভাগ্যসূর্য প্রায় অস্তমিত। ক্ষীরোদচন্দ্রের পিতা কালীমোহন রায়চৌধুরী। তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। অতিশয় দুঃখকষ্টে ও দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বলেছিলেন "আমি বড় কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছি। সরিকানি বিবাদে ও মামলা মোকদ্দমায় আমার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন আমি তের বৎসরের বালক। সেই সময়ে আমি হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। যেদিন আমার পিতার মৃত্যু হইল সেদিন আমাদের ঘরে একটি কপর্দ্দকও ছিল না। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় নির্বাহ করেন এমন কোন আত্মীয়-স্বজনও

ছিলেন না। পিতার শবদেহ বাহিরে পড়িয়া আছে; অর্থাভাবে সেই দেহ দাহ হইবার তখনও সংস্থান হয় নাই; আর এদিকে জ্ঞাতিগণের চক্রে, আদালতের এক পিয়াদা সেই সময়ে এক ক্রোক পরওনা লইয়া আমাদের বাড়ীতে সমুপস্থিত। আমার হাতে একখানি সোনার বাজু ছিল। দুঃখিনী মা আমার সেই মর্ম্মযন্ত্রণার সময়, আমার সেই বাজুখানি লইয়া, বন্ধক দিয়া, কয়েকটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই টাকাতেই পিতৃদেবের সৎকার হইল। তখন আমার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জলপানির চারিটি মাত্র টাকা সম্বল, আর পৈতৃক আয় মাসিক বড়জোর দেড় টাকা দুই টাকা হইবে।" ক্ষীরোদচন্দ্রের নিজমুখের এই জীবনস্মৃতি থেকে, তাঁর বাল্য ও ছাত্রজীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী অবগত হওয়া যায়। এই দারিদ্র্যদুষ্ট জীবনে তাঁদের একমাত্র সহায় সম্বল ছিলেন তাঁদের পুরাতন গৃহভৃত্য হারানন্দ সাতরা। ক্ষীরোদচন্দ্র পরিণত বয়সে এই হারানন্দ সাতরার কাছে তাঁর অপরিশোধ্য ঋণের কাহিনী স্মরণ করে অশ্রুসম্বরণ করতে পারেননি।

উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা হতশ্রী ও ম্লানগরিমায় নিমজ্জিত হয়। সংসার সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত পিতা কালীমোহন তাঁর পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যাননি। বরং তিনি তের বৎসরের শিশুপুত্র ক্ষীরোদচন্দ্রের উপর এক বড় পরিবারের বোঝা নির্মমভাবে চাপিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দুঃখিনী জননী, কনিষ্ঠ ভাই-বোনের ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব কার্যতঃ তাঁর উপর অর্পিত হল। ক্ষীরোদচন্দ্র গোড়া থেকেই হিন্দু স্কুলের ছাত্র। ছাত্রজীবনে তিনি আগাগোড়া মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। নানা অভাব অনটনের মধ্যেও ক্ষীরোদচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় চারি টাকার জলপানি পান। ছাত্রবৃত্তির খাতিরে তিনি হিন্দু স্কুলে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর সময়ে ক্ষীরোদচন্দ্র হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

ছাত্রজীবনে ক্ষীরোদচন্দ্র পায়ে-হেঁটে বড়িষা থেকে হিন্দু স্কুল এবং স্কুল থেকে বড়িষা যাতায়াতে প্রত্যহ প্রায় এগারো ক্রোশ পথ হেঁটেছেন। কেবল তাই নয় স্কুলের ছুটির পর প্রায়শঃ তিনি খিদিরপুর থেকে বাজার করে বাড়ী ফিরেছেন। কোন কোন দিন পনের সের থেকে আধমন পর্যন্ত মোট বহন করেছেন। পথে ব্যাপারীদের সঙ্গে কথাবার্তায় তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করে জীবনপথের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। হিন্দু স্কুলে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান। হিন্দু স্কুলের উপযুক্ত তাঁর কোন বেশভূষা ছিল না। জুতার অভাবে তিনি খালিপায়ে বিঘ্নসঙ্কুল পথ পরিক্রমণ করতেন—এরূপ সুকঠিন জীবন

সংগ্রামের মধ্যে তিনি তাঁর ছাত্রব্রত উদ্‌যাপন করেন। কিন্তু অধ্যাবসায়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিভান্বিত ব্যক্তির কাছে পার্থিব কোন বাধাই তাঁর অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পারে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। ক্ষীরোদচন্দ্রের সমগ্র জীবন এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনে ক্ষীরোদ-জননীর প্রভাব ছিল অদ্বিতীয়। এই প্রসঙ্গে 'অমৃত বাজার পত্রিকার' অভিমত স্মরণযোগ্য। "His mother who has the greatest influence over his life and for whom the son retained the tenderest memory and before whom who behaved like a child till the mother's death about 8 years ago—was an illiterate woman, but a very intelligent and poious Hindu woman. She was austire in her religious observances and could commit to memory in her old age Sanskrit mantras'. The mother gave to two sons and two daughters education. Education of girls half a century ago under considerable difficulties was an admirable thing." উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাঙলার শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে যুগ পরিবর্তনের নব নব সংকেত প্রকট হয়ে ওঠে। বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতির পালাবদলের এবং নবযুগ চেতনার প্রধানতম উৎসকেন্দ্র ছিল কোলকাতা হিন্দু স্কুল।

হিন্দু স্কুলের মেধাবী ছাত্ররূপে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চোদ্দ টাকা বৃত্তি অর্জন করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে 'হিন্দু কলেজ' প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। ক্ষীরোদচন্দ্র অতঃপক প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে এফ, এ (১৮৬৯ খৃঃ) এবং বি, এ (১৮৭২ খৃঃ) পাশ করেন। এফ. এ. পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য তিনি বত্রিশ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ক্ষীরোদচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম শ্রেণীর স্নাতক। বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে নবম স্থান অধিকার করে তিনি পঞ্চাশ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম. এ (ইতিহাস) অর্জন করে ছাত্রব্রত সমাপ্ত করেন।

বাঙলার শিক্ষাজগতে ক্ষীরোদচন্দ্র একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। দুঃখের বিষয় ক্ষীরোদচন্দ্র অধুনা এক প্রায়বিস্মৃত নাম। সেকালের সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যতিরেকে অন্য কোন সরকারী চাকুরীর অন্বেষণ করেননি— শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোন সরকারী বৃত্তিও গ্রহণ করেননি। ক্ষীরোদচন্দ্র

আজীবন শিক্ষাব্রতী। এম. এ. ক্লাসের ছাত্র জীবনে অর্থাৎ ১৮৭৩ (জুন) খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হন। 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে শিক্ষাব্রত কর্মে প্রথম প্রবেশের এই সংবাদটি পাওয়া যায়। কিন্তু জন্মভূমি (আষাঢ় ১৩০৩) পত্রিকায় নিজ জীবনবৃত্তান্ত পরিবেশন কালে তিনি বলেছেন—"এম. এ. পাশের পরেই আমি শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হই এবং আজি পর্যন্ত শিক্ষকতা কার্য্যেই নিযুক্ত আছি।" সরকারী বিবরণে দেখা যায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেই ক্ষীরোদচন্দ্র কর্ম গ্রহণ করেছেন।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী অবিভক্ত বাঙলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন সরকারী স্কুল কলেজ ও শিক্ষাদপ্তরে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। উত্তরপাড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলে শিক্ষকতার পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাগলপুরের সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। (১৮৭৭-৭৮) খৃষ্টাব্দে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে প্রধান শিক্ষক, কটক রাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুল (১৮৭৬-৭৭ ও ১৮৭৮-৭৯), প্রধান শিক্ষক 'পুরী জিলা স্কুল' (১৮৭৯-৮০)। প্রধান শিক্ষক, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল (১৮৮০-৮২), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ (স্কুল বিভাগ ১৮৮২-১৮৮৬), সাঁওতাল পরগণার (ডুমকা) ডেপুটি ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস্ (১৮৮৭-১৮৯০) প্রধান শিক্ষক, ছাপড়া জিলা স্কুল (১৮৯১-১৮৯৬)। প্রধান শিক্ষক, হুগলী কলেজিয়েট স্কুল (১৮৯৬-১৯০১), অধ্যক্ষ, হুগলী কলেজ (১৮৯৮, জুলাই-অক্টোবর)। ১৯০১ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ক্ষীরোদচন্দ্র, কটক রাভেনশ' কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কটকে আসেন। কটক নগরীতে, ১৯১৬ (৩০শে জুন) খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

১৮৭৩-১৯০৩, এই ত্রিশ বৎসরকাল ক্ষীরোদচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে কর্মসূত্রে ওতঃপ্রোত ছিলেন। এই কাল উনবিংশ শতকের বাঙলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। বঙ্গের নবজাগরণের পদসঞ্চারণের ইতিহাস যাঁরা পর্যালোচনা করেছেন—তাঁরা এর তাৎপর্য অনুমান করতে পারবেন। শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম স্বাদেশিকতা বঙ্গের জীবন জগতের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের যুগচাঞ্চল্য জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ক্ষীরোদচন্দ্র সেকালের স্কুল কলেজের কৃতি ছাত্র এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরূপে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের

নবজাগরণের শুভবাদকে অঙ্গীকার করে বঙ্গদেশে বরণীয় হয়েছিলেন। আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার ছিল ক্ষীরোদচন্দ্রের জীবনের ব্রত। একাধারে শিক্ষক—সাময়িক পত্রসেবী ও সুলেখকরূপে তিনি এই অনুন্নত সমাজে জ্ঞান ও বিদ্যাবিস্তারে আমৃত্যু অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উনবিংশ শতকের শেষপাদে বঙ্গদেশ ছাড়াও বিহার উড়িষ্যার শিক্ষাজগতে তিনি নবযুগ চেতনার সঞ্চার করেন। সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস্ এবং ভাগলপুর ও ছাপড়া সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে ক্ষীরোদচন্দ্র বিহার প্রদেশে আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ছাপড়া বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণের সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল নগণ্য, তাঁর শিক্ষাদান নৈপুণ্যে ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সাতশোতে উন্নীত হয়। বিহার প্রদেশ শিক্ষক সম্মেলন ক্ষীরোদচন্দ্রকে নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠপুস্তক প্রণয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য সভাপতি নির্বাচিত করে। বিহারের বিদ্যালয় সমূহের নিম্নশ্রেণীর পাঠক্রম প্রবর্তনে তাঁর সুপারিশসমূহ অভিনন্দিত হয়। তিনি ভারতবর্ষ তথা এই প্রদেশের লোকায়ত-গল্প-কথা ও ভাষাগুলির সংকলন ও প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিহার প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ দাসের মত ক্ষীরোদচন্দ্রও এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উৎকল প্রদেশে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে ক্ষীরোদচন্দ্রের নাম অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। তিনি র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুল, পুরী জিলা স্কুল ও র‍্যাভেনশ' কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ-রূপে বিগত শতকের শেষ পাদে উৎকলের জনমানসে জাগৃতির মন্ত্র ছড়িয়ে দেন। কেবল তাই নয়, উৎকলকে তিনি নিজ মাতৃভূমির মর্যাদাদান করে অবসরের পর এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই উৎকল ভূমিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ জীবনে উৎকল ভূমিই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। কটক নগরী থেকে তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'Star of Utkal' নিজ সম্পাদনায় প্রচার করেন। সে যুগে উৎকলের জনমানসে এই পত্রিকার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কটক নগরীতে হিন্দু কলেজ (১৯১৫) নামে একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠাও ক্ষীরোদচন্দ্রের অনন্য কীর্ত্তিরূপে বিবেচিত। স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তথাপি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিদ্যায়তনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। যৌবনে তিনি শিক্ষাদান ব্রতে দীক্ষিত হন—শিক্ষাদানেই

তাঁর জীবন নিঃশেষিত হয়। এদেশের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান শিক্ষকগণের মধ্যে ক্ষীরোদচন্দ্র একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর অধ্যাপনা নৈপুণ্যে ছাত্রসমাজ মন্ত্রমুগ্ধবৎ থাকতো। উনিশ শতকের শেষ অব্দে বঙ্গের শিক্ষাজগতে ক্ষীরোদচন্দ্র ছিলেন দেশমান্য শিক্ষক। ছাত্রসমাজের উপকারার্থে তিনি বাঙলা-হিন্দী-ওড়িয়া ও ইংরেজী ভাষায় একাধিক পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর ছাত্র পাঠ্যপুস্তক সমূহ সর্বত্র বহুল সমাদৃত হয়। শুধু গতানুগতিক পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষাদানে তিনি পরিতৃপ্ত থাকতেন না—দেশ ও জাতির গৌরবের কাহিনী ও স্বাদেশিকতার মন্ত্র তিনি ছাত্র সমাজে মুদ্রিত করে দিতেন। ছাত্রগণের নৈতিক ও চারিত্রিক মান উন্নয়নের দিকে তাঁর সুতীক্ষ্ণ নজর ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিল—"He was one of the ablest headmasters and his pupils who can be counted by thousands are adorning different walks of life in Bengal, Behar and Orissa" (জুলাই ৪, ১৯১৬)। কৃতী ছাত্র সৃষ্টির মধ্যেই শিক্ষকের গৌরব। তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে জগদীশ মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, হীরালাল বসু, চারুচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ বঙ্গের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে জগদীশ মুখোপাধ্যায় ক্ষীরোদচন্দ্রের পদাঙ্কানুসারী অদ্বিতীয় শিক্ষকরূপে বঙ্গসমাজে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

ছাত্রজীবনেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট (৭ই ভাদ্র) তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য হয়। এই সময়ে কয়েকজন যুবককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই তারিখে ২১ জন যুবক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, শ্রীনাথ দত্ত, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ ব্যক্তি ঐ দিনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। সম্ভবতঃ ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ২১ জন যুবকের সহিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ক্ষীরোদচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন শ্রীনাথ দত্ত, রজনীনাথ রায়, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি। এরা সকলেই উনবিংশ শতকের বাঙলাদেশের কৃতবিদ্য পুরুষ। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র হিন্দুসমাজে বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আসামের সুপ্রসিদ্ধ রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া

বাহাদুরের কন্যার সহিত তাঁর তৃতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। গুণাভিরাম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন। তিনি নব্য আসামের অভ্যুদয়ের অন্যতম পথিকৃত। ব্রাহ্মধর্মে প্রবেশের পর ক্ষীরোদচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের অনুগামী হয়ে নানাবিধ সমাজ সংস্কার কর্মে ব্রতী হন। ব্রাহ্মসমাজ পাড়ায় তিনি বাসভবন নির্মাণ করেন। ব্রাহ্ম হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। ধর্ম ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমদর্শী ও উদার। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁর খুব অনুরাগ ছিল। রাজনারায়ণ বসু তাঁকে বৈষ্ণব বলে জানতেন। বৈদ্যনাথ, রাজনারায়ণের সঙ্গে ক্ষীরোদচন্দ্রের পরিচয় ঘটিয়ে দেন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ও সাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথ বসু। যোগীন্দ্রনাথ পরে রাজনারায়ণকে বলেন—ইনি বৈষ্ণব নন—একজন ব্রাহ্ম। রাজনারায়ণ সেই মুহূর্তে ক্ষীরোদচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন—"আপনিই প্রকৃত ব্রাহ্ম, সকল ধর্মেই যাঁহার অনুরাগ—তিনি আমার নমস্য।" আবার ক্ষীরোদচন্দ্রের এই বৈষ্ণবতার জন্যই শিশিরকুমার ঘোষ তাঁকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন। ক্ষীরোদচন্দ্র বৈষ্ণব পদ সংকলন, প্রেমহার নামক একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। উত্তরপাড়ার সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক জীবনে ক্ষীরোদচন্দ্র কবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ৫ই শ্রাবণ, ১২৮০ বঙ্গাব্দে যদুগোপালের সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক সমাচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ক্ষীরোদচন্দ্র এই পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করলে ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ক্ষীরোদবাবু হন আসামী, আর নববিধানের বাবু উমানাথ গুপ্ত হন ফরিয়াদী এবং প্রথিতনামা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় হন প্রধান সাক্ষী। পরে আপোষে সে মোকদ্দমার মীমাংসা হয়। তৎকালীন বিধবা বিবাহ আন্দোলনে ক্ষীরোদচন্দ্রের সমর্থন ছিল। তিনি সম্ভবতঃ নিজেও বিধবা বিবাহ করেছিলেন—হিন্দু-প্যাট্রিয়ট পত্রিকা (৩ জুলাই ১৯১৬) এই প্রসঙ্গে লিখেছিল—

"In early life he hod been a Brahmo and we believe he married a widow".

ক্ষীরোদচন্দ্র স্বদেশভক্ত শিক্ষক। ইংরাজ শাসনকালে তাঁর অগণিত ছাত্র সমাজ তাঁর মুখেই দেশকে ভালবাসার মন্ত্র লাভ করেছিল—জীবনের অবসর মুহূর্তগুলিকে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত রেখেছিলেন। ধর্ম-কর্ম-সারস্বতচর্চা তাঁর সব সাধনার লক্ষ্য ছিল স্বদেশ। দেশপ্রাণ গোখেলের মৃত্যুসংবাদে তিনি এত দূর মর্মাহত হয়েছিলেন যে তার ফলে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বস্তুতঃ স্বদেশের জন্য পরিশ্রমের ফলেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তিনি সেকালের দেশমান্য ব্যক্তিগণের সংস্রবে আসেন মূলতঃ স্বদেশ সেবা ও সারস্বত চর্চার পথে। তিনি বঙ্গের বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের সুনিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছিলেন—এঁদের অনেকের স্মৃতিকথাও সাময়িক পত্রে প্রকাশ করে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন, গঙ্গাধর কবিরাজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, বরদাচরণ মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট আরমষ্ট্রঙ্গ সাহেব প্রমুখ বরেণ্য দেশপ্রাণ বঙ্গসন্তানগণের কথা তিনি ১৩২৪ বঙ্গাব্দের (শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন) নব্যভারত পত্রিকায় ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই রচনাধারার মধ্যে বঙ্গসমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও মহত্ত্বের পরিচয় অনুমান করা যায়।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী একজন সাহিত্যিক ও সাময়িকপত্রসেবী। সম্ভবতঃ ক্ষীরোদচন্দ্রের এই পরিচয় একালে একপ্রকার অজ্ঞাত। বাঙলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'বঙ্গবাসী' একটি স্মরণীয় নাম। সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'র প্রচার ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচারিত থাকলেও উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিংশ শতকের প্রথম আড়াই দশক এদেশে সংবাদপত্রের সমার্থক শব্দ ছিল 'বঙ্গবাসী'। স্বল্পমূল্যের এই সুবৃহৎ পত্রিকাখানি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তদীয় বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের সহযোগে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবাসী পত্রিকা প্রবর্তনে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বাঙলা সাময়িকপত্র সম্পর্কিত যে সব পুস্তক বা নিবন্ধাদি ইংরেজী বা বাঙলা ভাষায় এতাবৎ রচিত হয়েছে—সেগুলির মধ্যে 'বঙ্গবাসী'র যথার্থ বিবরণ আজও লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। সেজন্য 'বঙ্গবাসী' প্রবর্তনে ক্ষীরোদচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কাহিনীও অবিদিত থেকে গেছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে ক্ষীরোদচন্দ্রের প্রথম পরিচয় কটকে ১৮৭৬।৭৭ খৃষ্টাব্দে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সেজদাদা গিরীশচন্দ্র তখন কটক র‍্যাভেনশ' কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক। ক্ষীরোদচন্দ্র তখন কটক র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। গিরীশচন্দ্র ও ক্ষীরোদচন্দ্রও দুজন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এই সূত্রেই যোগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্রের ভাইয়ের মত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে আসেন। এই সময়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র 'বঙ্গবাসী'

পত্রিকার প্রবর্তনের আয়োজন কার্যে ক্ষীরোদচন্দ্রের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেন। 'বঙ্গবাসী' প্রবর্তনের সময় হতে ক্ষীরোদচন্দ্র এই পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা, লেখক ও সহায়ক ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত 'জন্মভূমি' (মাসিক) পত্রিকা লিখেছিল,—"বঙ্গবাসী'র উৎপাত্ত কাল হইতে ক্ষীরোদবাবুর সহিত 'বঙ্গবাসী'র সংস্রব। প্রথম দেড় বৎসর কাল 'বঙ্গবাসী'র জন্য তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কি লেখা, কি গ্রাহক-সংগ্রহ, কি লেখক সংগ্রহ, কোন বিষয়েই ক্ষীরোদবাবুর কিছুমাত্র ক্রটি ছিল না। 'বঙ্গবাসী' সংবাদ-পত্রকে ক্ষীরোদবাবু তখন যেন আপনার বলিয়া ভাবিতেন। 'বঙ্গবাসী'র সুখে ক্ষীরোদবাবুর সুখ, 'বঙ্গবাসী'র দুঃখে ক্ষীরোদবাবুর দুঃখ। 'বঙ্গবাসী'র সমৃদ্ধিতে ক্ষীরোদবাবুর সমৃদ্ধি—তখন এই ভাবই ছিল। কিন্তু হায় কালে কালে সমস্তই লয় পাইয়াছে।" (জন্মভূমি—আষাঢ় ১৩০৩) 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা 'ক্ষীরোদ বিয়োগে' লিখেছিল—"বঙ্গবাসী'র সূত্রপাতে ক্ষীরোদচন্দ্র স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সখ্যসূত্রে, 'বঙ্গ-বাসী'র শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ঐকান্তিক ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নহে।" (বঙ্গবাসী, ২৪শে আষাঢ়, ১৩২৪) ক্ষীরোদচন্দ্র নিজেও লিখেছেন "তিন বৎসর পর্যন্ত আমার পরামর্শমত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা বাহির হইত। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম 'বঙ্গবাসী'তে উহাই আমার শেষ প্রবন্ধ। (নব্যভারত, পৌষ, ১৩২২)। 'বঙ্গবাসী' প্রবর্তন ও 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে ক্ষীরোদচন্দ্রের সুগভীর সংস্রবের বিবরণ ক্ষীরোদচন্দ্রকে লিখিত যোগেন্দ্রচন্দ্রের পত্রাবলী হতে অবগত হওয়া যায়। (নব্যভারত, পৌষ, ফাল্গুন ১৩২২, শ্রাবণ ১৩২৩, শ্রাবণ, ১৩২৪ দ্রষ্টব্য) 'বঙ্গবাসী'তে ক্ষীরোদচন্দ্র ভুরি ভুরি লিখেছিলেন—'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত ক্ষীরোদচন্দ্রের রচনাবলী উদ্ধার বর্তমানে প্রায় অসম্ভব। 'বঙ্গবাসী'র পুরাতন ফাইল অধুনা অবলুপ্ত বলা যেতে পারে।

অবসর গ্রহণের পর ক্ষীরোদচন্দ্র কটক নগরীতে নিজ সম্পাদনায় ইংরেজী সাপ্তাহিক 'Star of Utkal (১৯০৫ খৃঃ) প্রকাশ করেন। এই সাপ্তাহিকখানি প্রথমদিকে সপ্তাহে দু'বার পরে তিনবার পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'Star Press' স্থাপন করেন। এই ইংরেজী সাপ্তাহিকখানিকে তিনি দৈনিকে রূপান্তরিত করার আয়োজন করেছিলেন। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই Star Press জামিন দিতে অস্বীকার করায় 'Star of Utkal' বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকাখানি সম্পর্কে Ratnakar (৩, জুলাই, ১৯১৬) পত্রিকা লিখেছিল—"He started the 'Star of Utkal' the newspaper in

English hitherto published from this part of the Country Under his parental care the 'Star' which was started as a weekly paper within a few years came to be published thrice in a week and it was confidently expected that it would be soon raised to the status of daily paper when the bolt from the blue came in the shape of a demand of security by the Government The sturdy patriotism of Khirod Chandra rebelled against this and he preffered to abandon the love of his last days."

বাঙলা সাময়িকপত্র জগতে ক্ষীরোদচন্দ্রের বিশিষ্ট অবদান 'মৃণ্ময়ী' (১৯০৯)। ক্ষীরোদচন্দ্রের সুদক্ষ সম্পাদনায় 'মৃণ্ময়ী' বেশ কয়েক বৎসর প্রচারিত ছিল। পরে পত্রিকাখানি অবলুপ্ত হয়। 'ধর্ম্মবন্ধু' (পাক্ষিক-১২৮৮) পত্রিকাখানির সঙ্গে ক্ষীরোদচন্দ্রের ব্যাপক যোগাযোগ ছিল। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন শশিভূষণ বসু। পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ধর্ম্মবন্ধু' মাসিক আকার ধারণ করে। এই পত্রিকাখানির প্রচার, প্রসার ও সম্পাদনায় ক্ষীরোদচন্দ্রের সহযোগিতা ছিল অবারিত। বঙ্গবাসী, স্টার অফ উৎকল, মৃণ্ময়ী, ধর্ম্মবন্ধু প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা ছাড়াও নব্যভারত, জন্মভূমি, সাহিত্য, সঞ্জীবনী, সাপ্তাহিক সমাচার এবং অন্যান্য বহু পত্রিকায় ক্ষীরোদচন্দ্র সাহিত্য-ইতিহাস-জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখেছেন। সাময়িক পত্রের চাহিদা পূরণ করেই তাঁর লেখকসত্তা নিঃশেষিত হয়নি।

ক্ষীরোদচন্দ্র বাঙলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুলেখক ছিলেন। তাঁর ইংরেজী রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর। সেকালে 'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সমতুল্য ইংরেজী লেখক ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র। শ্লেষে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শিশিরকুমার। সেকালের ইংরেজ রাজপুরুষেরা ক্ষীরোদচন্দ্রের ইংরেজী লেখার সমাদর করতেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সিভিলিয়ান ও ভারততত্ত্ববিদ Sir Edward Gait তাঁর ষ্টার অফ উৎকলের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি প্রত্নতত্ত্ব, কি সমালোচনা সকল বিষয়েই ক্ষীরোদচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখনী সংযত—ভাব পরিস্ফুট—ভাষা সরল ও সুন্দর। বিগত শতকে আমাদের সাহিত্য তাঁর লেখনী সম্পদে পরিপুষ্ট হয়। ক্ষীরোদচন্দ্র প্রথম বাঙালীকে ডারউইনের থিয়োরী বুঝিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিবৃতিতেই

ছিল তাঁর আনন্দ। তাঁর 'মানব প্রকৃতি' বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদমূলক গ্রন্থ। সেকালের বঙ্গভাষায় এরূপ চিন্তাকর্ষক কোন পুস্তক ছিল না। সে যুগে এরূপ একখানি পুস্তক রচনার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা ও মানসিক সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা চলে এ যুগে বঙ্গদেশে পালি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার সূত্রপাত করেন ক্ষীরোদচন্দ্র। তিনি বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র ভগবান বুদ্ধের একজন ভক্ত ও উপাসক। মুখ্যত তাঁর চেষ্টাতেই চট্টগ্রাম কলেজ ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা চর্চার প্রবর্তন হয়। তাঁর বহু চেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম কলেজে পালি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। সেই পদে তিনি স্বামী ধর্মবংশ স্থবিরকে নিযুক্ত করেন। চট্টগ্রামে তিনি যে পালি শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন আজ তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে সমগ্র বঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ক্ষীরোদচন্দ্র বৌদ্ধধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-শাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। এ বিষয়ে তিনি ইংরেজী ও বাঙলায় প্রভূত লিখেছেন। নেপাল-তিব্বত-ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দূরদেশ থেকে বৌদ্ধমূর্তি সংগ্রহ তাঁর অন্যতম আগ্রহের বিষয় ছিল। পুত্রগণকে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রালোচনায় অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁদের নিয়ে বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্রবিষয়ক নিবন্ধ লিখিয়ে পূর্ণানন্দ স্বামীর কাছে পাঠাতেন। বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর এই প্রগাঢ় অনুরাগ আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধির কারণ হয়েছিল। তাঁর কিছু কিছু বৌদ্ধ-শাস্ত্র-বিষয়ক নিবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পালি শিক্ষার প্রচার ও বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনা তাঁর কাছে ছিল সারস্বত ব্রত। ইতিহাসের কৃতী ছাত্র ক্ষীরোদচন্দ্র ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে সমধিক আগ্রহী ছিলেন। উড়িষ্যায় অবস্থান কালে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তাঁর 'The Antiquities of Orissa' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি প্রণয়নে তিনি প্রভূত সহায়তা করেন। কোনারকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে, ক্ষীরোদচন্দ্র ঐ ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও খনন কার্যের নেতা বিষানস্বরূপকে উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিষানস্বরূপ তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থ The Antiquities of Orissa ও Konarak গ্রন্থের ভূমিকায় ক্ষীরোদচন্দ্রের সাহায্য ও সহযোগিতার স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন। বাঙলা দেশের আদিবাসী সম্পর্কিত তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ 'Aborigines of Bengal' নৃতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে একখানি স্মরণীয় সংযোজন। সাহিত্য-ইতিহাস-জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধাক্ষেত্রে ক্ষীরোদচন্দ্র সহজ ও স্বাচ্ছন্দ বিচরণ করতেন। তাঁর সারস্বতচর্চা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :—

"Khirodchandra was a famous English and Bengali writer. His history of India in Bengali language was a text book at one time. His history of evolution of man has been translated in other languages.

He wrote voluminously in Buddhism. The Bengali Magazines of Calcutta used to clamour for his articles. He was considered an authority on the ethnology of India. The Late Dr. Rajendralal Mitter expressed his undebtedness to Khirod Chandra Ray in the pages of the celebrated book titled, 'The Antiquities of Orissa'. Executive Engineer Mr. Bishan Swarup, who was appointed by Bengal Government to carry an excavation of the black marble Pagoda of Konarak near Puri and wrote the history of the work and on the spread of Buddhism in Orissa, has also thanked Khirod Chandra in his book Called, "Konarak."

গ্রন্থ পঞ্জী

১। বনফুল (সন্দর্ভ) ১২৯২

২। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রশ্নোত্তর (?)

৩। সমগ্র ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৬ষ্ঠ সং ১৯০০)

৪। প্রেমহার (পদাবলী সংগ্রহ) ১২৯৩

৫। মানবপ্রকৃতি। ১ম খণ্ড, ১৮০৩, ২য় সং ১৯১০

৬। মানব প্রকৃতি। ২য় খণ্ড (?)

৭। কুসুমিকা (?)

৮। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (?)

৯। বিবিধ প্রবন্ধ (?)

১০। Aborigines of Bengal (?)

১১। শাক্যচরিত—বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন (?)

ক্ষীরোদচন্দ্র উপরিবর্ণিত পুস্তকগুলি ছাড়াও অনেকগুলি ইংরেজী কাব্য ও গদ্যগ্রন্থের অর্থপুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর 'মানব প্রকৃতি' তামিল, তেলেগু ও মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি হিন্দীতে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' ও ওড়িয়া ভাষায়, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রণয়ন করেন। ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত, পালি,

হিন্দী, ওড়িয়া ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল অবিসংবাদিত। এতকাল পরে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও নিবন্ধাদির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণয়নও দুরূহ কর্ম।

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বহুবিদিত। এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাহিনী বিস্মরণযোগ্য নয়। ক্ষীরোদচন্দ্র এই বংশের একজন কৃতী সন্তান। উনবিংশ শতকের শেষ তিন দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দেড় দশকে বঙ্গের শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্ষীরোদচন্দ্র একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। একদা বাঙলার শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের এই যুগপুরুষ ক্ষীরোদচন্দ্র অধুনা বিস্মৃত। শিক্ষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি প্রয়াসে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার কাহিনী বর্তমানকালেও স্মরণযোগ্য। বক্ষমান নিবন্ধে ক্ষীরোদচন্দ্রের প্রস্ফুট জীবনের কয়েকটি বিশেষত্বের চিত্র উন্মোচন করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে। স্বাধীনতাউদ্ধত এই আত্মবিস্মৃত জাতির সম্মুখে তাঁর সংগ্রামক্ষুব্ধ উদার চরিতকথার পর্যালোচনা একালেও মূল্যবান বিবেচনা করেছি। উনবিংশ শতকের সূচনায় ডিরোজিও রিচার্ডসন প্রমুখ ভারত প্রেমিকগণ বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের যে নিশান উড্ডীন করেছিলেন—দেশীয় বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি সেই মার্গের অনুগামী হয়ে বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করেন। রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, জগবন্ধু লাহা, ভুবনমোহন সেন, বসুমণি গুপ্ত প্রমুখ শিক্ষাবিদ-গণের পদাঙ্ক অনুসারী ছিলেন ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ক্ষীরোদচন্দ্রের শিক্ষার আদর্শে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের অভ্যুদয় হয়েছে। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার বহু দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ক্ষীরোদচন্দ্রের হাতে গড়া। বাঙলার বাইরে বৃহত্তর বঙ্গের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, ক্ষীরোদচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। এঁরা বাঙালীর কর্মশক্তির আধার। দেশাত্মবোধের অগ্রদূত। এঁরা অন্ধকার দেশে নিয়ে আসেন আলো। প্রভাতী মঙ্গলালাপে আত্মবিস্মৃত জাতিকে ঘুম ভাঙিয়ে জাগ্রত করেন। নিদ্রিত স্বদেশ-স্বজাতির মায়া কাটিয়ে, বাঙলার ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করে বৃহত্তর বঙ্গে অখণ্ড ভারতের সার্বজনীন জাতীয় ক্ষেত্রে আপনাকে উৎসর্গ করেন। উনবিংশ শতকে বাঙলাদেশে ক্ষীরোদচন্দ্র ছিলেন এমনই একজন স্মরণীয় পুরুষ।

উল্লেখ পঞ্জী

১। A. K. Ray. A Short History of Calcutta, Census of India, Vol. VII., Pt. I.— 1901.

২। লালমোহন বিদ্যানিধি : সম্বন্ধ নির্ণয়, ২য় খণ্ড

৩। ঐ : সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিশিষ্ট। ১৩০৭)

৪। সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় : কালীক্ষেত্র দীপিকা বা কালীঘাটের পুরাতত্ত্ব (১৮৯১)।

৫। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম : কালীঘাট ইতিবৃত্ত (১৩৩২)

৬। জন্মভূমি : আষাঢ় ১৩০৩

৭। নব্যভারত, অগ্রহায়ণ ও মাঘ ১৩৩১

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙলা সাময়িক পত্র। ২য় খণ্ড (১৩৫৮)

৯। Hooghly College Register (1939)

১০। The Statesman. Dec 23, 1976.

১১। শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত (সিগনেট সং ১৩৫৯

১২। বঙ্গবাসী : ২৪, আষাঢ় ১৩২৪

১৩। নব্যভারত, পৌষ, ফাল্গুন, ১৩২২

১৪। নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩২৩

১৫। নব্যভারত শ্রাবণ, ১৩২৪, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, ১৩২৪

১৬। Ratnakar, July 3, 1916

১৭। Amrita Bazar Patrika, July 4 and July 12, 1916

১৮। Hindu Patriot, July 3, 1916

১৯। Presidency College, Centenary Volume (1956)

২০। Presidency College Register.

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

গত শতকে বাঙলার সারস্বত সমাজে 'মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি' একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাস পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে সাম্প্রতিক সাহিত্যে তরঙ্গ বিক্ষেপ উচ্ছ্বাসিত হলেও অক্লান্তকর্মী বহু জ্ঞান-সাধকের কীর্তি-নিচয়ের প্রতি আজও সুবিচার হয়ে ওঠেনি। আমাদের সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষা একদা যাঁদের সেবা ও সাধনায় ঋদ্ধ হয়েছিল, সেই অনর্ঘ সম্পদ সযত্নে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, এমন কি—এবম্প্রকার বিদ্বদজনেরাও প্রায়-বিস্মৃত। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি সম্পর্কে এ কথাগুলি নিশ্চিত সত্য।

বিদ্যা-জ্ঞান-কর্ম-ধর্ম ও চরিত্র গৌরবে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব। স্বদেশী শিক্ষা ও স্বাজাত্য সংস্কৃতির ঐকান্তিক অনুরক্ত মহেন্দ্রনাথ আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নূতন তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। যুক্তিপন্থ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তিনি যে জ্ঞানসাধনা করে গিয়েছেন, আমাদের জ্ঞানমার্গী বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সেজন্য তিনি অগ্রপথিকের মর্যাদা পাবেন। শিক্ষা ও সাহিত্য সেবায় উৎসর্গীকৃত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কেবলমাত্র বাঙলা মনন সাহিত্যেই নয়, বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও আলোচনার পুণ্য সারস্বত মন্দির 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' প্রাথমিক গঠনযুগে তাঁর অক্লান্ত সেবা সাধনা, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও পরিশ্রম একটা প্রোজ্জ্বলন্ত ইতিহাসের মত। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির জীবন-সাধনা ও কীর্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় একালে অনেককে বিস্মিত করবে।

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ১২৬০ (১৫ই চৈত্র) বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের যে বংশে আবির্ভূত হয়ে রাজা রামমোহন রায় নবযুগের 'ভারতপথিক' গৌরব অর্জন করেন মহেন্দ্রনাথ সেই রায়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথ এই বংশের জ্যেষ্ঠশাখার সন্তান। মহেন্দ্রনাথ গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণের পুত্র। পিতা গোপীনাথ রায় চূড়ামণি। রায় বংশের এই শাখা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেনি। মহেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রজীবনে দেশে ইংরেজী শিক্ষার জয়যাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু দেশীয় পন্থায়ই তাঁর শিক্ষারম্ভ। কিছুকাল স্বগৃহে 'বর্ণমালা' 'শুভঙ্করী' 'গণিত' শিক্ষার পর মহেন্দ্রনাথ খানাকুলে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রতিষ্ঠিত 'ইংরেজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে' প্রবিষ্ট

হন, অতঃপর তিনি কোলকাতায় এসে 'সংস্কৃত কলেজে' অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশিকা পর্যন্ত পাঠগ্রহণের পর দরিদ্রতা নিবন্ধন পড়াশুনা ছেড়ে দেন। পুনরায় সংস্কৃত টোল বিভাগে পাঠ সমাপ্ত করে অধ্যাপকদের কাছ থেকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি লাভ করেন। রক্ষণশীল তথা সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগী হয়েও তিনি ইংরেজী বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। দারিদ্র্য-পীড়িত মহেন্দ্রনাথের উচ্চশিক্ষার অভিলাষ চরিতার্থ হয়নি। কিন্তু কেবলমাত্র স্কুল কলেজের শিক্ষার দ্বারা যথার্থ বিদ্যার পরিমাপ হয় না। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন বিদ্যার্থী ও জ্ঞানযোগী। নিয়ত অধ্যবসায় ও গ্রন্থপাঠের দ্বারা তিনি তাঁর 'বিদ্যানিধি' উপাধিকে সার্থক করে তোলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ছিলেন আজীবন শিক্ষক, শিক্ষকতার বৃত্তি ছাড়া তিনি জীবনে অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করেননি, গতযুগে বাঙলাদেশের শিক্ষক সমাজে মহেন্দ্রনাথ একটি গণনীয় নাম। কখনও কখনও আর্থিক কষ্টে পড়ে প্রাইভেট ছাত্র পড়িয়েছেন—প্রুফ দেখার কাজ করেছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন শেষ করে মহেন্দ্রনাথ উত্তর কোলকাতার 'ব্রাউটন ইনষ্টিটিউশনে' প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগদান করেন। তখনও তিনি 'বিদ্যানিধি' উপাধি লাভ করেননি। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এডমিনিষ্ট্রেটর এল, পি, ডি, ব্রাউটনের স্মৃতিতে ব্রাউটন ইনষ্টিটিউশন স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে তাঁর অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র কীর্তিমান সেবক ব্যোমকেশ মুস্তাফী। মুস্তাফী মহাশয় লিখিত একটি নিবন্ধ হতে তা জানা যায়। পরে বিদ্যালয়টি কটন ইনষ্টিটিউশন নামে পরিচিত হয়। এই বিদ্যালয় ব্যতীত, কেশব একাডেমী, মটন ইনষ্টিটিউশন এবং কোলকাতার একাধিক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে তিনি হেড পণ্ডিতের পদ অভিষিক্ত করেন। অল্প কিছুদিন অন্য কর্মে লিপ্ত থেকে তিনি এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন, এবং আরও পরে আন্দুল স্কুল (হাওড়া), এবং ব্যাঁটরা উচ্চবিদ্যালয় (হাওড়া) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে হেড্‌পণ্ডিতী করেন। বাঙলাভাষা ও সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারে গত যুগের বাঙলাদেশে মহেন্দ্রনাথ অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। শিক্ষাবিভাগে তাঁর এই অপরিসীম নৈপুণ্যের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রবেশিকা বাঙলার পরীক্ষক নিযুক্ত করে সম্মানিত করে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাদেশের নবজাগৃতি সাহিত্য-শিক্ষা সমাজ-সংস্কার ধর্মান্দোলন এবং স্বাদেশিকতার নবজীবনাবেগ প্রত্যক্ষ করে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এই অভূতপূর্ব যুগচাঞ্চল্যের নীরব দর্শক ছিলেন না, পরন্তু তিনি এই নবযুগের অন্যতম কর্মীরূপে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষরকে মুদ্রিত করেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী মহেন্দ্রনাথ অগণিত আদর্শ মানুষ তৈরী করে যুগ প্রয়োজনকে চরিতার্থ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবিনোদ উপাধি শিরোদেশে ধারণ করে সেকালের অনেক কৃতবিদ্য মানুষ নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন। নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষায় রচিত বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকের অপ্রতুলতা ছিল। মহেন্দ্রনাথ একালের অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রপাঠ্য পুস্তক প্রণেতা ছিলেন না। মাতৃভাষায় আদর্শ পুস্তক প্রণয়ন সেকালের নূতন ভাষাসৃষ্টির যুগে দুরূহ সাহিত্যব্রত রূপে বিবেচিত হত। মহেন্দ্রনাথ সেকালের ছাত্রসমাজের জন্য অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভাষার সরলতায়, বিশুদ্ধতায়—সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-কাব্য-পুরাণ এবং চরিত্র গঠনোপযোগী বিবিধ সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গের পুস্তকগুলি সেকালের শিক্ষা-জগতে বহুল সমাদৃত হয়। মহেন্দ্রনাথ সেই ঘোরতর পাশ্চাত্যানুকরণের যুগে জ্ঞান ও যুক্তিপন্থাকে অঙ্গীকার করেছেন—আবার প্রাচীন ভারতের ভাণ্ডার থেকে চিরায়ত সম্পদসমূহ চয়ন করে নূতন যুগে নতুন ভাষায় বাণীরূপ দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় গত শতকে বাঙলার শিক্ষাজগতে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির এই অবদানকে আমরা মনে রাখিনি।

সেকালের শিক্ষাজগতে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, কিন্তু সারস্বত সাধনা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি। মহেন্দ্রনাথ প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং রক্ষণশীল সমাজে বর্ধিত হয়ে আধুনিক ভাবধারাকে যে ভাবে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিবেদিত প্রাণ মহেন্দ্রনাথের কীর্তিকথা একালে বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু বাঙলার মনন সাহিত্যে তাঁর অবদানগুলি বিস্মৃতিযোগ্য বা অবহেলার নয়। বক্ষমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর সারস্বত সাধনার আদ্যন্ত পরিবেশন সম্ভব নয়। সেজন্য এই দরিদ্র শিক্ষকের কয়েকটি মৌলিক অবদানের প্রতি সহৃদয় সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজনীয় মনে করি।

বিদ্যাচর্চা মহেন্দ্রনাথের জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিক। আমৃত্যু তিনি জ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন করেছেন। তাঁর সমগ্রজীবন বিদ্যাচর্চার এক অবিচ্ছিন্ন

ইতিহাস। এই সারস্বত ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি যে অপরিসীম ক্লেশ স্বীকার করেছেন, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের এই দেশে তা একপ্রকার বিরলদৃষ্ট ও তুলনারহিত। ছাত্রজীবনেই লেখক হিসেবে মহেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের আর্য্যদর্শনে (১২৮১)। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসেবেই নয় অচিরকাল মধ্যে তিনি আর্যদর্শনের সহসম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। 'সংস্কৃত কলেজে' অধ্যয়ন কালে 'হ্যানিমানের জীবন চরিত' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ তাঁর প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ।

মহেন্দ্রনাথ গ্রন্থকার, পত্রিকাসম্পাদক ও নিবন্ধকার। তাঁর গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধসমূহ বাঙলার চিন্তামূলক সাহিত্যের গৌরব। বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসেও মহেন্দ্রনাথের নাম বিস্মৃতযোগ্য নয়। আর্য্যদর্শনের সহসম্পাদক হলেও তিনি মূলতঃ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। কারণ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহেন্দ্রনাথের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁর অন্যান্য সম্পাদিত পত্রিকা সমূহের মধ্যে, 'পুরোহিত' (১৩০০), 'অনুশীলন' (১৩০১)। 'অনুশীলন ও পুরোহিত' (১৩০২ থেকে)। 'জন্মভূমি' (১৩০৭ থেকে)। 'সাহিত্য সংহিতা' (১৩০৭) প্রভৃতি সাময়িক পত্রসমূহের নাম করা যায়। অবশ্য শেষোক্ত পত্রিকা দুখানিতে সম্পাদক হিসেবে মহেন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত থাকত না। মহেন্দ্রনাথ এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থেকে সেকালের চলমান সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেন। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাসমূহ যাঁরা একবার উল্টে দেখার ধৈর্য স্বীকার করেছেন, তাঁরাই উঁচুস্বরে বাঁধা মহেন্দ্রনাথের সাহিত্য চেতনায় অভিভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ মহেন্দ্রনাথ আমাদের নিবন্ধ সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ভাষা সাহিত্য-ইতিহাস-জীবনী-পুরাতত্ত্ব ধর্ম-সমাজ—এসবই ছিল মহেন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয়। সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিতেও তিনি উল্লিখিত বিষয় সমূহকে আশ্রয় করে প্রবন্ধ রচনা করতেন। অন্যত্র মহেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ গবেষক। দুঃখের বিষয় তাঁর মৌলিক সাহিত্য কীর্তি-গুলির অধিকাংশই সাময়িকপত্রের ধূলিমলিন অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়নি। অধিকন্তু নিজ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধ পত্র পত্রিকার লেখকরূপে সেকালে তিনি সুধীসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। মহেন্দ্রনাথ রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ

খুব বেশী নয়, আবার এগুলির মধ্যে কিছু বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক। মহেন্দ্রনাথ রচিত, সম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থ সমূহের একটি নামতালিকা বর্তমান নিবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গ্রন্থ পঞ্জী

(১) হ্যানিমানের জীবন চরিত (?) (২) অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত (১২৯২), (৩) প্রাচীন আর্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত (১২৯২), (৪) সন্দর্ভ সংগ্রহ (১২৯৭), (৫) সচিত্র রাজস্থান, ১ম খণ্ড (১৩০৫) ভূমিকা, মহেন্দ্র বিদ্যা-নিধি, (৬) যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলী (১২৮৭), বিদ্যানিধি কর্তৃক সঙ্কলিত, (৭) পূর্ণচন্দ্র বসুর সমাজচিন্তা (১৮৮৯), প্রকাশক বিদ্যানিধি মহাশয়, (৮) ব্যাকরণ প্রবেশিকা, ২য় সং (১৮৮৯), (৯) সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর ? (১০) স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর ? (১১) ভূবিদ্যার প্রশ্নোত্তর ?

এই গ্রন্থপঞ্জীর দ্বারা মহেন্দ্রনাথের বিদ্যাবত্তার সম্যক পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না। তাঁর সাহিত্য কীর্তির মৌলিক নিদর্শনগুলি আজও গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়নি। উপরি বর্ণিত গ্রন্থ সমূহের অনেকগুলির প্রকাশ কাল সংগ্রহ করা যায়নি। বেঙ্গল লাইব্রেরীর কার্যালয়ে অধুনা দুষ্প্রাপ্য ঐ সব গ্রন্থের প্রকাশকাল জানা যেতে পারে। 'অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত' বাংলা চরিত সাহিত্যের একখানি মূল্যবান সংযোজন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। বাঙলা গদ্যের জনককল্প অক্ষয়কুমার দত্তের প্রামাণ্য জীবন চরিত প্রণয়নের জন্য তিনি বাঙলা চরিত সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের "অক্ষয় চরিত" (১২৯৪) মহেন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা। 'নবভারতে' এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, নকুড়চন্দ্র মহেন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে ঋণী। 'প্রাচীন আর্য রমণীগণের জীবন বৃত্তান্ত' আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। বঙ্গ সাহিত্যের পাঠক ও ইতিহাস লেখক সর্ব প্রথমে বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখেই এই পুস্তকখানির দ্বারা আমাদের বৈদিককালের গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং পৌরাণিক কালের 'দেবযুতি' প্রভৃতি বিদুষী মহিলা সমাজের পরিচয় প্রাপ্ত হন। তাঁর 'সন্দর্ভ সংগ্রহ' জ্ঞান ও চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ। বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক সমূহে তাঁর স্বকীয়তার কথা প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছি।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মৌলিক সারস্বতকীর্তি (১) বংশাবলী (২) রঙ্গালয়

বা বঙ্গের নাট্যশালা (৩) রামমোহন রায়ের জীবন চরিত (৪) বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস। বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই অমূল্য নিবন্ধাবলীর আজও সংহত গ্রন্থরূপ হয়নি। তাঁর এতৎ-বিষয়ক নিবন্ধমালা গ্রন্থবদ্ধ রূপ পেলে সাধারণ্যে বিদিত অনেকের অগ্রাধিকারের দাবী গণ্য হত না।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১১-৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণয়ন করে চির স্মরণীয় হয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের পূর্বে মহেন্দ্রনাথ কল্পনা, পুরোহিত প্রভৃতি পত্রিকায় ঋষি ও রাজবংশাবলীর আলোচনা-মূলক ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ইতিহাস, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় 'বংশাবলীর' গুরুত্ব মহেন্দ্রনাথই প্রথম প্রত্যক্ষ করেন।

বাঙলাদেশের রঙ্গালয় ও নট-নটী সম্বন্ধে আলোচনা একসময় খুবই নিন্দিত ছিল। এ সব বিষয়ে যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করতেন, তাঁরা সমাজের কাছে সমাদর পেতেন না। কিন্তু রঙ্গালয়ের সূচনা ও উদ্ভবেতিহাসের কাহিনী আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক পরিমণ্ডলে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মহেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অনেকেই জীবিত ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, ধর্মদাস সুর, বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর সহযোগিতা লাভ করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধামাধব কর, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রঙ্গালয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের নিকট কথাপ্রসঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিজ সম্পাদিত 'অনুশীলন ও পুরোহিত,' ও 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। নাট্য-শালার ইতিহাস প্রণয়নে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এদেশে অন্যতম পথিকৃতের গৌরব পাবেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৩৪০) প্রণয়নের বহু পূর্বে মহেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন।

ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রথম বার্তাবাহী রামমোহন রায়ের জীবন ও কৃতিত্বের পর্যালোচনা এখনও শেষ হয়নি। মহাত্মা রামমোহন রায়ের দুশো বৎসর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংশয় ও জটিলতা দেখা দিয়েছে। এদেশে রামমোহন চর্চায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি অবশ্য স্মর্তব্য। মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি ও নিষ্ঠ গবেষক। তিনি বহু পরিশ্রমে রামমোহনের জীবনীবিষয়ক মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করেন এবং সুখ্যাত 'নব্যভারত' পত্রিকায় রামমোহন রায়ের জীবন চরিত বিষয়ক ধারাবাহিক নিবন্ধমালা প্রকাশ করেন। রামমোহন

রায়ের প্রামাণিক জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথের আবিষ্কার পরবর্তী বহু গবেষকের পরিশ্রমকে লাঘব করেছে। তিনি রামমোহনের জীবন চরিত্রের বহু অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করেছেন। রামমোহন রায়ের প্রসিদ্ধ জীবন চরিতকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত (১৮৮৭) প্রসিদ্ধ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৩০৩) ভূমিকায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করে লিখেছেন রচনাকালে, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনী লেখক, রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাতি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় রাজার জীবন সম্বন্ধীয় বিষয় আমাকে অবগত করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ লিখিবার সময়েও বিদ্যানিধি মহাশয় রাজার জীবনী সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঘটনা আমাকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।"

'বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সংকলন মহেন্দ্রনাথের মৌলিক গবেষণার আর একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (১৩৪২), বাঙলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড (১৩৪৬) বাঙলা সাময়িক পত্র ২য় খণ্ড (১৩৫৮) প্রভৃতি সাময়িক পত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করে বাঙলা সাহিত্যে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এঁদের পূর্বেই 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রে সাময়িক পত্রের ইতিহাস সংকলনে ব্রতী হন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গবেষক সত্তার আর একটি দৃষ্টান্ত (খানাকুল) "কৃষ্ণনগর সমাজের ইতিবৃত্ত।" এই অপূর্ব পুরাতত্ত্ববিষয়ক সন্দর্ভটি তাঁর 'পুরোহিত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সন্দর্ভে তিনি দক্ষিণরাঢের এক গৌরব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। মহেন্দ্রনাথ এই নিবন্ধে খানাকুলকে বলেছিলেন নবদ্বীপের ছোট ভাই। তাঁর ঐ মূল্যবান নিবন্ধ হতে অবগত হওয়া যায় কণাদ তর্কবাগীশ ছিলেন এখানকার প্রসিদ্ধ লোক, তিনিও রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র। রঘুনাথ শিরোমণির পূর্বে তর্কবাগীশ মহাশয় 'তত্ত্বচিন্তামণির' টীকা লেখেন। খানাকুলের অপর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নারায়ণ ঠাকুর ও রত্নেশ্বর আগমভূষণ। শেষোক্ত ব্যক্তি এই অঞ্চলে তন্ত্রমতের প্রচলন করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর মূল সভাপতির অভিভাষণে, 'খানাকুল কৃষ্ণনগরের' ইতিবৃত্ত পরিবেশন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর খানাকুল

কৃষ্ণনগর (মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক, ১৩৩১) নিবন্ধে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে যত লিখেছেন তাঁর সুবৃহৎ অংশ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেকালের প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত লিখতেন। আর্যদর্শন, সমাচারচন্দ্রিকা, অনুসন্ধান, পুরোহিত, অনুশীলন ও পুরোহিত, সাহিত্যসংহিতা, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সাহিত্য-কল্পদ্রুম, নবভারত, জন্মভূমি, বামাবোধিনী, প্রকৃতি প্রবাহ, কল্পনা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিপুলসংখ্যক রচনা ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত রচনার সংখ্যা প্রায় দু' শতকের অধিক। কিন্তু এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার ফাইল অধুনা সর্বত্র সুলভ নয়। মহেন্দ্রনাথের এই বিপুল সংখ্যক রচনা অচিরে সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির জীবনের আর এক অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা উল্লেখ না করলে তাঁর জীবন-কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় ও সংগঠনে মহেন্দ্রনাথ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। সাহিত্য পরিষদের গঠনকালে বিদ্যানিধি মহাশয় ছিলেন প্রধান স্থপতি। বিদ্যানিধি মহাশয় পরিষদের অন্যতম গঠনকর্তা। পরিষদকে যাঁরা বাঙালীজাতির গৌরবস্থল বলে মনে করেন, পরিষদের জন্মেতিহাসের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের অবদানের কথা যদি তাঁরা স্মরণ না রাখেন তবে অকৃতজ্ঞতার দায়ভাগী ও দোষী হতে হবে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে 'বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহেন্দ্রনাথ প্রথম থেকে একাডেমীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে 'একাডেমীর' বিদেশী নাম পরিবর্তিত হয়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রূপান্তরিত হয়। এই নামকরণের গৌরব উমেশচন্দ্র বটব্যালের। এ সময়েও মহেন্দ্রনাথ পরিষদের কর্মী। প্রায় ৬ বৎসর কাল বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে পরিষদের কাজ চলে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিষদকে স্থানান্তরিত করার পক্ষে ছিলেন। পরিষদ স্থানান্তরিত হলে বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে 'সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'সাহিত্য সভার' অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ। শাস্ত্রী মহাশয়ের উৎসাহ ও আগ্রহে বিদ্যানিধি মহাশয় 'সাহিত্য সভার' সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁর আবাল্য-সঞ্চিত পুস্তক পুঁথির যাবতীয় সঞ্চয় 'সাহিত্য সভায়' দান করেন। পরে বিনয়কৃষ্ণ দেব সাহিত্য সভার

সমগ্র গ্রন্থ সম্ভার পরিষদকে দান করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে 'সাহিত্য সভার' সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় পুনরায় 'সাহিত্য পরিষদে' যোগদান করেন। অতঃপর আমৃত্যু তিনি পরিষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। পরিষদের প্রাথমিক গঠনযুগে বিদ্যানিধি মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ ছিলেন। পরিষদের সদস্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ, পত্রিকার লেখক সংগ্রহ, অধিবেশনে পাঠের জন্য লেখা সংগ্রহ বা লেখক আহ্বান, এসব কিছু বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। পরিষদের সাধারণ সদস্য, পরিষদের বিশেষ সভ্য (১৩১১) পরিষদের সহকারী সম্পাদক (১৩০৩) রূপে তিনি বাঙালীর এই সারস্বত মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

হুগলী জেলার আরামবাগ থানার বাকড়া গ্রামের ভূপতি মোহন ভট্টাচার্যের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। মহেন্দ্রনাথ আজীবন দারিদ্র্য পীড়িত। পরিবারে সুখ ছিল না। তাঁর পুত্র ছিল না। তিন কন্যার পিতা মহেন্দ্রনাথ অর্থাভাবে কন্যাগণকে দরিদ্র পাত্রে অর্পণ করেন। শেষে স্ত্রী বিয়োগ ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বৈধব্য তাঁকে মুহ্যমান করে তোলে। মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার অকাল বিয়োগ বেদনা তাঁকে মর্মান্তিক আঘাত হানে। অবশেষে (১৩১৯) ৪ঠা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দে বিদ্যানিধি মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শোক সংবাদ প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৪র্থ ও ৫ম মাসিক অধিবেশনে (২৩, অগ্রহায়ণ ১৩১৯) বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন সারদাচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বসু ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই বৎসরের দ্বিতীয় অধিবেশনে (৭, পৌষ, ১৩১৯) বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণ হয়। সভাপতি যোগীন্দ্রনাথ বসু ছাড়াও অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ বসু ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির চিত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করে। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার কার্য বিবরণের পঞ্চ বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সভার সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চিত্র প্রতিষ্ঠান উৎসবে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলেছিলেন—'স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবনচরিত অনেকটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জীবন চরিত। পরিষৎ

যখন শিশু তখন বিদ্যানিধি মহাশয় কিভাবে ইহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার কার্যবিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। পরিষৎ সামান্য অবস্থা হইতে আজ যে অতবড় হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কতখানি আত্মদান ছিল, তাহা স্মরণ রাখা উচিত। তাঁহাকে নিদাঘের প্রথম রৌদ্রে পরিষদের দপ্তর বগলে করিয়া কলিকাতার সাধারণের দ্বারে দ্বারে পরিষদের জন্য সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল—তিনি কোথাও সম্মান এবং কোথাও অপমান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিষদের কল্যাণকর্মে নিয়োজিত বিদ্যানিধি সে অপমানকে পুরস্কার জ্ঞান করিতেন। পরিষদ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইলেন। বাঙলা সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি স্বর্গীয় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি চিরদিন বীরের মত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কর্তব্য-পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মহান আদর্শ চিরদিন আমরা স্মরণ রাখিব।”

বাস্তবিকই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি একটি অবিস্মরণীয় নাম। পরিষদের ইতিহাস, পরিভাষা-সংক্রান্ত যাবতীয় সমিতিতে তিনি গণনীয় সদস্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, হীরেন দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্র-সুন্দর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি একাসনে বসে পরিভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক যাবতীয় প্রসঙ্গের পর্যালোচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যানিধি মহাশয় ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১২৯১ বঙ্গাব্দের পাক্ষিক সমালোচকে প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহেন্দ্রনাথ রায়’ শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। অমৃতলাল বসু বিদ্যানিধি মহাশয়কে ‘বাঙলার এনসাইক্লোপিডিয়া অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন “স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্মৃতি বাঙ্গালার পুণ্যময় স্মৃতি”। জীবিতাবস্থায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়নি বলে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। সেকালের এই আদর্শ শিক্ষক ও বাণীসেবক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি আজ প্রায় বিস্মৃত। তাঁর “বংশাবলী,” “রঙ্গালয়” “রামমোহন” ও “বাঙলা সাময়িক পত্র” বিষয়ক নিবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার ঋদ্ধ হবে। বিলম্ব হলেও তাঁর সাহিত্য সাধক জীবন বৃত্তান্ত রচনার কাজে যিনি এগিয়ে আসবেন তিনিও সাহিত্যানুরাগী বাঙালী সমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করবেন।

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ জ্ঞান বিজ্ঞানে চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করেছিল। বিশ্ব সভ্যতায় ভারতবর্ষের অবদান অপরিমেয়। গণিত বীজগণিত ও জ্যামিতিক চর্চার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান ছিল অপরাপর প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলি অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে। ষষ্ঠ শতকে রচিত পতঞ্জলির 'ব্যাসভাষ্য' ভারতবর্ষের গণিত বিদ্যার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গণিত বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। ভাস্করাচার্যকে হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যেতে পারে। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' রচনা করেন। আবার, বীজগণিত চর্চার ক্ষেত্রেও আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য পদ্মনাভ, ভাস্করাচার্য প্রমুখ হিন্দু বিজ্ঞানীগণ এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন—যা য়ুরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সম্পন্ন হয়। প্রাচীন ভারতে জ্যামিতি বিদ্যারও ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। বোধায়ন ও আপস্তম্বের 'শুল্বসূত্র' জ্যামিতি বিদ্যায় আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। প্রাচীন ভারতের গণিতবিদ্যাচর্চা সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত তাঁর "হিন্দু কনট্রিবিউশন টু ম্যাথমেটিক্স্" নিবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে আরও দু-একখানি পুস্তকের নাম করা যেতে পারে।১ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের এই গণিত চিন্তা আরব জাতি ও য়ুরোপীয় সমাজে প্রসারিত হয়। ভারতীয় হিন্দু বিজ্ঞানীদের গণিত সাধনা আমাদের শিক্ষা ও সাধনাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সে ইতিহাস স্বতন্ত্র।

প্রাচীন বাঙলার শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার বিবরণ কেউ কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাসে' এ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। প্রাচীন বাঙলায় সর্বজনস্বীকৃত বাঙালী গণিতজ্ঞের কোন নজির নেই। তথাপি অনুমান করা যেতে পারে, ভারতীয় আর্যগণের গণিত-বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান পরবর্তী যুগে বাঙলার জনসমাজে প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ শতকে সেন-বর্মন পর্বে রাঢ়ান্তর্গত

১ Dr. B. Dutta. The History of Hindu Mathematics (1962)

O. P. Jaggi. Scientists of Ancient India (1966)

সিদ্ধল গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ভট্ট-ভবদেব অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ এবং গণিত সিদ্ধান্তে সুদক্ষ ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষাদীক্ষার সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর গণিত চর্চা হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। সপ্তদশ শতকের শেষপর্বে আবির্ভূত 'শুভঙ্কর' বাঙলাদেশে গণিত বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় এবং অবিস্মরণীয় নাম। শুভঙ্করের কাল জীবন ও সাধনা সম্পর্কে একটি নিবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।২ এর পরেই ইংরাজ আধিপত্য যুগ। আধুনিক শিক্ষার পদসঞ্চারণের পর্ব। এই যুগে দেশী ও বিদেশী শিক্ষাবিদগণের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন ধরনের গণিত পুস্তক রচিত হয়। কিন্তু বাঙলা ভাষায় গণিতের পরিভাষা রচনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর অক্ষয় কীর্তি। আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছিলেন বাঙ্গালা পাটীগণিত প্রসন্নকুমারের (১৮২২-১৮৮৭) চিরস্থায়ী কীর্তি। গণিতশাস্ত্রে বাঙলা পরিভাষার প্রথম প্রবর্তক প্রসন্নকুমার। তাঁর 'পাটীগণিত' (প্রথম প্রকাশ ১২৬২) এবং 'বীজগণিত' ১ম ভাগ, (সংবৎ-১৯১৬, পুনর্মুদ্রণ সংবৎ ১৯২০, বঙ্গাব্দ ১২৭০) এদেশে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ। প্রসন্নকুমারের পরবর্তী গণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে। এদেশে গণিত চর্চার ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় নাম। শ্রুতকীর্তি যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন গণিতাচার্য গৌরীশঙ্কর দে'র কৃতি ছাত্র। সেকালের গণিত শিক্ষক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর গণিত সাধনার কাহিনী একালেও এক দূরশ্রুত কিংবদন্তীর মত। তথাপি মনে রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ আধিপত্য যুগে পূর্বোল্লিখিত গণিত শিক্ষক-গণের কেউই গণিত বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রেখে যাননি। স্মরণীয় শিক্ষক হিসেবেই তাঁরা কীর্তিভাস্বর।

বাঙলাদেশের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাবিদ মহলে 'পাটীগণিত' প্রণেতা যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী বহুল প্রচলিত নাম। এদেশের বিদ্যালয়গুলিতে গণিত শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী মহলে যাদবচন্দ্রের নামের সঙ্গে পরিচিত নন এমন কেউ আছেন বলে মনে হয় না। প্রায় ৮৫ বৎসরকাল বাঙলার শিক্ষাজগতে যাদবচন্দ্রের 'পাটীগণিত' অপরিহার্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। যুগ পাল্টেছে। শিক্ষাজগতে এসেছে নব নব রূপান্তর—কিন্তু যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর পাটীগণিত আজও স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত আছে। তথাপি একালের শিক্ষক-শিক্ষার্থী মহলের অনেকেই হয়তো যাদবচন্দ্রের জীবনকথার সঙ্গে পরিচিত নন। যাদবচন্দ্রের তিরোধানের ৫২ বৎসর পরে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রণয়ন করাও আয়াসসাধ্য কাজ নয়।

২ বাঙালী গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর।

বক্ষমান নিবন্ধে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পরিবেশন করা আমার আপতঃ লক্ষ্য।

অবিভক্ত বাঙলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্তী তেঁতুলিয়া গ্রামে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যাদচন্দ্র চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী। কৃষ্ণচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। সামান্য জমি-জমার আয়ে তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র তিন কন্যার মধ্যে যাদবচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ। এই পরিবেশ-পটভূমির মধ্যে যাদবচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ। যে সব ব্যক্তি জীবনে সাফল্য অর্জন করেন—সৌভাগ্য সূর্য প্রত্যক্ষ করেন—জীবনের সূচনাতেই তাঁদের মধ্যে প্রতিভার বিদ্যুৎবিভাস প্রত্যক্ষ করা যায়। শিক্ষা জীবনের সূচনাতেই যাদবচন্দ্রের তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় মেলে। পরবর্তী জীবনে উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সাধনার কাহিনী পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়।

তেঁতুলিয়া গ্রামের স্থানীয় পাঠশালায় তাঁর প্রথম ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয়। এই পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হলে যাদবচন্দ্র ময়মনসিংহে প্রেরিত হন। ময়মনসিংহে যাদবচন্দ্রের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কালীনাথ ভাদুড়ীর বাড়ী। ভাদুড়ী মশাই পেশায় ছিলেন উকীল। আইন ব্যবসাসূত্রে তিনি পরিবারবর্গসহ ভিন্ন স্থানে বসবাস করতেন। যাদবচন্দ্র এই বাড়ীতে নিজ হাতে রন্ধন করে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাতেন। এইরূপে দুই বৎসরকাল ভাদুড়ী মহাশয়ের বাসভবনে অবস্থান করে যাদবচন্দ্র ময়মনসিংহে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ের মাহিনা বেশী হওয়ায় যাদবচন্দ্র বঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে যাদবচন্দ্রের পিতৃদেব কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ময়মনসিংহের এক জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী লাভ করেন—কিন্তু ভাগ্যহীন যাদবচন্দ্রের জীবনে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। মাত্র তিন মাস চাকুরী জীবনের পর কৃষ্ণচন্দ্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তেঁতুলিয়ায় প্রত্যাগমনকালে নৌকাতেই কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই অবস্থায় অপরিণত বুদ্ধি পিতৃশোকাতুর বালক যাদবচন্দ্রের মানসিক অবস্থার কথা অনুমান করা যায়। এই ঘোরতর বিপদের মধ্যে যাদবচন্দ্রের জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সংসার পরিচালন ও নিজ শিক্ষা-জীবন, এই দুই কঠিন সমস্যা যাদবচন্দ্রকে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিচলিত করে তোলে। পিতৃশোকে মুহ্যমান যাদবচন্দ্র তরঙ্গসঙ্কুল সংসার জীবনে দিশেহারা হয়ে পড়েন। পিতৃদেব সামান্য কিছু জমি জমা ছাড়া

কিছুই রেখে যাননি। অবশ্য পিতার জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। যাদবচন্দ্রের মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী এই দুর্যোগ মুহূর্তে অসীম ক্লেশ, অসাধারণ ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতার দ্বারা সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিপালন করতে চেষ্টা করেন। তরুণ যাদবচন্দ্র জননীর এই দুঃখ কষ্টে অতিশয় ব্যথিত হতেন এবং মর্মপীড়া অনুভব করতেন। এই সময়ে যাদবচন্দ্রকে শারীরিক ও মানসিক অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। শারীরিক কোনো প্রকার শ্রম স্বীকারে যাদবচন্দ্র পরাঙ্মুখ হতেন না। জমিজমার সামান্য আয় এবং মাতার যৎসামান্য অলঙ্কারের বিক্রয়লব্ধ অর্থে সংসারের ব্যয় এবং তাঁর পড়াশুনা কোনরকমে চলতে থাকে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব নয় এই রকম যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ যাদবচন্দ্র নিজেই সম্পন্ন করে নিতেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে যাদবচন্দ্র মধ্য বাঙলা বৃত্তি পরীক্ষায় সমগ্র রাজসাহী বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে চার বৎসরের জন্য মাসিক চার টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

জননীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় যাদবচন্দ্র এই বৎসরেই সিরাজগঞ্জ মহকুমার কাওয়াখোলা গ্রামনিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা গিরিজা-সুন্দরী দেবীর পানিগ্রহণ করেন। যাদবচন্দ্র নব উদ্যমে শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করলেন। তিনি পুনরায় ময়মনসিংহে গিয়ে কালীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় নেন এবং ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হওয়ায় জেলা স্কুলে তিনি ফ্রী ষ্টুডেন্টশিপ পান। প্রতিমাসে বৃত্তির চারি টাকা তিনি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এইরূপে দুই বৎসর কাল অতিবাহিত হওয়ার পর যাদবচন্দ্র পুনরায় অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাঁর আশ্রয়দাতা কালীনাথ ভাদুড়ী মহাশয় সেরপুরের সরকারী উকীল নিযুক্ত হওয়ায় ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। এ জন্য তাঁর সমূহ অসুবিধা হয়। যাদবচন্দ্র অতঃপর তিন টাকা বেতনে একটি বালকের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তী এনট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত নানাবিধ অসুবিধা অতিক্রম করে একাধিক আশ্রয়ে থেকে যাদবচন্দ্র ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের পাঠ সমাপন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৫ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। উচ্চ শিক্ষালাভে ব্যাকুল যাদবচন্দ্র অতঃপর কোলকাতা জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে প্রবিষ্ট হয়ে এফ-এ, অধ্যয়ন করতে থাকেন। মাতৃভক্ত যাদবচন্দ্র অভাব নিপীড়িতা স্নেহময়ী জননীর জন্য তীব্র ব্যথা অনুভব করতেন। যাদবচন্দ্র তাঁর বৃত্তির ১০ টাকা নিজ খরচের জন্য রেখে প্রতি মাসে ৫ টাকা মায়ের কাছে পাঠাতেন।

কলেজে অধ্যয়নকালে যাদবচন্দ্র অর্থাভাবে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন। পাঠ্যপুস্তক না থাকায় তিনি সতীর্থ বন্ধুদের কাছে পুস্তকাদি সংগ্রহ করে নিজ পাঠ প্রস্তুত করে নিতেন। এফ. এ প্রথম বর্ষের বাইবেল পরীক্ষায় যাদবচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করে কলেজ থেকে চারি টাকা বৃত্তি অর্জন করেন। এর ফলে যাদবচন্দ্রের অর্থাভাব কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। এইরূপ দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে অধ্যয়ন করে যাদবচন্দ্র ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ২৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। জেনারেল এসেমব্লিজ্‌ ইনষ্টিটিউশনে যাদবচন্দ্রের গণিত শিক্ষক ছিলেন প্রথিতযশা গণিতাধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে। গৌরীশঙ্কর প্রতিভাবান যাদবচন্দ্রকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। আচার্য গৌরীশঙ্কর দে'র সঙ্গে যাদবচন্দ্রের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। গৌরীশঙ্করের জীবনের শেষ অবস্থাতে যাদবচন্দ্র প্রায়শঃ আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া তখন অন্য কোনো কলেজে বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। অথচ বি. এ. পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ না করলে এম. এ. অধ্যয়ন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইরূপ নানা চিন্তায় যাদবচন্দ্র গভীরতর চিত্তসংকটে পতিত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের বেতন অন্যান্য কলেজ হতে অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল সুতরাং যাদবচন্দ্রের মত দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে এই কলেজে অধ্যয়ন কষ্টসাধ্য। এইরূপ অবস্থায় যাদবচন্দ্র ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে ইংরেজী ও গণিত এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন অধ্যয়ন করতে থাকেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁর স্নেহশীলা জননী স্বর্গারোহণ করেন। মাতৃবিয়োগে তাঁদের পারিবারিক শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে ওঠে। এই সময় সংসার পরিচালনায় তাঁর ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাঁর বালিকা পত্নীকে সহায়তা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যাদবচন্দ্রের সৌভাগ্যসূর্য যখন মধ্য গগনে ভাস্বর হয়ে দেখা দিয়েছিল—তার বহু পূর্বে যাদবজননী স্বর্গারোহণ করেন। যতদিন যাদবজননী জীবিতা ছিলেন—তাঁর অভাব ও দুঃখমোচনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মাতার দুঃখ কষ্টের লাঘব এবং তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধান করতে না পারার জন্য যাদবচন্দ্র পরবর্তী জীবনে বহু আক্ষেপ করেছেন। মাতৃশোকে কাতর যাদবচন্দ্র তাঁর বি, এ. অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর যাদবচন্দ্র গণিত বিজ্ঞানে এম, এ অধ্যয়নে ব্রতী হন। যাদবচন্দ্র আজীবন দারিদ্র্যদুষ্ট। এই পর্বেও অর্থাভাবে তাঁর লেখাপড়ায় বিঘ্ন দেখা

দিল। কিন্তু বিধাতা যাঁর সহায় কোনো বাধাই তাঁর গতিপথ রুদ্ধ করতে পারে না। পুস্তকাভাব জনিত বাধা এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে দূরীভূত হয়ে গেল। ন'-টাকার ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর এক নিলামে তিনি ৮০ টাকা মূল্যের পুস্তক লাভ করেন। এর দ্বারা তাঁর গণিতশিক্ষা অব্যাহত থাকে। এম, এ ক্লাসে তাঁর অন্যান্য সহপাঠীগণের মধ্যে রাজসাহী কলেজের গণিতাধ্যাপক রামমোহন সেন এবং স্বনামধন্য কালীপদ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী গণিতে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংগ্রামক্ষুব্ধ ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবনে কালরাত্রির অবসান সূচিত হ'ল। যে দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রনার মধ্যে যাদবচন্দ্র আবাল্য পথ পরিক্রমণ করেছেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তিনি তাঁর সংগ্রামক্ষুব্ধ ছাত্রজীবনে কেবলমাত্র দুঃখবেদনা ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন তা নয়—এই অতিশয় কঠিন ও বাস্তব জীবন থেকে বহু শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও চরিত্রাদর্শে এই শিক্ষা ব্যাপকতায় ও গভীরতার গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত আছে। গণিত-বিজ্ঞানে এম, এ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যাদবচন্দ্র কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। অন্যান্য অর্থকরী চাকুরীর প্রলোভন ত্যাগ করে শিক্ষাব্রতীর বৃত্তিকেই তিনি বরণ করে নিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী কোলকাতা সিটি কলেজে গণিতের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সিটি কলেজে যাদবচন্দ্র ছয় বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করার জন্য কোলকাতায় আগমন করেন। ঐ সময়ে তিনি আলিগড় এম, এ, ও, কলেজের গণিতের অধ্যাপকের জন্য 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। ঐ কলেজে ইতিপূর্বে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটায় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা সারদারঞ্জন রায় কলেজের চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন। যাদবচন্দ্র ঐ বিজ্ঞাপন অনুযায়ী গণিতের অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের কোলকাতা অবস্থানকালে যাদবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা হয়। অতঃপর স্যার সৈয়দ আহমদের আহ্বানে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী যাদবচন্দ্র আলিগড় এম, এ, ও, কলেজে গণিত অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। আলিগড় এম, এ, ও, কলেজের কার্যভার গ্রহণের সময় তিনি কয়েক দিবস আলিগড়ের প্রসিদ্ধ উকীল জ্বলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে

অবস্থান করেন। পরে উকীল জ্বলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। যাদবচন্দ্র ২৮ বৎসর কাল আলিগড় এম, এ, ও, কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

এই কলেজে গণিতের খ্যাতিমান শিক্ষকরূপে যাদবচন্দ্রের যশ বহু ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। যাদবচন্দ্রের নিপুন অধ্যাপনা প্রণালী গণিত জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গণিতশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য প্রতিভার জন্য আলিগড়ের শিক্ষিত সমাজ এবং কলেজের ভারতীয় ও য়ুরোপীয় অধ্যাপকগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। শুধু আলিগড় কেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গণিত জিজ্ঞাসু ছাত্রসমাজ গণিতের জটিল প্রশ্ন সমাধানের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। এই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষণ প্রবর্তনের পর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, আচার্য গৌরীশঙ্কর দে গণিত শিক্ষাক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। যাদবচন্দ্রের সমকালে সারদারঞ্জন রায়, কালীপদ বসু এবং সোমেশচন্দ্র বসু এতদ্দেশীয় শিক্ষাক্ষেত্রে গণিত বিজ্ঞানের চর্চায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কেবল তাই নয়, বঙ্গের বহু যশস্বী শিক্ষক আমাদের গণিতচর্চাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্লাঘনীয় প্রতিষ্ঠা দান করেন। এই নিবন্ধে মৌলিক গণিত বিজ্ঞানীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন আমার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এই অনুচ্ছেদে যাঁদের কথা উল্লেখ করছি—সম্ভবতঃ গণিত বিজ্ঞানে তাঁদের কোনো মৌলিক অবদান নেই। তথাপি গত শতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের যে অভিনব জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল—আধুনিক শিক্ষা আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে জীবনাবেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল তার মূলে ছিলেন এতদ্দেশীয় শিক্ষক সমাজ। অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী উনবিংশ—বিংশ শতকে এদেশে গণিত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এমনই এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কেবলমাত্র গণিত বিজ্ঞানে নিষ্ণাত সুপণ্ডিত অধ্যাপক রূপেই নয়—তিনি তাঁর অপরূপ চরিত্র মাধুর্যের দ্বারা আলিগড়ে আটাশ বৎসরের অধ্যাপক জীবনে হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রীতি অর্জন করেন এবং যশস্বী হন। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালীতে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্র-সমাজ আলিগড়ে এসে তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে জীবন চরিতার্থ করে তোলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ লিখেছেন—"যুক্ত প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশের এবং ভারতের বাহিরে ব্রহ্ম, বেলুচিস্থান, সোমালিল্যাণ্ড, পারস্য, আরব, ওগাণ্ডা, মরিশাস, কেপ কলোনী, প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দূর দূরান্তর হইতে আগত সহস্র সহস্র মুসলমান

ছাত্র এই প্রবাসী বাঙালী গুরুর সুশিক্ষায় লব্ধকাম এবং তাঁহার সদয় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি ভক্তিভরে আকৃষ্ট হইয়াছেন।"৩

আলিগড় এম, এ, ও, কলেজের পরিচালক মণ্ডলীতে অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী সুদীর্ঘকালব্যাপী বিশিষ্ট সদস্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। কলেজের ন্যসরক্ষক সমিতির অধীনে যে সমস্ত সংস্থা ছিল—যাদবচন্দ্র তার সবগুলিতেই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কিছুকাল তিনি এই কলেজের ফিনান্স বোর্ডে রেজিস্ট্রারের আসন অলঙ্কৃত করেন। কলেজ সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব তিনি অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করতেন। কলেজের সুনিয়ম সংস্থাপন এবং ইহার আভ্যন্তরীণ সকল বন্দোবস্তই যাদবচন্দ্রের পরামর্শ, সহায়তা ও কর্তৃত্বে অনুষ্ঠিত হ'ত। স্যার সৈয়দ আহমদের বাসভবনের নিকটেই যাদবচন্দ্র এক বাংলোবাড়ীতে বসবাস করতেন। স্যার সৈয়দ আহমদ কলেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যাদবচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। দু'জনের মধ্যে ছিল সুগভীর প্রীতির সম্পর্ক।

অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী বাঙালীর হৃদয়াসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর 'পাটীগণিত' গ্রন্থখানির জন্য। সেকালের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য তিনি বহু পরিশ্রমে এই গণিত পুস্তকখানি রচনা করেন। কোলকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপনা জীবনে তিনি এই বিখ্যাত গণিত পুস্তকখানির রচনায় স্বেচ্ছাব্রতী হন। অতঃপর আলিগড়ের প্রবাস জীবনে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্রের 'ইংরেজী পাটীগণিত' প্রকাশিত হয়। পরে এই পাটীগণিত বাঙলা, হিন্দী, উর্দু, আসামী, মারাঠী ও নেপালী ভাষায় অনূদিত হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিপুল সমাদৃত হয়। গণিতাধ্যাপক যাদবচন্দ্র এই পুস্তকের দ্বারা অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বীজগণিত' শিক্ষাজগতে প্রকাশিত হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর সতীর্থ কালীপদ বসুর 'বীজগণিত' শিক্ষাজগতে বহুল সমাদৃত হয়। যাদবচন্দ্র বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরও কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করেন। যাদবচন্দ্র রচিত বিদ্যালয়পাঠ্য সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকা বর্তমান নিবন্ধে উপস্থিত করা গেল না। আশা করা যায় তাঁর সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকা ভবিষ্যতে প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

শিক্ষকের কৃতিত্ব ছাত্রগৌরবে। আদর্শ শিক্ষকেরাই জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায়, চরিত্রে খাঁটি মানুষ তৈরী করেন। সমগ্র উত্তর ভারতে যাদবচন্দ্রের বহু ছাত্রই

৩ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী। উত্তর ভারত (১৩২২)

পরবর্তী জীবনে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। অনেক নামজাদা ও বিদ্বান মুসলমান তাঁর ছাত্র। যাদবচন্দ্রের কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে মৌলনা শওকৎ আলি, মৌলনা মহম্মদ আলি অন্যতম। সৈয়দ আহমদ সাহেবের পরলোকগত পুত্র জাষ্টিস মাহমুদ 'ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে যাদবচন্দ্রের কাছে বিশিষ্ট সাহায্যলাভের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। যাদবচন্দ্রের জীবনের নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্যশীলতা ও গভীর কর্তব্যনিষ্ঠা ছাত্র সমাজের কাছে শিক্ষনীয় হয়েছিল।

আলিগড়ের প্রবাস জীবনে যাদবচন্দ্র অতিশয় জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে, চরিত্র মাধুর্যে, সর্বোপরি তাঁর প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা এবং অধ্যাপনা নৈপণ্যের জন্য তিনি আলিগড়েব সকলশ্রেণীর মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি যখন তাঁর সুদীর্ঘকালের কর্মক্ষেত্র আলিগড় হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করেন, তখন আলিগড়ের অধিবাসীবৃন্দ গভীরতর মর্মবেদনায় অভিভূত হয়। তাঁর অভাব বেদনায় সমগ্র জনমানসে বিষণ্ণতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একটি বিশাল জনসম্বর্দ্ধনার মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে আলিগড়ের জনমানসের ব্যথা, বেদনা ও মর্মপীড়া গভীরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল। এই অভিনন্দন ছাড়াও যাদবচন্দ্রকে আরও পৃথক বারোটি বিদায়ভোজে অভিনন্দিত করা হয়। আলিগড় এম, এ, ও, কলেজে অনুষ্ঠিত বিদায় সভায় স্বদেশীয় যুরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশাগতজন সমবেত হয়ে তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এই কলেজের ন্যাসরক্ষক সমিতি আয়োজিত সভায় যাদবচন্দ্রকে সোনার চেন-ঘড়ি উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কলেজের মুসলমান ছাত্র সমাজ তাঁদের প্রিয় শিক্ষাগুরুর জন্য রৌপ্য চা পাত্র এবং হিন্দু ছাত্রগণ রৌপ্য চায়ের আধার উপহার দেন। তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুবর্গ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যাদবচন্দ্রকে মূল্যবান কার্পেট প্রদান করেন। আলিগড় হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে একজন লেখকের মর্মস্পর্শী বিবরণের কথঞ্চিৎ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য। "অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয় যেদিন আলিগড় পরিত্যাগ করিয়া আসেন সেদিন তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য রেলওয়ে প্লাটফর্মে অধ্যাপকগণ, ছাত্রবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিবার পর যখন ট্রেন ছাড়িল তখন তাঁহার উপর অজস্রধারে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তিনি তাঁহার প্রিয় কর্মভূমি আলিগড় হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। প্লাটফর্মের উপর তাঁহার

গুণমুগ্ধ বন্ধুমণ্ডলী ও ছাত্রবর্গ যাদবচন্দ্রের গমন পথের প্রতি বাষ্পাকুল লোচনে চাহিয়া রহিলেন।"

বাল্য ও যৌবনে যাদবচন্দ্রকে কঠোর জীবন সংগ্রামে নিষ্পেষিত হতে হয়েছিল—কিন্তু বিদ্যালাভের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। কোনো বাধাই তাঁর গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। জীবন সংগ্রামে এই সুকঠোর দুঃখ-কষ্টকে বরণ করেছিলেন বলেই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত অতুল প্রতিষ্ঠা অর্জনে তিনি সফলকাম হন। যে সকল বিদ্বান ও কৃতীপুরুষ সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বজনপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় হয়েছেন—অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর দারিদ্র্যদুষ্ট জীবনে যাঁদের কাছে সাহায্য ও অনুকম্পা পেয়েছিলেন তাঁদের ঋণ তিনি আমৃত্যু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে গেছেন।৪ ময়মনসিংহে তাঁর আশ্রয় দাতা কালীনাথ ভাদুড়ীর উপকারের কথা তিনি বিস্মৃত হননি। ওকালতী থেকে অবসর গ্রহণের পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন যাদবচন্দ্র তাকে মাসিক ২৫ টাকা করে অর্থ সাহায্য করেই ক্ষান্ত হননি, তার পারিবারিক দুর্দিনেও তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর তার সমগ্র পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়ে। চিরদুঃখিনী মাতা-ভ্রাতা-ভগিনীসহ সমগ্র পরিবারের দায়-দায়িত্ব অতিবাল্যেই তিনি আপন স্কন্ধে তুলে নেন। নিজের শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের প্রতি তার কর্তব্যের কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। ছাত্র-জীবনেও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি কোনো দুঃখ বরণে পরাঙ্মুখ হননি। পিতৃবিয়োগের পর তার দ্বিতীয়া ভগিনীর বিবাহ মাতার প্রচেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু মাতার স্বর্গারোহণের পর যাদবচন্দ্র চেষ্টা করে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দেন। মধ্যম ভ্রাতা মুকুন্দচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনমালির শিক্ষা-দীক্ষা যাদবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিষ্পন্ন হয়। তাদের বিবাহ, কঠিন রোগের চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্তন প্রভৃতির সকল ব্যয়ভার যাদবচন্দ্র নিজ কর্তব্যের অঙ্গীভূত করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, প্রতিভাসম্পন্ন তার দুই ভাই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এজন্য যাদবচন্দ্র গভীর শোকাভিভূত হন।

যাদবচন্দ্র ছিলেন দেশ-প্রেমিক, স্বদেশ ভক্ত। দূর প্রবাসে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়। আলিগড়ে

৪ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার। বংশাবলী পরিচয় ও সপ্তদশ খণ্ড, (১৩৪৩)

বৎসর কাল কাটিয়েও সেখানে কোনদিন স্থায়ী বসবাসের কথা তিনি চিন্তা করেননি—বরং তাঁর পুত্র কন্যাগণ শৈশব থেকে আলিগড়ে অবস্থান করার ফলে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সঙ্গে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। তাঁর পুত্র কন্যাগণ পুরোপুরি হিন্দুস্থানী ভাবাপন্ন হয়ে পড়ায় যাদবচন্দ্র অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাঙলা ও বাঙালীর চিরায়ত ধারায় পুত্রকন্যাগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হন। অবশেষে অবসর গ্রহণের ১৫ বৎসর পূর্বে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র সিরাজগঞ্জে বহু অর্থ ব্যয়ে একখানি বৃহৎ বসতবাটি নির্মাণ করেন এবং পুত্র কন্যা ও সহধর্মিনীকে দেশের বাড়ীতে প্রেরণ করেন। অনতিকাল মধ্যে তিনি সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। আরও পরে যাদবচন্দ্র অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অলঙ্কৃত করেন। পরবর্তীকালে যাদবচন্দ্র কোলকাতায়, ৭০, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে সুরম্য ভবন নির্মাণ করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। তন্মধ্যে একটি কন্যা আলিগড়েই পরলোকগমন করে। তাঁর পুত্রগণের সকলেই শিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুত্রগণের চেষ্টায় কোলকাতার এই ভবনে প্রেস ও প্রকাশালয় স্থাপিত হয়। যাদবচন্দ্রের যাবতীয় পুস্তক অতঃপর পি, সি, চক্রবর্তী এ্যাণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে আসছে।

দারিদ্র্য শিক্ষালাভের পক্ষে কতখানি অন্তরায় হতে পারে তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই উদার চরিত্র যাদবচন্দ্র শেষ জীবনে সম্পদ লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করে দারিদ্র্যের দুঃখমোচনে চিরযত্নবান ছিলেন। তাঁর প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলি তিনি প্রার্থী যে কোনো গরীব ছাত্রকে দান করেছেন—অর্থ সাহায্য করেছেন বহু দরিদ্র ছাত্রকে। বিপদের সময় তাঁর বহু দুঃস্থ আত্মীয়বর্গ তাঁর কাছ থেকে অকাতরে সাহায্যলাভ করেছেন। দুঃখীর দুঃখমোচনে যাদবচন্দ্র ছিলেন মুক্তহস্ত। মানুষ যথার্থ মানুষ হ'লে চরম সৌভাগ্যের মধ্যেও দারিদ্র্যের দুঃখ অনুভব করার শক্তি হারায় না। মানুষের সমাজে এঁরাই মহৎ চরিত্র ও বরেণ্য বলে গণ্য হন। যাদবচন্দ্র এইরূপ বহু মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর (১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩০) তারিখে ৬৯ বৎসর বয়সে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, কোলকাতা, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অন্তর্ধান ঘটে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং কোলকাতার তাবৎ সাময়িক পত্রগুলিতে শোক প্রশস্তি নিবেদিত হয়। একখানি

প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিকে 'Death of a well known Mathematician শিরোনাম যুক্ত সংবাদে লিখেছিল, "We are deeply grieved to record the death from dysentry at age of 69 of Babu Jadav Chandra Chakraborty M. A. Late Professor of Mathematics, M. A. O. College, Aligarh. This melancholy event took place in the early hours of the morning on Monday last in Calcutta at his residence, 74, Bechu Chatterjee Street. The deceased was well known throughout India as the author of 'Arithmetic' and other Mathematical works He was an Honorary Magistrate of Serajganj and was also for sometime the Chairman of the local Municipality there. We offer our Condolence to the bereaved family.? যাদবচন্দ্রের 'পাটীগণিত' আজও এদেশের শিক্ষাজগতে স্বমহিমায় বিরাজ করছে। এই পাটীগণিতের জন্যই যাদবচন্দ্রের কাছে আজও আমাদের ছাত্র-শিক্ষক সমাজের ঋণ অপরিসীম। যাদবচন্দ্রের সংগ্রামবিক্ষুব্ধ সফল জীবন কথাও কম শিক্ষণীয় নয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর অধুনা দুর্লভ পুণ্য জীবন ও চরিত কথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

? Amrita Bazar Patrika. Nov. 28, 1923

সারদারঞ্জন রায়

পুণ্য কর্মের ধ্বনি ভূলোক, দ্যুলোক ও গোলক স্পর্শ করে। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের জীবন, বাণী, কর্ম ও কীর্তিবৈশিষ্ট্যের আলোচনা সমাজে আদর্শ কর্মশক্তি ও সদাচারের প্রেরণা দেয়। সেকালের খ্যাতকীর্ত শিক্ষক সমাজ আমাদের দেশ ও নীতিকে নতুন যুগের অভিমুখী করেছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক হিসেবে পূজিত। অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন ছিলেন সেকালের শিক্ষক সমাজের অগ্রগণ্য। আজিকার এই ঘোর শিক্ষা সংকটের যুগে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের অসামান্য চরিত্র-গৌরবের দিকটি একাধারে দ্বিধাগ্রস্ত ছাত্র ও শিক্ষক উভয় সমাজের কাছে আদর্শস্থানীয় এবং শিক্ষণীয়।

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের কীর্তিবহুল বিস্তৃত জীবনের অনুশীলন, পর্য্যালোচনা ও সমীক্ষা বর্তমান একটি নিবন্ধে অসম্ভব। শিক্ষক হিসেবে তাঁর কতিপয় গৌরব ও মহত্ত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। মানুষের জীবন তিনটি ধারায় গঠিত, পুষ্ট ও প্রবাহিত। জীবনের একটি ধারা আসে পিতামাতা ও পূর্বপুরুষগণের কাছ থেকে; যুগপরিবেশ, আত্মীয়বন্ধু প্রতিবেশী প্রভৃতি বেষ্টনীর মধ্যে থেকে আসে দ্বিতীয় ধারা, আর তৃতীয় ধারার উৎস ব্যক্তির কর্ম মন এবং হৃদয় প্লাবিনী ভগবদ্দত্ত প্রতিভা। সারদাচরণের চরিতালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বপুরুষ ও বেষ্টনীর কথঞ্চিৎ পরিচয় বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

সারদারঞ্জনের পূর্বপুরুষগণের বসবাস ছিল নদীয়া জেলার চাকদহে। বাঙলার বারো ভূঁইয়ার অন্যতম জঙ্গলবাড়ীর প্রসিদ্ধ ঈশাখাঁর সময়ে এতদ্‌বংশীয় রামসুন্দর দেব ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের জমিদারী মধ্যে বসবাস করতে থাকেন। এঁরা দক্ষিণরাঢ়ী দেবোপাধিক কায়স্থ—গোত্রে মৌদ্‌গল্য। ময়মনসিংহের অন্তর্গত যশোদলের রাজা গুণিকচন্দ্র এঁদের বংশ মর্য্যাদা ও অন্যান্য গুণশ্রুতিতে মুগ্ধ হয়ে, রামসুন্দরকে নিজ জামাতৃপদে বরণ করে নেন। তখন থেকে এঁদের বংশধরগণ যশোদলে বসবাস করতে থাকেন। এ বংশের অনেকেই ঈশাখাঁর জমিদারী মধ্যে এগারোসিন্ধুর কাছারীতে চাকুরী করতেন। ঈশাখাঁর সময়ে এ পরিবারের অনেকেই 'খাশনবিশ', মজুমদার প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। এঁদের আসল উপাধি দেব, কিন্তু পুরুষানুক্রমে এরা রায় উপাধিতে বিখ্যাত। এই গোষ্ঠীর রামনারায়ণ রায় যশোদল ছেড়ে মসুয়া গ্রামে বসতিস্থাপন করেন।

সারদারঞ্জনের জন্ম তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৫ সাল। জন্মস্থান মাতুলালয়, মসূয়ার অদূরে বনগ্রাম নামক গ্রামে। পিতা শ্যামসুন্দর রায়। ইনি পার্সি, সংস্কৃত ও বাঙলায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। অল্প ইংরেজী জানতেন। শ্যামসুন্দর কিশোরগঞ্জে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে সেরেস্তাদার ছিলেন। শাস্ত্র আলোচনাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনাতেও শ্যামসুন্দর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। শ্যামসুন্দরের নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল। অবসর সময় তিনি এই চতুষ্পাঠীতে ছাত্র অধ্যাপনা করতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও শ্যামসুন্দরের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সারদারঞ্জনের পিতার এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সারদারঞ্জনের পিতামহের নাম লোকনাথ রায়। লোকনাথ ছিলেন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ তন্ত্রকথিত যোগসাধনার ক্রিয়াকর্মে মগ্ন হয়ে পড়েন। অধিকন্তু গণিতশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কাহিনী দেশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। লোকনাথও পার্সি, সংস্কৃত ও বাঙলায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সারদারঞ্জন ও তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিদারঞ্জন বোধ হয় পিতামহ লোকনাথের কাছেই অঙ্কশাস্ত্রের অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। লোকনাথের পিতা রামকান্তও সংস্কৃত, আরবি প্রভৃতির ন্যায় গীতবাদ্যেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পিতৃকুলের ন্যায় সারদারঞ্জনের মাতৃকুলও ছিল গৌরবে সমুজ্জ্বল। পিতৃকুলে লোকনাথ যেমন ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন—মাতৃকুলে বাসুদেব নন্দী ছিলেন পরম ভাগবত ও প্রাতঃস্মরণীয়। বাসুদেব নন্দী সারদারঞ্জনের মাতার পিতামহ ছিলেন। এই বাসুদেব নন্দী একবার শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের দর্শন প্রয়াসী হয়ে ময়মনসিংহ হতে দণ্ডী দিয়ে যাবার সংকল্প করেন। বাসুদেব নন্দীর ভক্তি ও ঈশ্বরপরায়ণতার এই কাহিনী এক সময় লোক প্রবাদের অন্তর্গত ছিল। সারদারঞ্জন এতাদৃশ সমুজ্জ্বল পিতৃ ও মাতৃ পুরুষযুক্ত বংশধারা থেকে প্রসূত। সাধারণতঃ বিদ্যাবিষয়ে লোকে কোন বিশেষ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। কিন্তু একাধারে আর্য্যোচিত বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, বলিষ্ঠ মন ও উন্নত আত্মার সমন্বয় এবং তদনুযায়ী বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ সচরাচর একজনের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু সারদারঞ্জন গণিত, ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, তদুপরি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এবং এই সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থ-নিবন্ধ-প্রবন্ধ লিখে সাধারণের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। এমন কি, তিনি ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ও টেনিশ খেলার নিয়মাবলী এবং মৎস্য শিকারের মৌলিক উপায়াদি পুস্তক-

আকারে প্রণয়ন করে বিদ্যা ও বিজ্ঞানে তাঁর বহুচারিতার দিকটি মূর্ত করে তোলেন।

সুখের ক্রোড়ে লালিত হয়ে সারদারঞ্জন ছিলেন শ্রুতিধর। তাঁর বাল্যবন্ধু রামেশ্বর শর্মা তাঁকে 'শ্রুতিধর' হিসেবেই প্রতিপন্ন করেছেন মুক্তিদারঞ্জনকে লেখা একখানি চিঠিতে। অসাধারণ মেধাবী এবং শ্রুতিধর হওয়ায় ক্ষণমাত্র পাঠেই তিনি পাঠ্য বিষয়গুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারতেন—সেজন্য সমস্ত দিন খেলা-ধূলাতেই তাঁর দিন অতিবাহিত হত। খেলাতে ছিল তাঁর গভীর আনন্দ। কিশোরগঞ্জ মাইনর স্কুল থেকে অতি অল্পবয়সেই তিনি মাইনর পাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতার চতুষ্পাঠীতেও পাঠ গ্রহণ করতেন। কিন্তু কালধর্মে সারদারঞ্জন পার্সির পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতার সমস্ত গুণগ্রামও তিনি অধিকার করতে থাকেন। ধর্মে ছিল পিতার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, শাস্ত্রানুশীলনে ছিল তৎপরতা। সারদারঞ্জন অতি শৈশবেই সংস্কৃতের একটু একটু আস্বাদ পেয়েছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কবিতাবলী তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। মাইনর পাশ করার পর তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে এসে ভর্তি হলেন। এই স্কুল থেকে ১৮৭৩ সালে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

এনট্রান্স পাশ করার পর সারদারঞ্জন ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন। ঢাকাতে ধূমায়মান বহ্নিরূপ তাঁর প্রতিভা ক্রমে বিকশিত হতে লাগল। এখানে এসে তিনি সর্বাগ্রে ক্রিকেট ও ব্যায়াম চর্চায় মনোনিবেশ করলেন—তাঁর সুকুমার দেহ পরিপুষ্ট হতে লাগল। এনট্রান্স পরীক্ষার সময় রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েছিলেন। ঢাকায়, ব্যায়াম চর্চা খেলাধূলা প্রভৃতির মাধ্যমে ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করলেন, শরীরকে পুষ্ট ও সুগঠিত করে তুললেন। ঢাকা কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে এফ, এ, পাশ করে বৃত্তিলাভ করলেন। সারদারঞ্জনের ইচ্ছা ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বেন। কিন্তু ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ইউব্যাঙ্ক সাহেব ছিলেন 'বিদ্যার জাহাজ।' ইউব্যাঙ্ক সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে সারদারঞ্জন গণিত ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। অন্যদিকে ইংরেজী, বাঙলা, ইতিহাস ও ভূগোল বিদ্যাতে তিনি অতিশয় পারঙ্গম ছিলেন। তিনি অতি দ্রুত মধুর ও অভ্রান্ত ইংরেজী লিখতে ও বলতে পারতেন। ঢাকা কলেজে বি, এ, তে Optional Mathematics পড়বার সুযোগ ছিল না। বি, এ, তে সারদারঞ্জন অতিরিক্ত গণিত পড়বেন, এই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। অঙ্ক

ইউব্যাঙ্ক সাহেব সারদারঞ্জনকে গণিত পড়াবার দায়িত্ব নিলেন। গণিত, Astronomy প্রভৃতিতে তিনি সে সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের বহু নামজাদা ছাত্রকে বিস্মিত করেন। কিন্তু কলেজের পাঠ্যপুস্তক তিনি খুবই কম পড়তেন। পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত গ্রন্থরাজির মধ্যে তিনি অধিক সময় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু আহার ও ব্যায়াম সম্বন্ধে কখনও নিয়মভঙ্গ করতেন না। ১৮৭৭ সালে সারদারঞ্জন ঢাকা কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করলেন। বি, এ, পরীক্ষায় ঢাকা অঞ্চলে ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি একটি পদক লাভ করেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যয়ন শেষ হ'ল। সারদারঞ্জন এম, এ, পড়বার জন্য কোলকাতা সংস্কৃত কলেজে এসে ভর্তি হলেন। কিন্তু কয়েকমাস অধ্যয়নের পর পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পেয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। পিতৃ সান্নিধ্যে আসা মাত্রই পিতা তাঁকে গীতাপাঠের আদেশ দিলেন। শ্রীভগবানের উপদেশ বাণী শ্রবণ করতে করতে পিতৃদেব অনন্তের ধ্যানে মগ্ন হয়ে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করলেন। সারদারঞ্জনের জীবনে নূতন অধ্যায় সূচিত হল।

বিদ্যালাভ, উপার্জন, অর্থাভাব, পরিজনের ভরণপোষণ, এ সব ভাবনা তাঁকে অস্থির করে তুললো। মানুষ তাঁকে হতেই হবে। সারদারঞ্জন মনকে দৃঢ় করে পুনরায় কোলকাতায় আগমন করলেন। তাঁর সব সহপাঠী বন্ধু, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, রামেশ্বর প্রভৃতি সারদারঞ্জনকে সংস্কৃত ছেড়ে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে বাধ্য করলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় সারদারঞ্জন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রবন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। মেধাবী সারদা রঞ্জন দুরূহ অঙ্কের সরল সমাধান দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই সহপাঠী বন্ধুবর্গের হৃদয় জয় করলেন। এইরূপে ছ'মাসের মধ্যে তিনি গণিতে এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক Mr. Nash সাহেব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার। ফিস্ দাখিল করার জন্য সিনেটে গিয়ে সারদারঞ্জন সাহেবকে পেলেন না। কলেজে গিয়ে দেখলেন সাহেব বি, এ, ক্লাসে গণিত পড়াচ্ছেন। সাহেব একটি অঙ্কের লম্বা সমাধান বোর্ডে লিখেছেন দেখে, সারদারঞ্জন ঐ ক্লাসের একজন ছাত্রবন্ধুকে অতি সংক্ষেপে তা কষে দেন। বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ সারদারঞ্জনের কষা অঙ্কটি Mr. Nashকে দেখান। গণিতশাস্ত্রে সারদারঞ্জনের এই পারদর্শিতা লক্ষ্য করে, Mr. Nash তাঁকে

প্রেসিডেন্সীর ছাত্র হিসেবে ফিস্ দাখিল করতে বলেন এবং সেই অনুসারে ক্রমে নাম লিখে নেন।

সারদারঞ্জন Pure and Mixed Mathameticsএ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চস্থান অধিকার করে এম, এ পাশ করেন। গণিতে সারদারঞ্জনের এই কৃতিত্বের পিছনে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ইউব্যাঙ্ক সাহেবের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা ছিল মুখ্য। সারদারঞ্জনের সহপাঠী বন্ধু রামেশ্বর শর্মা ১৩৩২ সালের কার্তিক মাসে মুক্তিদারঞ্জনকে লিখিত একখানি পত্রে লিখেছিলেন—"ইউব্যাঙ্ক সাহেবের কৃপায় Conic-Section এর একটি প্রশ্নেও (তিনি) পরাঙ্মুখ হন নাই। যেমন শিক্ষাগুরু, তেমনি গুণবান ছাত্র। আমার বিশ্বাস মনস্বী আনন্দমোহন বসু ভিন্ন, এমন মেধাবী ময়মনসিংহে এমন কি পূর্ববঙ্গেও জন্মে নাই।"১ প্রসঙ্গসূত্রে উল্লেখ্য সারদারঞ্জনের অন্যান্য ভাই কামদারঞ্জন (উপেন্দ্রকিশোর), মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, ও প্রমদারঞ্জন সকলেই বলিষ্ঠ, বীর, বিদ্বান ও সুলেখক হিসেবে বাঙলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

গণিতে এম, এ, পাশ করার পর সারদারঞ্জন সংস্কৃত কলেজে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাছে P. R. S. এর থিসিস্ প্রণয়নে রত হলেন। কিন্তু সে বৎসর বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে এ বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সারদারঞ্জন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হলেন। এবারে কর্ম জীবনের সূত্রপাত।

সারদারঞ্জন আজীবন শিক্ষাব্রতী। বাঙলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক সমাজের অগ্রগণ্য ছিলেন সারদারঞ্জন। সারস্বতচর্চা ও মানুষ গড়ার সাধনাতেই তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। গতযুগের বাঙলাদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে তিনি যেখানেই গেছেন, ছাত্র-শিক্ষক সমাজ ও দেশবাসীর মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তিনি সর্বপ্রথম আলিগড় M. A. O. কলেজের গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু আবশ্যক মত তিনি সেখানে সংস্কৃত, ইংরেজী, ন্যায় ও ইতিহাস পড়াতেন। সারদারঞ্জন ছিলেন সর্বশাস্ত্র বিশারদ। সব বিষয়েই তার নিপুণ দক্ষতা। ছাত্র সমাজের নৈতিক উন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির জন্য তিনি ছাত্রদের চরিত্র সম্পদের দিকেই গুরুত্ব আরোপ করেন। অধিকন্তু দৈহিক উন্নতির জন্য ছাত্রসমাজে তিনি ক্রিকেটের প্রবর্তন

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় (১৩৬৫) ডঃ কুমুদরঞ্জন রায়। পৃঃ ৬৬

করেন। আলিগড় কলেজে ক্রিকেটের উন্নতির মূলে সারদারঞ্জন। কিন্তু আলিগড় থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হল। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হ'ল না। তাঁর সংস্কৃত অধ্যাপনায় ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছেই সংস্কৃত পড়বার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁকে অতিরিক্ত বেতন না দিয়ে, সারদারঞ্জনকে ঐ কর্তব্যপালনের জন্য জিদ ধরেন। কিন্তু আত্মমর্য্যাদা ও বিবেক বিসর্জন দেওয়া সারদারঞ্জনের ধর্ম নয়। তিনি আলিগড় ত্যাগ করলেন।

শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর ছিলেন Croft সাহেব। সারদারঞ্জনের পদত্যাগ সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি তাঁকে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেন। সারদারঞ্জন এলেন বহরমপুরে। কলেজের অধ্যক্ষ Rev. Livingstone সারদারঞ্জনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রথম বৎসরই কলেজের একটি ছাত্রকে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তির অধিকারী করে, সারদারঞ্জন কৃতিত্ব দেখালেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এবারে তিনি ঢাকা কলেজে যোগদান করলেন।

ঢাকা কলেজের সঙ্গে তাঁর বহু স্মৃতি বিজড়িত। এই কলেজ তাঁর বাল্যকালের শিক্ষাগার। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ছাত্রকল্যাণে মনঃসংযোগ করলেন। এখানে গণিতের সর্বাঙ্গীন চর্চায় তিনি অক্লান্ত গবেষকের ভূমিকা নিলেন। ছাত্রদিগকে জটিল গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও নির্মল আনন্দের আধার ক্রিকেট খেলার এক প্লাবনীধারায় তিনি ছাত্রসমাজে আলোড়ন তোলেন। এ সময়ে তিনি বিলেতের 'Educational times' এ রীতিমত গণিত বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশ করে বাঙালীর গণিত চর্চার গৌরব প্রদর্শন করেন।

ঢাকা কলেজে প্রসন্নকুমার রায়, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ মজুমদার, সূর্যকুমার অগস্তি, রাজকুমার সেন, প্রভৃতি খ্যাতিমান মনীষীবৃন্দকে তিনি বন্ধু হিসেবে লাভ করেন। এই সমস্ত অধ্যাপক মণ্ডলীর অনুরোধে তিনি Sankhya Philosophy নামে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকা মারফত প্রচারিত হলে, সুধীমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হয়। ঢাকায় অবস্থানকালে সারদারঞ্জনের মনের ভক্তিধারা ও জ্ঞান পিপাসা চিরন্তন পিপাসায় পরিণত হয় এবং তাঁর চরিতার্থতার জন্য তিনি অনন্যব্রতী জ্ঞান সাধক হয়ে পড়েন। বিদগ্ধ অধ্যাপক মণ্ডলী ব্যতীতও বহু সাধক, সন্ন্যাসী এবং সদাচারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, দুর্গাচরণ সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাজকুমার সেন, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, কৃষ্ণলাল নাগ, ডাঃ পি, কে, রায় প্রভৃতি বিদগ্ধ মহাজনদের সঙ্গে সংস্কৃত, গণিত, ধর্ম বিষয়ে নানা আলোচনায় দিন কাটাতেন। এঁদের অনেকের কাছেই সারদারঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণ ও দর্শন শাস্ত্রের পাঠগ্রহণ করেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য-সেবীদের রচনাদি তিনি পরিপূর্ণরূপে অধিগত করেন। এ সময়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন গণিত শাস্ত্রবিদ্ Booth সাহেব। Booth সাহেব ছিলেন সারদারঞ্জনের বন্ধু স্থানীয়। সারদারঞ্জন ও Booth সাহেবের প্রচেষ্টায় ঢাকায় ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে ঢাকা কলেজের ক্রিকেট খেলা উপলক্ষ্য করে Booth সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। ফল স্বরূপ সারদারঞ্জনকে কটন কলেজে বদলি করা হয়। সিংহ পরাক্রম সারদারঞ্জন আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে কর্ম ত্যাগ করেন। অতঃপর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আহ্বানে তিনি মেট্রোপলিটান্ কলেজে সহ-অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন—সম্ভবতঃ ১৮৯০ সালে। মেট্রোপলিটান বা বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা সূত্রে শিক্ষক হিসেবে তিনি অসামান্য গৌরবের অধিকারী হন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, তিনি পার্থসারথির ন্যায় সারথি পেয়েছেন—সারদারঞ্জনও এতদিনে যথার্থ রথীর সন্ধান পেলেন। বিদ্যাসাগর সারদারঞ্জনকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন। ২৯শে জুলাই ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে কলেজের দুরবস্থা দেখা দেয়। পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কলেজের ভার সমর্পণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের কালে কলেজের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। তিনিও এই কলেজ পরিত্যাগ করেন। বৈদ্যনাথ বসুর অবসর গ্রহণের পর, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ হন। এই সময়ে অধ্যক্ষ এন, এন, ঘোষ, সারদারঞ্জন রায়, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, গোলাপ শাস্ত্রী এবং ব্রজনাথ দে এই পাঁচজন সুরেন্দ্রবাবুর আমলের ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিদ্যাসাগর ইনষ্টিটিউটের সঙ্গে পাকা লেখাপড়া করে, কলেজের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। এদের প্রচেষ্টায় অল্পদিনেই কলেজ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হল।

১৮৯২ সালেও সারদারঞ্জন এই কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন। ৩রা এপ্রিল,

১৯০৯ সালে অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ পরলোকগমন করেন।২ ১৯০৯ সালে সারদারঞ্জন মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁর মৃত্যু অর্থাৎ ১৭ বৎসর কাল এই পদ অলঙ্কৃত করেন। সেই সময়ে কলেজের প্রভূত উন্নতি হয়। সারদারঞ্জনের পরিচালনায় কলেজ তহবিলে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা সঞ্চিত হয়। পূর্ব লেখাপড়া অনুযায়ী মূলধনের অর্দ্ধেক টাকা তাঁরা যথেচ্ছ নিয়োগের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ঐ সকল সদস্যের মধ্যে তখন সারদারঞ্জন ও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মাত্র বর্তমান ছিলেন। পাছে ৬০ হাজার টাকা দাবী করেন, এই ভয়ে ইনষ্টিটিউট্ হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে। এ সময় সারদারঞ্জন স্যার আশুতোষকে কলেজের দায়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ করেন। আশুতোষের অনুরোধে সারদারঞ্জন ও কালীবাবু তাঁদের প্রাপ্য ৬০ হাজার টাকা কলেজকে দান করেন। এই দুই দেবপ্রকৃতি দানবীর সেদিন কলেজের কল্যাণে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের উন্নতির জন্য, এই বিপুল অর্থের মায়া ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের উন্নতিবিধানের ইতিহাসে সারদারঞ্জনের অধ্যাপনা ত্যাগ এবং ছাত্র-বাৎসল্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সারদারঞ্জন সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। গণিত, সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙলা, ইতিহাস, দর্শন, এ সমস্ত বিষয়েই তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি কেবলমাত্র একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু গণিত ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অসাধারণত্ব একটু বেশী ছিল। অধ্যাপনা কালে তিনি ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করেছিলেন। ছাত্রদের এই অভাব দূরীকরণের জন্য তিনি গণিত বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গণিত বিষয়ে লিখিত তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে Algebra, Geometry ও Trigonometry প্রধান। এ ছাড়া ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি Algebrical Artifices নাম দিয়ে একখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষকবৃন্দ সারদারঞ্জনের গণিত গ্রন্থগুলিকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেননি। কিন্তু বিলেতের Macmillan Co. এ সব বইয়ের উৎকর্ষ উপলব্ধি করে প্রকাশের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। ম্যাকমিলান কোম্পানীর ডাইরেক্টর সাহেব স্যার আশুতোষকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভারতে কার গণিত সর্বোৎকৃষ্ট।" আশুতোষ

২ Nagendra Nath Ghose: an (essay). "Imfreedom Movement is Bengal": (1968) P. 405 Edited by Nirmal **Singha.**

বিনা দ্বিধায় বললেন—সারদারঞ্জনের অঙ্কের বই সর্বোৎকৃষ্ট। ম্যাকমিলান্ কোম্পানী বিশ হাজার মূল্যে গ্রন্থগুলির কপিরাইট্ কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গ্রন্থকার সারদারঞ্জন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণ এখনও তাঁর Trigonometry, Algebra, প্রভৃতি বইগুলিকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্করণ বলেন। সাহিত্য-সাধক, মানসী ও মর্ম্মবাণীর সম্পাদক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন—সারদাবাবু কেবল সংস্কৃতজ্ঞ নন, তিনি মূলত গণিতবেত্তা। পাটীগণিত যে সংস্কৃতে হইতে পারে, পাটীগণিত যে সুন্দর সরল ইংরেজী ভাষায় হইতে পারে, পাটীগণিত যে নানা নূতন তত্ত্ব-বহুল হইতে পারে, তাহা আমরা আগে কথনও শুনি নাই। এই মহাত্মা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিতে সচরাচর এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।"

বাঙলাদেশ জানে সারদারঞ্জন গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কলেজের অধ্যক্ষ গণিত বিদ্যাশিক্ষার্থীজনের আচার্য্য। আমাদের অনেকের ধারণা, যিনি গণিতে পরিপক্ব তিনি সাহিত্যে, বিশেষতঃ সংস্কৃতে অপটু। তাঁর সমস্ত চিন্তা, মেধা, স্মৃতি, বুদ্ধি কেবল গণিতের অভিমুখেই প্রধাবিত। কিন্তু সারদারঞ্জনকে যাঁরা বিশেষরূপে জানতেন, তাঁরা জানেন যে ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাসে তাঁর কি প্রগাঢ় অধিকার—অন্বেষণ করলেও তাদৃশ অধিকার গণিত শাস্ত্রবিদ্ অন্য কোন ব্যক্তিতে আবিষ্কার করা দুরূহ। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও সারদারঞ্জন একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি এ যুগের মল্লিনাথ। তাঁর অনন্যকরণীয় সংস্কৃত পুস্তকাবলীর প্রত্নতত্ত্ব-সমৃদ্ধ সংস্করণ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। সংস্কৃত পড়লেই তাঁর গ্রন্থগুলি অবশ্য পাঠ্যরূপে বিবেচিত হবে। যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান থাকবে, তাবৎ তিনি প্রখ্যাত থাকবেন।

সারদারঞ্জনের পিতার সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যাপনার চতুষ্পাঠী ছিল। গণিতজ্ঞ সারদারঞ্জনের মধ্যে পিতার সংস্কৃতানুরাগ খুবই কার্যকরী হয়েছিল। ছাত্র কল্যাণের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ সম্পাদনে ব্রতী হন। সারদারঞ্জনের গণিত গ্রন্থগুলি আশানুরূপ সমাদৃত হয়নি। এ সব কারণে দেশের শিক্ষকসমাজের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে, তিনি গণিতচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের আলোচনায় মগ্ন হলেন। ফলে সংস্কৃত সাহিত্য তাঁর শুভ্র মস্তকে মণিমুকুট স্থাপন করল—বাঙলার গৌরব বাড়ল। ১৮৮৪ সালে তিনি সর্বপ্রথম রঘুবংশের সটিক সংস্করণ প্রকাশ করলেন। সারদারঞ্জন সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে ১) রঘুবংশ ২) ভট্টিকাব্য ৩) কুমার সম্ভব ৪) শকুন্তলা

৫) উত্তর রাম চরিত ৬) কিরাতার্জ্জুনীয়ম ৭) মুদ্রারাক্ষস ৮) রত্নাবলী ৯) স্বপ্নবাসবদত্তা ১০) সিদ্ধান্ত কৌমুদীর কয়েকখণ্ড ১১) সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গ্রন্থপ্রণয়নের দ্বারা তিনি সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পথ সুগম করে দিলেন এবং অন্যদিকে নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করলেন। এই সমস্ত গ্রন্থে কবি পরিচয়, কবিভাষা, ভাবনা-বস্তু, পাঠ পরিচয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যাকরণ প্রসঙ্গে তিনি যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেন, তা সংস্কৃত চর্চার জগতে যুগান্তর আনলো। টীকা এবং বিভিন্ন পাঠ পরিচয় সমন্বিত এই ধরণের গ্রন্থ সারদারঞ্জনই ভারতবর্ষে প্রথম প্রণয়ন করলেন। বাঙালী পাণিনির ব্যাকরণ জানে না, এ অপবাদ গণিতজ্ঞ সারদারঞ্জনই দুর করলেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁর গ্রন্থগুলি সমাদৃত হল। বর্তমান কালেও সারদারঞ্জনের এই সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অপরাজেয় মহিমায় বিরাজ করছে। সর্বজন-সমাদৃত বহুল প্রচারিত গ্রন্থের অম্লান গৌরব নিয়ে তাঁর বইগুলি এখনও বেঁচে আছে। তাঁর চারখানি সংস্কৃত নাটকের সংস্করণ জার্মাণির অটো হ্যারোসোউইট্জ চল্লিশ হাজার টাকায় নিতে চেয়েছিল। সারদারঞ্জন সম্মত হননি। তাঁর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে জনৈক অধ্যাপক বলেছিলেন—He has chalked out a new path for himself in Sanskrit literature which some have vainly try to imitate. মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি সিদ্ধান্ত-কৌমুদী সম্পাদন কর্মে লিপ্ত ছিলেন এবং এই গ্রন্থের সমাস-কারক-সন্ধি খণ্ড প্রকাশ করেন। পরে তাঁর এই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন তাঁর কৃতী পুত্র ডক্টর কুমুদরঞ্জন রায় পি, এইচ, ডি, মহাশয়। তিনি দশ খণ্ডে 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে পিতার স্মৃতি পূজা করেন। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি কবিবৃন্দের উপর গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধরাজি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মর্যাদা লাভ করেছে। এই নিবন্ধ সমূহ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে সারদারঞ্জনের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা উপলব্ধি করে স্যার আশুতোষ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসের ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন হয়ত সারদারঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে পারেন। রাজা পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষ্যে তিনি গাথাপঞ্চদশী নামক যে শ্লোককাব্য রচনা করেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর কবি প্রতিভার নির্দেশক। সাহিত্যসাধক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন—"সারদারঞ্জনের শকুন্তলা যিনি পড়িয়াছেন, কালিদাসের কালনির্ণয়ের জন্য তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ বিচার পদ্ধতি যিনি

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই জানেন সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে এবং প্রত্নতত্ত্বাদি ব্যাপারে তাঁহার কি পরিমাণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, কুশাগ্রধী এবং বিচারপটুতা ছিল।"৩ সংস্কৃত সাহিত্যে সারদারঞ্জনের এই বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের জন্য গুণগ্রাহী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী অগ্রণী হয়ে তাঁকে "বিদ্যাবিনোদ" ও "সিদ্ধান্ত বাচস্পতি" উপাধিতে ভূষিত করে গুণের যথার্থ মর্যাদা দান করেন।

সারদারঞ্জনের বিদ্যাবুদ্ধি কেবলমাত্র গণিত বা সংস্কৃত শাস্ত্রেই পর্যবসিত ছিল না। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা সর্বদিকে সমভাবে বিকীরিত হয়েছিল। তিনি সুকুমারমতি শিশুদের জন্য ১) আরতি ২) হিসাব ও ৩) লঘুকৌমার প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। উদ্দেশ্য শিশুচিত্তে জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য তিনি "গৃহবৈদ্য" নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। মুস্কিল আসান (বীরবল) নামে একটি বইও আবিষ্কার করেন।

সারদারঞ্জন কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন নি। বাঙলা ও বাঙালীর অতিপ্রয়োজনীয় ব্যায়ামচর্চা, খেলাধুলা ও ক্রীড়াজগতে সারদারঞ্জন একটি স্মরণীয় নাম। বিশুদ্ধ বায়ু বাহিত মুক্তক্ষেত্রে পুরুষোচিত ব্যাপারে লিপ্ত থেকে সুনীতিকে সম্বল করে, শরীর ও সুস্থ স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে বাঙালীর মধ্যে অন্য কেউ সারদারঞ্জনের ন্যায় মনপ্রাণ সমর্পণ করে চেষ্টা করেছেন বলে, আমাদের জানা নেই। বাঙলাদেশে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ও টেনিস খেলার জগতে সারদারঞ্জন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সারদারঞ্জন ভারতে, বিশেষ করে বাঙলায়, ক্রিকেট খেলা প্রবর্তনের পথিকৃৎ। ভারতে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন হয়। ১৮৯৫ সালে লর্ড হ্যারিস্ যখন বোম্বাইয়ের গভর্ণর তখন তাঁর উৎসাহে ইংলণ্ড সমাগত খেলোয়াড়দের দ্বারা ভারতে প্রথম ক্রিকেট খেলার সূত্রপাত হয়। তার অল্প কয়েক বৎসর পরেই বাঙলাদেশে ব্যাপক ক্রিকেট চর্চা চলতে থাকে। সে সময়ে এই ক্রিকেট চর্চার পিছনে ছিলেন অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন। এ সম্বন্ধে বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখেছেন—"Long before the training of Indian cricketeers in Nawanagar and Patiala Principal Roy who was known as the Good Old Man of Bengal put his concentration in training up the young Bengalee players." ক্রিকেটের পরেই তাঁর প্রিয় ছিল মাছধরা।

৩ স্বর্গীয় সারদারঞ্জন। জগদিন্দ্রনাথ রায়। মানসী ও মর্ম্মবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

বিনাটোপে মাছ ধরার প্রথাও তিনি প্রবর্তন করেন। ১৮৯৮ সালের ১লা আশ্বিন তিনি খেলার সরঞ্জামের একটি দোকান খোলেন! এক্ষেত্রেও বাঙালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এগিয়ে আসেন। তিনি T. shape-এর আইরণ ডিউক্ ফুটবলের নমুনা বার করে রেজিষ্টারী করেন। খেলাধূলার জন্য Town Club এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর অবদান অসীম। তিনি Town Club প্রতিষ্ঠা করলেন বিত্তবান বাঙালীদের সাহায্যে। আলিগড় ও ঢাকা থেকে প্রত্যাগত সারদারঞ্জন যখন বিদ্যাসাগর কলেজের সহ-অধ্যক্ষ রূপে যোগদান করলেন তখন তিনি Town Club এর উন্নয়নে একমনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৮৯০ সালের শেষ দিকে Town Club এর প্রতিষ্ঠা। ভবানীপুরের Diana Club-এর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। নিজ কলেজে তিনি Athletic Section ও Fund খুলে ছাত্রদিগকে খেলায় যোগদান করতে বাধ্য করতেন। তিনি East Bengal Club এর প্রথম প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করেন। বহু ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বা অন্যভাবে তিনি যুক্ত ছিলেন। Lansdowne Shield, University League, Indian Schools vs European School প্রভৃতি বাৎসরিক ক্রিকেট খেলাগুলি তাঁরই চিন্তা প্রসূত। সাহেবরা তাঁকে ভারতের W. G. বলতেন। W. G. Grace ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-বীর। দেহ ও মনের স্বাস্থ্য, সরলতা ও সততা এই নীতিত্রয় ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন—"He said that Cricket was to him a means of building up a man's character. He was a great scholar in Sanskrit and Mathematics and did not look upon cricket as a pastime but as a subject of study and culture. The three maxims of his life were to be straight, strong and honest, and the maxims of his cricket were also straight bat play in batting, keeping on good length deliveries in bowling."[৪]

১৯২৫ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন ইহধাম ত্যাগ করেন। বাঙলাদেশ এক অসামান্য শিক্ষকের আশীর্বাদ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়। সারদারঞ্জন নির্মল পবিত্র ও দেবোপম চরিত্রের লোক ছিলেন। সমগ্রদেশ ও জাতিকে অফুরন্ত প্রাণসম্পদে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, সততায় সমুজ্জ্বল করে গড়ে তোলবার জন্যই তিনি আজীবন শিক্ষাদানব্রতে

৪ Amrita Bazar Patrika. 30th Sept, 1956.

মগ্ন ছিলেন। তাঁর সুগভীর ঔদার্য ও সরলতা দিয়ে তিনি ছাত্র-শিক্ষক ও বাইরের সমাজকে প্রীতি স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তোলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুপ্রভাত লগ্নে সারদারঞ্জন আমাদের বাতায়ন পথে নব অরুণচ্ছটা বিতরণ করার জন্য কত যত্ন চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করেছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ছাত্রদের যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য, তিনি রীতিমত সাধনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন চর্চার দ্বারা তিনি তরুণ মনে প্রাচীন ভারতের গৌরব গাথাকে মুদ্রিত করে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সারদারঞ্জন আজ বিস্মৃত। আজিকার শিক্ষাসংকটের এই ঘোর দুর্দিনে সারদারঞ্জনের ন্যায় শিক্ষাব্রতীদের জীবনযাত্রা পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। সারদারঞ্জনের ন্যায় বিদগ্ধ পণ্ডিত ধার্মিক ত্যাগী সাধু এবং সদাপ্রফুল্ল শিক্ষক একালের সমাজে একান্তই দুর্লভ। সারদারঞ্জন সেকালের শিক্ষক। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। বক্ষমান নিবন্ধে সারদারঞ্জনের দেবোপম চরিত্রের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

কুঞ্জলাল নাগ

অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ বিগত বাঙলার শিক্ষাজগতে ছিলেন এক দুর্মরতর প্রসিদ্ধি। তাঁর তিরোধানের পর অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে —পরিবর্তনের ঝটিকাবর্তে সেকালের ভাবনাচিন্তা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত মূল বোধগুলির অনেক কিছুই কালস্রোতে ভেসে গেছে। বাঙলাদেশের সেই অভূতপূর্ব জাগরণপর্বে যাঁরা সেদিন জাতীয় জীবনে নবচেতনার বারিনিষেক করেছিলেন—এযুগে তাঁদের অনেকেই আজ অস্পষ্ট—তাঁদের ধ্যান-চিন্তা-মনন-সাধনের মণি-মুক্তা সমূহও বিলোপন্মুখ। উনবিংশ শতকের জ্ঞান-ধর্ম-কর্ম-শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজকর্মে যে প্রাণাবেগ ও জীবনচাঞ্চল্য সমগ্র দেশ ও জাতিকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল তা কোনো একক মহাপুরুষের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি নয়। সে যজ্ঞে অনেকেই নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহারথী ছিলেন না। কিন্তু বাঙলাদেশের জাগৃতি—জাতীয়তার ঐ ঐতিহাসিক পর্বে কুঞ্জলাল নাগ একজন অবিস্মরণীয় সৈনিক। জাতীয় শিক্ষার বিস্তারে, স্বাদেশিকতায়, ভারতধর্মের মর্ম উপলব্ধিতে, ত্যাগব্রত ও চরিত্র মাহাত্ম্যে অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ এক বিরলতম ব্যক্তিত্ব। তথাপি একালের সমাজ মানসে কুঞ্জলাল নাগ এক দূরশ্রুত জনশ্রুতির মত। বরেণ্য শিক্ষাব্রতী কুঞ্জলাল নাগ এ যুগে প্রায়-বিস্মৃত। তাঁর জীবন ও সাধনার নির্ভর-যোগ্য চরিত কথা এ তাবৎ লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সাধনার পরিচয় বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য।

বঙ্গে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সূচনা। ইংরাজ শাসনের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান ইংরেজী শিক্ষা। জাতির চিত্তজাগরণ ঘটে ইংরেজী শিক্ষার দৌলতে। নব্যশিক্ষার পীঠভূমি কোলকাতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক য়ুরোপীয় বিদ্যার ব্যপ্তি সূচিত হলেও দূরবর্তী পদ্মাতীরের জনপদসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। ঢাকা জেলার বারদীর নাগবংশ খৃষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতক থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-আভিজাত্য ও কৌলিন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আদিসুরের দ্বিতীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কান্যকুব্জের নাগদিয়ার রাজবংশের কায়স্থ দশরথ নাগ প্রথম বঙ্গে আগমন করেন। দশরথ নাগ রাহুক গ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে তথায় বসবাস করতে থাকেন। বারদীর নাগবংশ এই দশরথ নাগের

বংশধারা দশরথ নাগ থেকে অধস্তন নবম পুরুষ ভগীরথ নাগ বাখরগঞ্জ জেলার করাপুর গ্রামে এসে চন্দ্রদ্বীপ সমাজভুক্ত হন। এই নাগবংশের ত্রয়োদশ পুরুষ নয়নানন্দ নাগ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে বারদী গ্রামে এসে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করেন। নয়নানন্দ বারদীয় নাগবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বারদীয় গ্রাম ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এই নাগবংশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'The Nag family originally came from Backergunj and their fortune was founded by one Nayanananda Nag, an eminent and learned man at the Court of Nawab of Murshidabad, who was rewarded with a large jaigir of land for his skill in decipheringa letter which came from constantinople.' এই বিবরণে কিছু ঐতিহাসিক ভুল থেকে গেছে।১

নয়নানন্দ নাগ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। অন্যদিকে নয়নানন্দ প্রতাপাদিত্য পত্নীর খুল্লতাত। মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর। কনষ্টানটিনোপল হতে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে রাজনৈতিক পত্র আদান প্রদান অস্বাভাবিক। মুর্শিদাবাদ নগরের পত্তন করেন মুর্শিদকুলী খাঁ অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে। নাগ বংশের একাদশ পুরুষ বলভদ্র নাগের সঙ্গে ভুলুয়ার প্রথিতযশা রাজা লক্ষণ মাণিক্যসুরের দুহিতা দয়াময়ীদেবীর বিবাহ হয়। নয়নানন্দ নাগ বলভদ্র নাগের কনিষ্ঠ পুত্র। নয়নানন্দ রাজকার্যে বিজ্ঞ ও পারসীভাষায় প্রাজ্ঞ ছিলেন। লিপিকুশল, কর্মদক্ষ, নির্ভিক, স্থিরপ্রতিজ্ঞ নয়নানন্দ বার ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর সুনজরে পড়েন। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী সম্রাট আকবর তাঁকে খাসদবির বা পত্রনবিশ পদে নিযুক্ত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। সম্রাটের নামে প্রেরিত এক অদ্ভুত চিঠির পাঠোদ্ধারের ফলে নয়নানন্দ মুঘল সম্রাটের সন্তোষ বিধান করেন। সম্রাটও তাঁকে অভিলাষ অনুযায়ী পুরস্কার প্রার্থনা করার আদেশ দেন। নয়নানন্দ সম্রাটের করুণার উল্লেখ করে কিছু ভূসম্পত্তি প্রার্থনা করেন। সম্রাটও হৃষ্টচিত্তে বিশেষ দরবার অনুষ্ঠানপূর্বক নয়নানন্দকে স্বহস্তে জায়গীরদারের ফরমান ও শিরোপা প্রদান করেন। জায়গীর

১ Eastern Bengal District Gazetter. Dacca District, vol. V Chapter XIV P-170

লাভের সময় ঈশাখাঁর প্রধান কর্মচারী বারদী নিবাসী অভয়াকর দাসের কন্যা অম্বিকাদেবীর সহিত রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য শূরের দৌহিত্র নয়নানন্দের বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহান্তে ভুলুয়ারাজ কল্যাণপুর গ্রাম স্থাপন করেন। কিন্তু জায়গীরপ্রাপ্ত ভূসম্পত্তি মেঘনা নদীর পূর্বতীরবর্তী থাকায় নয়নানন্দ তাঁর পূর্ব নিবাস করাপুর (কল্যাণ পুর) গ্রাম পরিত্যাগ করে বারদীতে আগমনপূর্বক স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। এই নয়নানন্দই বারদীর নাগবংশের আদিনাগ।

বারদীগ্রাম ঢাকা জেলার পূর্ব দক্ষিণ সীমান্তে মেঘনানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম জনপদের অন্তর্গত। প্রাচীন-কাল থেকে এই সুবর্ণগ্রাম, স্বর্ণগাম বা সোনারগাঁর ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। ইহা প্রাচীন বঙ্গের একটি প্রধান নগর। দনুজমর্দনদেব এই সুবর্ণগ্রামের অধিপতি ছিলেন। নাগ পরিবারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের জন্য বারদীগ্রাম প্রসিদ্ধ। বারদী-গ্রামের ভিন্ন প্রসিদ্ধি সিদ্ধসাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর (১৭৩১—১৮৯০) শেষ জীবনের আবাসস্থলরূপে। এই মহাপুরুষ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে বারদীতে পদার্পণ করেন; ২৯ বৎসর পর ১২৯৭ বঙ্গাব্দে তিনি দিব্যধামে গমন করেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতীর, 'সিদ্ধজীবন,' যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'ধর্মসার সংগ্রহ', কেদারেশ্বর সেনের, 'লোকনাথ মাহাত্ম্য' প্রভৃতি গ্রন্থে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দিব্যজীবনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বারদীর জমিদার ক্ষাত্রবীর নাগমহাশয়দের আশ্রয়ে সিদ্ধসাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। লোকনাথ আশ্রম ও লোকনাথ তিরোধান উৎসব নাগবংশীয় জমিদারদের ধর্মপ্রাণতার নিদর্শন। বারদীর নাগবংশ ও তাঁদের কর্মকীর্তির সর্বাঙ্গীন পরিচয় বর্তমান এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। সুপ্রাচীন নাগবংশের ইতিহাস ও তাঁদের কীর্তিকলাপের বিবরণ দুইখানি পুস্তক হতে অনুসন্ধিৎসুমাত্রেই বিস্তৃতভাবে অবগত হতে পারবেন।২ শিক্ষাক্ষেত্রে এই নাগপরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে এই পরিবারের বহু ব্যক্তি উর্দু, পারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পরবর্তী কালে পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার পদসঞ্চারণের যুগে নাগ সন্তানগণ সমগ্র বঙ্গদেশে নবযুগের নিশান উড্ডীন করেন। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসাবিদ, ব্যবহারজীবি,

২ অরুণকান্ত নাগ। বারদীর নাগবংশের ইতিবৃত্ত বংশাবলী (জানুয়ারী-১৯৩২ সুরেন্দ্র কুমার নাগ। • নাগবংশানুচরিত (শ্রাবণ-১৩৪১)

চিত্র-তক্ষণশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সমরবিজ্ঞানী, স্বাদেশিক, ক্রীড়াবিদ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরূপে এই পরিবারের বহুব্যক্তি দেশ ও জাতির মুখোজ্জ্বল করেছেন। এঁদেশে অন্য কোনো পরিবারে এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি য়ুরোপ ও আমেরিকা হতে সুশিক্ষিত হয়ে প্রত্যাগত হয়েছেন কিনা জানা যায় না। এই বংশের রোহিনীকান্ত নাগ উনিশ শতকের শেষ দশকে সর্বপ্রথম ভারতীয়, যিনি ইটালীর রোম নগরস্থ 'Institute of fine Arts' থেকে চিত্র বিদ্যা ও তক্ষণশিল্পে শীর্ষ স্থান অধিকার করেন এবং শিল্পচর্চায় বিদেশে ভারতের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী "রোহিনীকান্ত নাগের চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইউরোপগমন এযুগের বিশেষ ঘটনা" বলে সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন।৩ পরমাণুবিজ্ঞানী বাসন্তীদুলাল নাগ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের জীবনকথায় অনুপ্রবেশের পূর্বে বারদীর নাগবংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় অপরিহার্য্য বিবেচনায় উপস্থিত করা গেল। এই বংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ জমিদার কালীকৃষ্ণ নাগ। কালীকৃষ্ণ মহাশয় সত্যাশ্রয়ী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। উর্দু ও পারস্য ভাষায় তাঁর ছিল অগাধ অধিকার। এজন্য মুন্সী কালীকৃষ্ণরূপে তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর দুই পত্নী, গঙ্গামণি ও অম্বিকা। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অম্বিকা দেবীর অষ্টম গর্ভে কুঞ্জলাল নাগ জন্মগ্রহণ করেন। দেশে তখন রাজনৈতিক চাঞ্চল্য। সিপাহী যুদ্ধ ও নীল আন্দোলনের অগ্ন্যুৎসব সমগ্র দেশ ও জাতিকে ভাবান্দোলনে উদ্বেলিত করে তুলেছে। সেই সময় জে. পি. ওয়াইজ নামক একজন শ্বেতাঙ্গ নীলকর সাহেব ত্রিপুরা কালেক্টরীর অন্তর্গত শ্রীমদ্দি ও মাছিমপুরে দুটি নীলকুঠীর মালিক ছিলেন। ওয়াইজ সাহেবের অত্যাচারে নাগ জমিদারদের প্রজাবৃন্দ নানাভাবে উৎপীড়িত ছিল। এই বংশের কালীকান্ত নাগের পুত্র রাধাকান্ত নাগ ৭০০ শত লাঠিয়ালের এক বাহিনীদ্বারা ওয়াইজ সাহেবের নীলকুঠী দুটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে এই অঞ্চলে গ্রাম্য ছড়া ও লোক সঙ্গীতের প্রবর্তন হয়। কুঞ্জলালের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিদ্ধসাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদীতে আগমন করেন। তাঁর আগমনে বারদীর শাক্ত নাগবংশ এক ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। তদানীন্তন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কুঞ্জলাল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে তিনি প্রেরিত হন ঢাকা

৩ নব্যভারত। বৈশাখ—১৩০২

'কলেজিয়েট স্কুলে।' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কুঞ্জলাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দশটাকা বৃত্তিলাভ করেন। এই বৎসরে তিনি ঢাকা কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজের ছাত্র হিসেবে প্রথম শ্রেণীতে এফ. এ. উত্তীর্ণ হয়ে ২৫ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন।৪ অতঃপর কোলকাতা জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে (স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যয়ন করে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রশংসার সহিত বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এই পরীক্ষায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করায় তিনি 'রাধাকান্তদেব' স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত হন। তাঁর পূর্বে আর চারজন মাত্র এই পদক লাভ করেন। অতঃপর কোলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় অনার্স সহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় কেউই প্রথম শ্রেণী অর্জন করেননি। কুঞ্জলাল এম, এ, পরীক্ষাতেও পরিচ্ছদ ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেন। এখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি।

ঊনবিংশ শতকে য়ুরোপীয় জীবনধারার সংস্পর্শে এসে বাঙালীর সমগ্র চেতনার রূপান্তর হয়। জীবনের মূল্যমান পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। সেই উন্মত্ত তরঙ্গ শুধু ডিরোজিও শিষ্য বা ব্রাহ্মসমাজকেই চঞ্চল করে তোলেনি, তন্দ্রাতুর হিন্দুর সমাজদেহও আলোড়িত হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যশিক্ষার শাণিত যুক্তির আয়ুধে আহত হয়ে ম্রিয়মান বঙ্গসমাজে নব্য রেনেসাঁর পথ উন্মুক্ত হয়। সেদিনের বঙ্গ সমাজের সেই চিত্তজাগৃতি ও আত্মবীক্ষণের বিস্ফোরকগুলি তৎকালীন সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। য়ুরোপীয় শিক্ষা সেদিনের বঙ্গ সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শতকের প্রথমার্দ্ধে নির্মোহ যুক্তিবাদ, মানবিকতা ও সত্যদর্শন সত্যকার রেনেসাঁর লক্ষণকে পরিস্ফুট করে তুলেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুর নবজাগৃতির জয়যাত্রার ইতিহাস। এই পর্বে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, জ্ঞান ও তত্ত্বনিরূপণ আবেগপ্রবণ হিন্দু জাতীয়তার কার্যে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কুঞ্জলালের জীবন কথা পর্য্যালোচনার পূর্বে তৎকালীন দেশ ও সমাজের এই পরিবেশ পরিস্থিতির কথা স্মর্তব্য। কুঞ্জলালের আবির্ভাব মুহূর্ত থেকে বাঙলাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে ওঠে। বিজাতীয় শাসনের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করার জন্য ধীরে ধীরে জাতিবৈরের চেতনা দেশব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজী

৪ সাধারণী, ২৬শে পৌষ, ১২২৮।

শিক্ষার উৎকট নব্যতার তোষামোদ করার ফলে সমাজে যে উন্মার্গগামিতা প্রশ্রয় পেয়েছিল স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার পদসঞ্চারণের ফলে ভিন্নমুখী এক প্রতিক্রিয়া জাতিকে আচ্ছন্ন করে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুঞ্জলালের সমগ্র ছাত্রজীবন এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের উজ্জীবন পর্বের মধ্যে অতিবাহিত। ইংরেজী শিক্ষাকে তিনি আকণ্ঠ পান করেও উৎকট নব্যতা বা উন্মার্গগামিতা তাঁর অনুসন্ধিৎসুচিত্তে কোনো আনন্দবার্তা বহন করে আনেনি। বরং তিনি ভারতধর্ম ও ভারত সংস্কৃতির মুগ্ধ উপাসকরূপে হিন্দুজাতীয়তার অনির্বাণ যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেন। উক্ত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জাতি গঠনের ব্রতে নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর হন। কর্ম জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে কুঞ্জলালের এই মানস প্রকৃতির দিকটি বিশেষভাবে বিবেচ্য।

এই মানস প্রবৃত্তির জন্য কুঞ্জলাল ইংরাজ সরকারের অধীনে কোন প্রকার চাকুরী গ্রহণে বীতরাগ ছিলেন। অনেক উচ্চপদের লোভ সংবরণ করে অপরিসীম বিদ্যানুরাগের বশে শিক্ষাবিভাগকেই তিনি বরণীয় বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পৌত্র জানিয়েছেন তিনি দু'বার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের আহ্বান পেয়েও স্বাদেশিকতা ক্ষুণ্ণ হয় এই আশঙ্কায় তা গ্রহণ করেননি। Statutary Civil Service এর জন্য প্রস্তুত হয়েও পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকেন। তাঁর প্রথমাগ্রজ কৃষ্ণলাল নাগের ইচ্ছা ছিল কুঞ্জলাল বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন।৫ এই সব বৃত্তি অবলম্বন করলে তিনি তাঁর মেধা ও শক্তি বলে উচ্চশিখরে আরোহণ করে যশস্বী হতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষাব্রতীর বৃত্তিকেই তিনি বরণ করে নিলেন। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী।

কুঞ্জলাল যে বৎসর এম, এ পাশ করেন তখন তিনি ২১ বৎসরের যুবক। কুঞ্জলালের সমগ্র ছাত্রজীবন প্রতিভাস্বর। বাঙলা সরকারের তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগ কুঞ্জলালের গৌরবময় ছাত্রজীবনের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাঙলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আলফ্রেড ক্রফট্ সাহেবের কাছে বর্দ্ধমান রাজ কলেজের জন্য একজন যোগ্য অধ্যক্ষ চাহিলে ক্রফট্ সাহেব কুঞ্জলাল নাগের নাম সুপারিশ করে পাঠান। অতঃপর বর্দ্ধমানরাজের অনুরোধক্রমে

৫ অধ্যাপক শ্রীছবীন্দ্রলাল নাগের ১৭ আগষ্ট ১৯৭১ তারিখের পত্র।

কুঞ্জলাল বর্দ্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। এই কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি প্রথম শিক্ষাজগতে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পর তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। সেখানে তিনি স্বয়ং ইংরেজী, সংস্কৃত, গণিত ও তর্কশাস্ত্র পড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন সংস্কৃতের এম, এ। কুঞ্জলাল নাগ বিদ্যাক্ষেত্রে ছিলেন বহুচারী। "তিনি শেক্সপীয়র প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলি এমনই রুচিকর করিয়া পড়াইতেন যে, ঐ ঘণ্টায় কুঞ্জবাবু শেক্সপীয়র পড়াইবেন জানিলেই ঢাকা কলেজের ছেলেরা নিজ কলেজ ছাড়িয়া জগন্নাথ কলেজে চলিয়া আসিত এবং ঘণ্টাশেষ হইলে আপন কলেজে ফিরিত। তাঁহার আমলে সর্বত্র জগন্নাথ কলেজের সুনাম হইয়াছিল।"৬ এখানে সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা ও কলেজ পরিচালনার পর প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রোপ্রাইটরের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে স্বাধীনচেতা কুঞ্জলাল নাগ জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন।৭ দীর্ঘকাল ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করে কুঞ্জলাল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে (বিদ্যাসাগর কলেজ) ইংরাজী ও সংস্কৃত বিভাগে লেকচারার রূপে যোগদান করেন। ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবাসী কলেজে' ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।৮ এই সময়ে রিপন কলেজেও তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।৯ ত্রিপুরার রাজা আগরতলায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগের সহায়তা প্রার্থনা করলে তিনি আনন্দে তা গ্রহণ করেন। তিনিই এই কলেজে প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই কলেজ সম্বন্ধে অনুকূল মত পোষণ না করায় আগরতলা কলেজ বন্ধ হয়। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময় অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সক্রিয় সদস্যরূপে কোলকাতা, ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ জাতীয় কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। কুঞ্জলাল নাগ অতঃপর বিদ্যাসাগর কলেজে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে ইংরাজী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। আমৃত্যু প্রায় ১৫ বৎসর কাল কুঞ্জলাল নাগ বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন।

৬ রাজকুমার চক্রবর্তী। ছুটির পড়া (৪র্থ সং ১২৫৮) পৃঃ ৬৫-৬৬।

৭ সুরেন্দ্রকুমার নাগ। নাগ বংশানুচরিত (শ্রাবণ ১৩৪৯), পৃঃ ১৪৭।

৮ Souvenir: Bangabasi College Diamond Jubilee (1887-1947) P. 92-93.

৯ রাজকুমার চক্রবর্তী। ছুটির পড়া (৪র্থ সং ১২৫৮) পৃঃ ৬৬।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার (১২ই আষাঢ় ১৩৩১) অধ্যাপক নাগ কুমিল্লায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রহ্মানন্দ নাগের বাসভবনে পরলোকগমন করেন।১০

তৎকালীন বাঙলাদেশের বিভিন্ন কলেজে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছিলেন। বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন এদেশে এমন ব্যক্তির সংখ্যা বিরল নয়। কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যাপনা-বৃত্তির দ্বারা ব্যক্তি চরিত্রের মহত্ব নির্ণিত হতে পারে না। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের মহত্বের নিদর্শনগুলি অন্যত্র অনুসৃত। যে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-বৈগুণ্যে তিনি সমসাময়িক দেশ ও সমাজে জাতির চিত্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা সে যুগের অনুকরণসর্বস্ব বিলাতিয়ানার যুগে কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। প্রথমতঃ তাঁর অধ্যাপনা নৈপুণ্যের কথা বলা আবশ্যক। সংস্কৃত-ভাষা-সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁর অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। এই ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ছিলেন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তি। কিন্তু কুঞ্জলাল নাগের অধ্যাপক হিসাবে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সীমিত ছিল না। সেকালের সেই লিবারেল এডুকেশনের যুগে কুঞ্জলাল ছিলেন সর্বশাস্ত্র পারদর্শী কৃতী অধ্যাপক। কলেজের প্রয়োজনানুযায়ী তিনি সংস্কৃত ব্যতিরেকেও ইংরেজী, গণিত, দর্শন, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়েও দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু বিগত বাঙলার শিক্ষা জগতে ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে শেক্সপীয়র সাহিত্যের অমর অধ্যাপকরূপেই তাঁর দুর্মরতর প্রসিদ্ধি। ক্যাপ্টেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ড-সনের আমল থেকে বাঙলাদেশে শেক্সপীয়র চর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেই ধারাবাহিকতার ইতিহাসে কুঞ্জলাল নাগ নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভা ভাস্বর ব্যক্তিত্ব। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত পার্সিভাল, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, শিশির কুমার ভাদুড়ী, নীরেন রায় এবং তারকনাথ সেন প্রমুখ কৃতী অধ্যাপক সমাজের কথা স্বভাবতঃই এই প্রসঙ্গে মনে আসে। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক জীবনে তাঁর শেক্সপীয়র সাহিত্য পাঠের অধ্যাপনা খ্যাতি দেশব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন বসানো হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন গ্রেট বৃটেনের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার মাইকেল স্যাডলার। তাই কমিশনের নাম

১০ The Bengalee, Tuesday, July 1, 1924.

'স্যাডলার কমিশন'। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্যাডলার ও তাঁর অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে নিয়ে স্যার আশুতোষ কোলকাতার কয়েকটি কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। শেক্সপীয়র বিস্থায় তখন বিদ্যাসাগর কলেজের জনৈক অধ্যাপকের অশেষ সুখ্যাতি ছিল। তাঁর শেক্সপীয়র বিষয়ক বক্তৃতা শোনার জন্য কোলকাতার অন্যান্য কলেজের ছাত্ররাও আসত। স্যার মাইকেল স্যাডলার, আশুতোষ ও অন্যান্য সদস্যসহ ঐ অধ্যাপকের ক্লাস পরিদর্শন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণটি উদ্ধৃতিযোগ্য।

"Mr. Sadler of the Sadler Commission told Sir Asutosh that he would like to attend some classes on Shakespeare to ascertain the standard of teaching of Shakespeare in India. Sir Asutosh arranged accordingly. An old teacher was teaching in the Vidyasagar College.—Students clustered round him. The members of the Sadler Commission sat around the small Group of students. The Professor explained how the student should recite Shakespeare, how the critics differed in their appreciations, the Philological notes and soon-after the class Mr. Sadler Confessed he did not expect standard of teaching outside oxford The Professor felt a bit shy and said "I am an M. A in Sanskrit, not in English." He was Kunjalal Nag." ১১

অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ সংস্কৃতের এম, এ একথা জানতে পেরে স্যার মাইকেল স্যাডলার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—"তবে ইনি কি করে ইংরাজী পড়াচ্ছেন।" এ কথা শ্রবণ করে নির্ভিক কুঞ্জলাল নাগ বলেছিলেন—"Yes, I am an M A, in Sanskrit nodoubt. But I think no sane and sober frame of mind should labour under the misapprehension that an English pankhapuller should be expected to Teach English literature. ১২

স্যাডলার কমিশনের সম্মুখে অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের "ম্যাকবেথ" পড়ানো সম্বন্ধে তাঁর এক প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র নিখুঁত তথ্য পরিবেশন করে লিখেছেন—"মানুষ

১১ Souvenir : West Bengal College and University Teachers' Conference. 34th Session—1960, P. 3o.

১২ শতাব্দীর পরিক্রমা: বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী। যুগান্তর। ১০ মাঘ, ১৩৬৩।

এক জীবনে যে এত বিদ্যা সঞ্চয় করতে পারে, শুধু শিখে সঞ্চয় করা নয়, সেগুলি মনে রেখে প্রয়োজন মত ঠিক জায়গায় ব্যবহার করা, আমাদের মত সামান্য বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের কাছে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বলে মনে হয়।"১৩ কুঞ্জলালের শেক্সপীয়র অধ্যাপনা পদ্ধতি ছিল অনমুকরণীয়। শেক্সপীয়র পড়ানোর সময় প্রত্যেক কথাটির ধাতু ল্যাটিন, এ্যাংলোস্যাক্সন অথবা প্রাচীন ইংরাজী থেকে এসেছে কিনা তা পরিষ্কার করে দিতেন। শক্ত কথাগুলি কোন্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, ঐ একই ধাতু থেকে আর কি কি নিষ্পন্ন হতে পারে—এ সব বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। আবার চরিত্র বিশ্লেষণ কালে একটি লাইনের অনুরূপ প্যাসেজ শেক্সপীয়রের সমগ্র নাটকাবলী থেকে অনর্গল বলতেন; আবার ইংরেজী শব্দ গঠনে সংস্কৃত গ্রীক—অন্যান্য বহু এশীয় য়ুরোপীয় ভাষা বিজ্ঞানের প্রশ্ন তুলতেন। সমগ্র ইংরেজী সাহিত্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে ও শব্দতত্ত্বে কুঞ্জলালের অনায়াস অধিকার ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য স্যার মাইকেল স্যাডলারের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বলেছিলেন অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজেও ক্বচিৎ শেক্সপীয়র পড়াবার জন্য এত ভাল অধ্যাপক পাওয়া যায়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তিকে ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে নিয়োগ না করার জন্য তিনি স্যার আশুতোষের কাছে অনুযোগ করেছিলেন। বস্তুতঃ ইংরেজী বিদ্যায় কুঞ্জলালের এই স্বীকৃতি তার শিক্ষকজীবনের এক দুর্লভ গৌরব।

অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের জীবন ও সাধনার ধ্রুব লক্ষ্য ছিল স্বাদেশিকতা ও দেশ হিতৈষণা। উনবিংশ শতকের সমাজজীবন যে নব জাগ্রত জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার ভাবদ্বন্দ্বে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল—প্রত্যক্ষদর্শী কুঞ্জলাল সে মহাযজ্ঞের হবিঃশেষ আকণ্ঠ পান করেছিলেন। স্বভাবতই য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে যে উন্মার্গগামিতা ও উন্নাসিকতা সেকালের একশ্রেণীর মানুষকে মোহাবিষ্ট করে তুলেছিল তার আগ্রাসী প্রভাব থেকে কুঞ্জলাল ছিলেন মুক্ত। কুঞ্জলাল নাগ তাঁর ছাত্রজীবনেই সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭), নীল আন্দোলনের (১৮৬০) কথা শুনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭-১৮৭০), ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৬), ইলবার্ট বিল আন্দোলন (১৮৮৩), ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

---

১৩ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়। সেকালের শিক্ষাব্রতী। দেশ, ১৭ আষাঢ়, ১৩৬২।

(১৮৮৫) প্রভৃতির জাগরণ মুহূর্তগুলির সাথে পরিচিত ছিলেন। এই জাতীয় ভাব আন্দোলনের মধ্যে লালিত কুঞ্জলাল নাগের শিক্ষাব্রতী জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশ ও জাতি গঠন। তন্দ্রাচ্ছন্ন সমাজকে জাগ্রত জীবনবোধে প্রবুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন স্বদেশ মন্ত্রে সঞ্জীবিত বলিষ্ঠ মানুষ। অনুকরণ-সর্বস্ব বিজাতীয় শিক্ষার দ্বারা তা সম্ভব ছিল না। এই শিক্ষা আবহমানকালের ভারত সভ্যতাকে ঘৃণা ও অবমাননা করার প্রেরণা জুগিয়েছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে কুঞ্জলাল জীবনের ব্রত বলে মনে করতেন। ছেলেদের তিনি শুধু পড়াতেন না—তাঁদের গঠন করতেন—বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, চরিত্র-গৌরবে, ধর্মানুরাগে তাঁদের মানুষ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর সঙ্গে ছাত্র সমাজের সম্পর্ক পূর্বকালের আশ্রমবাসী গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে (২০, জুলাই) লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদেব প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এই বৎসরের ১৬ই অক্টোবর উহা কার্যে পরিণত হয়। এই সময় বাঙলার ধূমায়িত স্বদেশ-চেতনা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এক অদৃষ্ট-পূর্ব স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিহাসে ইহা প্রসিদ্ধ 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই পর্বে অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ তাঁব অকপট দেশপ্রীতির পরিচয় প্রদান করেন। স্বদেশীযুগের বাঙালীমাত্রই তা উপলব্ধি করেছিলেন। বিলাতি বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের প্রচাব আন্দোলনে কুঞ্জলাল ছিলেন সক্রিয় সৈনিক। সে যুগে এই স্বদেশী আন্দোলনের বড় প্রচারক স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ। ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য বাঙলা সরকারের সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইল এক সার্কুলার জারি করে ঘোষণা করেন—যদি স্কুল কলেজের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে স্বদেশী আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত না করেন তাহলে সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করবেন। আন্দোলন প্রশমিত হওয়া তো দূরের কথা—এই ঘোষণার বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃবৃন্দ "য়্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র। গোলদীঘির পূর্বদিকে ৬ ও ৪ নং কলেজ স্কোয়ারে 'সঞ্জীবনী' (১৮৮৩) পত্রিকার অফিস ছিল। এই ভবনেই কৃষ্ণকুমার মিত্র সহধর্মিণী, লীলাবতী মিত্রের সহিত বাস করতেন। ঐ সার্কুলারের পর বাঙলার বহু ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে বহিস্কৃত হয়। এই অফিস ভবনে বহিস্কৃত ছাত্রগণকে পড়াবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। "য়্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি"র বিশিষ্ট সভ্য অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ। "কুঞ্জলাল নাগ প্রভৃতি

কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাঁহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।"১৪ এই সময়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনও কৈশোর পর্ব উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনদীপ্তিতে সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের" অন্যতম কর্ণধার। ভাগবত চতুষ্পাঠী, (১৮৯৫) ডন্ পত্রিকা (১৮৯৭), ডন সোসাইটি (১৯০২), প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে (১১ই মার্চ) "ন্যাশন্যাল কাউনসিল অব এডুকেশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরের ১৪ই আগষ্ট "বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এ্যাণ্ড স্কুল" স্থাপিত হয়। অধ্যক্ষ হন (ঋষি) অরবিন্দ ঘোষ। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এখানে একাধারে প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক, ফেলো এবং বোর্ড অব ষ্টাডিজের সভ্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গের বিভিন্ন স্থলে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কুঞ্জলাল নাগ এই সময়ে কোলকাতা হতে পূর্ববঙ্গে প্রেরিত হন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কাজে তিনি ঢাকায় অধ্যাপনা করেন। এতৎব্যতীত মুন্সীগঞ্জ জাতীয় কলেজে বিনা বেতনে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন চারি বৎসর কাল।১৫ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের সংস্কৃতের প্রশ্নকর্তা ছিলেন যথাক্রমে কুঞ্জলাল নাগ ও গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।১৬ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত নিম্নবর্ণিত গ্রন্থখানিতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের যুগে কুঞ্জলাল স্বজাতি পূজায় স্বেচ্ছাব্রতী হন। স্বাজাত্য সংস্কৃতির চূড়ান্ত সিদ্ধির জন্য স্বদেশী সভা সমিতিগুলিতে তিনি জনাদৃত ভাষণ দিতেন। সে জন্য সেকালে বাগ্মী হিসেবেও তাঁর অশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। নাগবংশে বাগ্মী বলতে কুঞ্জলালকেই বোঝাত। তাঁর বাগ্মিতা পাণ্ডিত্য, উদ্দীপনা ও সঞ্জীবনী শক্তির মিশ্রণ।১৭

১৪ কৃষ্ণকুমার মিত্র। আত্মচরিত (১৩৪৩) পৃঃ ২৫১

১৫ সুরেন্দ্রকুমার নাগ। নাগবংশানুচরিত (১৩৪৯), পৃঃ ১৪৭

১৬ Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee. The origin of National Education Movement, 1905-1910, (1957), P-137

১৭ অরুণকান্ত নাগ। বারদীর নাগ বংশের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী (জানুয়ারী ১৯৩২) পৃঃ, ৪৩-৪৪

স্বদেশী সভাতেই নয় বিদ্বৎ মণ্ডলীর সভাতেও তাঁর বাগ্মীতার সুখ্যাতি ছিল।" ঢাকার স্বনাম প্রসিদ্ধ লালমোহন শাহ শঙ্খনিধির বাড়ীতে ভাগবত পাঠ উদ্‌যাপন দিনে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মহা মহা পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সভায় ঢাকার পক্ষ হইতে একমাত্র কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ই তাঁহাদের সঙ্গে সংস্কৃতে অনর্গল কথোপকথন ও শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া দামোদর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতাগ্রগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।"[১৮] কুঞ্জলাল নাগের এই স্বাদেশিকতার বীজ বহু পূর্বেই পরিবার মণ্ডলীর মধ্যে উপ্ত হয়েছিল। স্বদেশী যুগে এই গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দের মধ্যে লাঠি ও তরবারি খেলার প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য ও পরিচালক ছিলেন ভূপেশচন্দ্র নাগ। তিনি ছিলেন লাঠি ও তরবারি চালনায় সিদ্ধহস্ত। বারদীগ্রামের অনুশীলন সমিতির পরিচালক ছিলেন নিবারণচন্দ্র নাগ। এই গ্রামে ব্যায়াম ও কুস্তি করে যাঁরা দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শিবচন্দ্র নাগ, বরদাকান্ত নাগ, বিধুভূষণ নাগ ও প্রসন্নকুমার দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৮৪ বৎসর পূর্বে শিল্পী রোহিনীকান্ত নাগ ইটালী যাওয়ার প্রাক্কালে নাগসন্তানদল নিয়ে একটি বালকসৈন্যদল গঠন করেছিলেন। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের বীর্যবত্তা ও স্বাদেশিকতার মূলে নাগ বংশের ক্ষাত্রবীর্যসাধনার এই ঐতিহ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

উনবিংশ শতকের প্রায় গোড়া থেকে ধর্ম সংস্কার প্রচেষ্টা বাঙলার নবজাগরণের একটা বিশিষ্ট দিক। শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে আবেগপ্রধান ভক্তিবাদ ও পৌরাণিক মত প্রাধান্য পায়। হিন্দুধর্মের মূলে নূতন প্রতীতি ও মূল্যবোধের রসসঞ্চার হয়। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবে পৌরাণিক হিন্দুধর্মে মানুষের আস্থা ফিরে আসে। রামমোহন যে আদর্শ নিয়ে বাঙলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর লোকান্তরের পর সে আদর্শ হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। শিক্ষিত বাঙালী পুরাণ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের নবজাগ্রত ধর্মচেতনাকে অধ্যাপক কুঞ্জলাল আলিঙ্গন করে নেন। এই সূত্রেই কুঞ্জলাল নাগের স্বধর্মনিষ্ঠা, গুরুভক্তি, দেশপ্রাণতা, পরহিতৈষণা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসহীন অনাড়ম্বর সংযমশীল জীবন সেকালের মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ পরিত্যাগ করে

১৮ সুরেন্দ্রকুমার নাগ। নাগবংশানুচরিত (শ্রাবণ ১৩৪৯) পৃঃ ১৪৯

হিন্দুধর্ম, বিশেষ করে, বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃপ্রচারে যুগ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। সেই সময় কুঞ্জলালও গোস্বামীর মতাদর্শ গ্রহণ করেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—"বারদীগ্রাম নিবাসী অধ্যক্ষ ও সুপণ্ডিত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় গোসাইজীর শিষ্য ছিলেন। তিনিই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কথা তাঁকে বলেন। সে কথা শুনিয়াই গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য বারদী গ্রামে গিয়াছিলেন। আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিলেন। তথায় পৌছিয়া তাঁহাকে দর্শন করায় তিনি তাঁহার লেঙ্গট ও বহির্বাস গোস্বামী মহাশয়কে প্রদান করিলেন। তিনি তাহা মাথায় চূড়ার মত বাঁধিয়া আসনে ধীর ও স্থির ভাবে বসিলেন। এই দুই মহাপুরুষের মিলনের দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন সকলেই অন্তর মধ্যে ভগবদ্ভক্তির প্রেরণা অনুভব করিবেন।১৯ জগবন্ধু মৈত্র প্রণীত 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' (২য় সং ১৩৩০) গ্রন্থের ব্রহ্মচারী সম্মিলন অধ্যায়ে এই মহাপুরুষ সম্মিলনের কথা আছে। বস্তুতঃ ধর্মপ্রাণ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের চেষ্টায় এই মিলন সম্ভব হয়। গুরু বিজয়কৃষ্ণের জীবনী প্রণয়নে তিনি "বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধনা ও উপদেশ" গ্রন্থখানির লেখক অমৃতলাল সেনগুপ্তকে নানাভাবে সহায়তা করেন। রমেশচন্দ্র সরকার প্রণীত একখানি গ্রন্থে২০ কুঞ্জলালের ভগবদ্ভক্তির প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বারদীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ধর্মজীবনের কাহিনী, তাঁর তিরোধান উৎসব এবং তাঁর আশ্রমাদির প্রতিষ্ঠা কালীকান্ত নাগ, বরদাকান্ত নাগ প্রমুখ নাগ জমিদারদের প্রচেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের ধর্মপ্রাণতা ও গুরুভক্তি সম্বন্ধে একজন লেখক লিখেছেন—"তাঁহার গুরুভক্তি গুরুভক্তির আদর্শ। জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি গুরুবাক্য তিনি সাধ্যমত প্রতিপালন করিয়াছেন এবং ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বারদীর শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন যে, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, খালি কর্ম্মখণ্ডন করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সকলকে ত্যাগ করিতে পারি, গুরুকে নহে।"২১ স্বধর্মে তাঁর

---

১৯ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ (জানুয়ারী ১৯৫৬), পৃঃ ২৯৭

২০ বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (১৩৭১)

২১ প্রফুল্লচন্দ্র বসু। স্বর্গীয় অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ। মাসিক বসুমতী। শ্রাবণ, ১৩৩১

নিষ্ঠা ছিল অপূর্ব। হিন্দুর আচরিত পূজা-অর্চনা ও শাস্ত্রানুশাসন তিনি অঙ্গীকার করে চলতেন। কেউ তা লঙ্ঘন করলে ব্যথিত হতেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব তাঁকে স্বধর্ম হতে এক তিলও বিচলিত করতে পারেনি। বিদেশী অনুকরণে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদেও ছিল স্বাদেশিকতা। সাধারণ ধুতি চাদর, জামা ও জুতা পরিধান করে তিনি কলেজ ও বড় বড় সম্মিলনীতে যোগদান করতেন। ময়ূরপুচ্ছধারী যুবক সম্প্রদায়ের বিকৃত জীবন চর্চার জন্য অশেষ ক্লেশ অনুভব করতেন। দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অন্তঃস্রোত ফল্গুর মত নীরব। বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ হওয়ার পর যখন স্বদেশী আন্দোলন বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়, তখন অনেক চরমপন্থীর জীবন যাত্রায় দেখা দিয়েছিল রূপান্তর। কিন্তু অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ তখনও 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' ব্যবহার করে তাঁর স্বাদেশিকতার স্বর্ণপতাকা উড্ডীন রাখেন। ধর্মজীবন ও আধ্যাত্ম সাধনায় কুঞ্জলাল কত উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন— নিম্নোক্ত বিবরণটি তার নির্দেশক। "সিদ্ধমহাত্মা বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী একদিন সমাগত ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন," কুঞ্জকে আমি ভালবাসি কেন জান? ভাল লোককে সবাই ভালবাসে।' কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় সেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই ছেলেটিকে আমার নরেন্দ্র, নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) বলে বোধ হচ্ছে কেন?" গোস্বামী ৺বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভু (চৈতন্যদেব) সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া যে আনন্দলাভ করিতেন, আমিও ইহাকে (কুঞ্জলাল নাগকে) স্পর্শ করিয়া সেই প্রকার আনন্দ পাই।"২২ অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে ঊনবিংশ শতকের মহাপুরুষের এই অভিমত নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের মহানুভবতা, হৃদয়বত্তার দুই একটি নিদর্শন প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করে তাঁর চরিত্রের আস্বাদ সম্ভব। দরিদ্র ছাত্র ও সহায় সম্বলহীন নিঃস্বব্যক্তির আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন তিনি। বহু দরিদ্র বিদ্যার্থী তাঁর সাহায্যে বিদ্যার্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এজন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে দরিদ্র ছাত্রগণকে দান করে তাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতেন। বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপকগণের বেতন বৃদ্ধির জন্য ছাত্র বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব হয়, অধ্যাপক

২২ সুরেন্দ্রকুমার নাগ নাগ বংশানুচরিত সিরাজগঞ্জ, শ্রাবণ, (১৩৪১) পৃঃ-১৪৯

কুঞ্জলাল এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বর্দ্ধিত বেতন গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তাঁর মহানুভবতার ফলেই সেবারের মত দরিদ্র ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত থাকে। দুঃস্থ, দরিদ্র পরিচিতদের খোঁজ-খবর রাখা কুঞ্জলালের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। ট্রাম স্ট্রাইকের গোলযোগের সময় তিনি অবিচারের নীরব প্রতিবাদকল্পে ট্রামে চড়া ছেড়ে দেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে তাঁর অধ্যক্ষতা কালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। কোলকাতা হতে একটি বিখ্যাত থিয়েটারের দল কোনো নামকরা লোকের নেতৃত্বে ঢাকায় আসে। সেই দলে কতিপয় অভিনেত্রী থাকায় কুঞ্জলালের সমর্থনে ছাত্ররা পিকেটিং আরম্ভ করে। ঢাকা জেলার তদানীন্তন ইংরেজ শাসক এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করে অধ্যক্ষকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে প্রশ্ন করেন তিনিই এই পিকেটিং চালনা করেছেন কিনা? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তেজোদৃপ্ত ভাষায় কুঞ্জলাল উত্তর দেন—

"I do emphatically deny any allegation, but I assert unequivocally that I shall be the first in the field if such a lead is wanted by the boys of my College."২৩

এই সব ক্ষুদ্র ঘটনা ও প্রসঙ্গগুলি কুঞ্জলালের চরিত্র আস্বাদে মূল্যবান।

অধ্যাপনা, স্বাদেশিকতা ও ধর্মসাধনার মধ্যে কুঞ্জলালের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এজন্য তিনি সারস্বত চর্চায় যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেননি। প্রচার বিমুখতাও এর অন্যতম কারণ।

গ্রন্থ সূচী

*১। সীতার বনবাস
২। নীলদর্পণ (নাট্যরূপ)
৩। বিল্বমঙ্গল (নাটক)
৪। জটিল (নাটক, ভক্তমাল অবলম্বনে)
৫। ভট্টিকাব্যম্, ১ম, ২য়, ও দ্বাদশ সর্গ (সম্পাদিত)
৬। রঘুবংশম্, ১ম—৬ষ্ঠ সর্গ (সম্পাদিত)
৭। সংস্কৃতি সরণি
৮। শিশু তোষণী
*৯। শকুন্তলা

---

২৩ পৌত্র অধ্যাপক ছবীন্দ্র লাল নাগের পত্র হইতে।

* তারকা চিহ্নিত পুস্তক দু'খানির উল্লেখ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ নাগ।

ভট্টিকাব্যম্ ও রঘুবংশম্ কলেজপাঠ্য এই পুস্তকগুলি সেকালে বহুল প্রচলিত ছিল। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষা আস্বাদ্য ছিল। তাঁর রচনা সম্ভার ইংরাজী, বাঙলা, সংস্কৃত শুধু ব্যাকরণ সঙ্গত বাক্য সম্পদেই সমৃদ্ধ ছিল না। ভাবের গভীরতায় ও রসমাধুর্য্যেও ছিল অপূর্ব। তাঁর কিছু কিছু ইংরাজী ও বাঙলা নিবন্ধ সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত আছে। সঙ্গীত ও গীতিকাব্যে ছিল তাঁর সুগভীর অনুরাগ। বিশেষ করে কীর্তন সঙ্গীতে তাঁর পারদর্শিতা ও কৃতিত্ব ছিল বহুবিদিত। নাট্যান্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশী ভাবপ্রচারে তাঁর আগ্রহ ছিল সমধিক' ঢাকা নগরীর একমাত্র রঙ্গমঞ্চ ইলিসিয়াম থিয়েটারে তাঁর রচিত বিল্বমঙ্গল, জটিল, শকুন্তলা মহা সমারোহে অভিনীত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তাঁর রচিত পুস্তকাবলী অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ সেকালের দেশ বরেণ্য ব্যক্তিগণের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেন। যে সকল বিদ্বৎমণ্ডলীর সহিত তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল তাঁদের মধ্যে Sir Alfred Croft, R. T. H. Griffiths C. H. Tawney, H. W. P, Scroops, বর্দ্ধমান রাজের ম্যানেজার T. de Burgh Miller, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু, অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যক্ষ জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হারানচন্দ্র চাকলাদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, হরিনাথ দে, শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য একটি নিবন্ধে তার গুণাবলী ও মহত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।২৪

বর্তমান নিবন্ধে অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগের শিক্ষাব্রতী জীবন ও সাধনার কথঞ্চিৎ পরিচয় উপস্থিত করা গেল। তাঁর জীবনচর্চা ও ধর্মাচরণ বিদ্যাসাগরের আদর্শে নিরূপিত ছিল। ছাত্র দরদ ও পরদুঃখকাতরতায় তিনি বিদ্যাসাগরের অনুগামী শিষ্য। এক সময়ে মফঃস্বলের কোনো একটি কলেজ খুব লম্বা বেতনে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি সুরভিত কলেজ ও গঙ্গাতীর ত্যাগ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদে কলেজ কর্তৃপক্ষের

২৪ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, আমার দেখা মানুষ কুঞ্জলাল নাগ। শিক্ষাসেবক, শ্রাবণ ১৩৩৬

দরবারে নিয়ত হাজিরা দেওয়াকে তিনি অবমাননাকর মনে করেছিলেন। দ্বাবিংশ বার্ষিক বিদ্যাসাগরের স্মৃতি সভায় সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন—বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, বিদ্যাসাগরের কর্মিতা ও কার্য্যোদ্যম হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; উন্নত বিশাল হৃদয়ের সহিত যুক্ত ছিল। তিনি জ্ঞানবীর ও কর্মবীর ছিলেন; কিন্তু সর্বাপেক্ষা হৃদয়বীরতার গুণে তিনি নিত্য স্মৃতি ও নিত্যারধনার বস্তু হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহামহীরুহের দুইটি শাখা। একটি উৎকট জলদভিভাবিনী। তেজস্বিতায় প্রদীপ্ত, অপরটি আর্তশারণ্যা পরদুঃখহারিনী করুণাময় স্নিগ্ধ, কমনীয়া বোধ হয় বহু আকারে প্রকটিত-ক্ষেত্রে বিরাজিত এই বস্তুদ্বয়ের সম্মিলন ও সমন্বয়ই বিদ্যাসাগরের আরাধনীয়তার স্বরূপ ও নিদান।"২৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি পূজা উপলক্ষে উচ্চারিত উপরোক্ত সারগর্ভ বচনগুলি কুঞ্জলাল নাগের জীবনদর্শনের অনুগত ছিল। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচনাকালে এই ধারণা বদ্ধমুল হয়েছে যে, সেকালের শিক্ষক সমাজে অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ ছিলেন বিদ্যাসাগরের সার্থক অনুগামী।২৬

২৫ কুঞ্জলাল নাগ, বিদ্যাসাগর। জন্মভূমি, শ্রাবণ, ১৩২০

২৬ এই নিবন্ধ রচনায় অধ্যাপক স্থপতিরঞ্জন নাগ 'বারদীর নাগ বংশের ইতিবৃত্ত ও বংশাবলী' ও 'নাগবংশানুচরিত' নামক দুখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে বর্তমান লেখককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কুঞ্জলাল নাগের পৌত্র অধ্যাপক ছবীন্দ্রলাল নাগ, শ্রীমতী শোভনা নাগ এবং শ্রীমতী শুক্লা নাগও বর্তমান লেখককে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

পুণ্যশ্লোক রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম। কিন্তু ঈশানচন্দ্র এ যুগে প্রায়-বিস্মৃত। একদা বাঙলার চিন্তাজগতে কালান্তরের অভ্যুদয় সূচনা করেছিল প্রতীচ্য শিক্ষা। সেদিন জীবনের সীমাঙ্কিত বলয়-রেখা হয়েছিল সম্প্রসারিত। আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে বাঙালী জীবনের নূতন তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিল। ভৌগোলিক চতুঃসীমায় বন্দী এ দেশের মানুষ, এই দিব্য মুহূর্তে বৃহৎ ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। বাঙালীর এই মানস মুক্তির ইতিহাসে এ দেশের শিক্ষাসমাজের অবদান নগণ্য নয়। একালে শিক্ষক-সমাজ পূর্বের সেই সমুন্নত স্থান অধিকার করেন না। চিন্তাজগতের স্বভাব-নেতৃত্ব শিক্ষকের হাত থেকে স্খলিত হয়ে আশ্রয়ান্তর অবলম্বন করেছে। এর ফল যে ভাল হয়নি, বর্তমানের উদ্‌ভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট সমাজের দিকে লক্ষ্য করলেই, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি উনিশ শতকের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষকগণ বাঙালীর নবজাগৃতির ইতিহাসে আধুনিক জীবনের যে বার্তা বহন করে এনেছিলেন—সেই ঐতিহ্যের অনুস্মৃতি বিংশ শতকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। বাঙালীর শিক্ষাসম্প্রসারণের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে আচার্য ঈশানচন্দ্র ঘোষ এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

বাঙলার শিক্ষাজগতের দিকপাল, সরস্বতীর বরপুত্র ঈশানচন্দ্র ঘোষ। অগ্নিগর্ভ শমীশাখার মত প্রজ্জ্বলন্ত পৌরুষদীপ্ত কর্মযোগী ঈশানচন্দ্রের জীবন ও সাধনার গূঢ় বাণী বিচার করলে দেখা যাবে তিনিও উনিশ শতকের বাঙালী জীবনের যন্ত্রণা তথা প্রাণ ও মননের গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ঈশানচন্দ্র তাঁর বাল্য-কৈশোর ও যৌবনে বাঙলার শিক্ষা-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনে যুগন্ধর পুরুষ বিদ্যাসাগরের বিদ্যুৎ-সঞ্চারী কর্মকাণ্ডকে মুগ্ধনেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যে বহ্নিশিখা নিয়ে বিদ্যাসাগরের জয়যাত্রা, মনে হয়, ঈশানচন্দ্র সেই জ্ঞানবর্তিকাকেই জীবনের মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই জ্ঞানবাদের সঙ্গে অনুস্যূত হয়েছিল, অকুণ্ঠ মানবপ্রেম। মানবপ্রেমই ঈশানচন্দ্রের শিক্ষা-সাধনা, ব্যক্তি চেতনা ও সমাজ চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল বলে আমার ধারণা। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের জীবন ও সাধনার বহুক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ঈশানচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত দরিদ্রের সন্তান। তিনি বাল্য ও যৌবনে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে বিদ্যার্জন করেন। সর্বপ্রকার প্রলোভনকে অস্বীকার করে ঈশানচন্দ্র শিক্ষাব্রতীর জীবনকে বরণ করে নেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মত তিনিও ছাত্রপাঠ্য অসংখ্য মৌলিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগরের মতই তাঁর অন্তঃস্থলে ছিল মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রীতি। এই মানবপ্রেমই ঈশানচন্দ্রের সমগ্র সত্তা, যুক্তি, দার্শনিকতা, সমাজবোধ, এক কথায় তাঁর সমগ্র চিত্তবৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। আবার ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহে তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। ঈশানচন্দ্র সেই অর্জিত অর্থ বিদ্যাসাগরের মত জন-কল্যাণে অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। সুকঠিন চরিত্র, বজ্র-কঠোর পৌরুষ এবং সমুদ্রবৎ অসীম করুণার সংমিশ্রণে গঠিত ঈশানচন্দ্রের চরিত্র প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনীয়। তৎসত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তাঁর স্বতন্ত্র চরিত্র গৌরবে চিরভাস্বর। আর ঈশানচন্দ্র সেই বিদ্যাসাগরীয় ঐতিহ্যের বিরলতম স্মৃতি।

ঈশানচন্দ্রের চরিত্র ও প্রতিভামুগ্ধ ভক্তগণের কেউ কেউ, তাঁর সম্বন্ধে দু-একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এগুলির মধ্যে সর্বত্র ঐক্যমত দুর্লভ। বক্তব্যে অকিঞ্চিৎকর, এই সমস্ত রচনার দ্বারা, ঈশানচন্দ্রের পূর্ণাবয়র জীবনচিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। বাঙলাদেশ, বঙ্গসমাজ ও সংস্কৃতির হলেও ঈশানচন্দ্র তাঁর শিক্ষক জীবনের সূচনাতেই পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ হেষ্টির একখানি প্রশংসাপত্র (১লা জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ) থেকে তা অনুভব করা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঈশানচন্দ্র যশোহর জেলার নড়াইল হাইস্কুলে প্রধান-শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। দু'বৎসরকাল কার্যকালে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। এজন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রকুমার রায় ও কালিদাস রায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের সরকারী চাকুরী লাভ করেন। কোলকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের দু'মাস কার্যকালে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অশেষ প্রশংসা লাভ করেন। অতঃপর তিনি কৃষ্ণনগর (নদীয়া) কলেজে প্রেরিত হন। কৃষ্ণনগর থেকে পুনরায় কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসরই তিনি স্থায়িভাবে জেলা স্কুল-ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্মসূত্রে অতঃপর তিনি হুগলী নর্মাল স্কুলে (১৮৯৭ খৃঃ) এবং আরো কিছুকাল পরে হেয়ার স্কুলে (১৯০৩ খৃঃ) প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। হেয়ার স্কুলে একাদিক্রমে ১৩ বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের

দায়িত্ব পালন করে, তিনি অবসর (জানুয়ারী, ১৯১৬) গ্রহণ করেন। যে সময় তিনি হেয়ার স্কুলের কার্যভার গ্রহণ করেন তখন বিদ্যালয়ের অবস্থা ছিল নৈরাশ্য-জনক। তাঁর ঐকান্তিত প্রচেষ্টা ও নিরলস সাধনায় অচিরকাল মধ্যে এই বিদ্যাপীঠ বাঙলাদেশের শিক্ষাজগতে গণনীয় স্থান দখল করে। সুদূর ইংলণ্ড থেকে মিঃ জেমস্ লিখেছিলেন—You have had illustrious predecessors in the post, but you have the satisfaction of reflecting that the school was never more flourishing than in the years of your control

আচার্য ঈশানচন্দ্র বাঙলাদেশের শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান সমূহে তিনি শিক্ষকতা করেন। কিন্তু এই পরিচয় পূর্ণাঙ্গ নয়। তিনি বাঙলার শিক্ষাবিভাগের বহু দায়িত্বশীলপদে আসীন ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের বাৎসরিক বিবরণাদি রচনার কাজে তাঁর সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। স্যার আলফ্রেড ক্রফট্ ও মিঃ টনির আমলে শিক্ষাবিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করার সময় ঈশানচন্দ্র গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ন্যাশ ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন তা মুখ্যতঃ ঈশানচন্দ্র কর্তৃক রচিত। ঈশানচন্দ্র সামান্য কিছুদিনের জন্য (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ খৃঃ) ছোটনাগপুরে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টরের পদে স্থানান্তরিত হন। বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টরের (১৮৯৬-১৯০১, ও ১৯০৩ খৃঃ) পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র মহামেডান এডুকেশনের জন্য এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এই বৎসরেই ঈশানচন্দ্র প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে উন্নীত হন। ঈশানচন্দ্র প্রথম বাঙালী যিনি সহকারী এ, ডি, পি, আই, রূপে (১৯১০-১২ খৃঃ) শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে ঈশানচন্দ্র শিক্ষাবিভাগে 'গেজেটেড র‍্যাঙ্কে' (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খৃঃ) উন্নীত হন। বাঙলা-দেশের শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে প্রায় ৩১ বৎসর কাল নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে ঈশানচন্দ্র আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যে কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করেন, নানা কারণে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঈশানচন্দ্র বিশ্বস্তভাবে শিক্ষাবিভাগের সেবা করেন—এজন্য গুণগ্রাহী সরকার ঈশানচন্দ্রকে 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গতযুগের শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্রের অবদান নগণ্য ছিল না। ঈশানচন্দ্রের

জীবনবৃত্তের যে পরিচয় পরিবেশিত হয়েছে তা নিতান্তই ঘটনামাত্র। শুষ্ক সাল তারিখের ঘটনাপঞ্জী দিয়ে মানুষের মহত্ব বা ঔদার্যের মাপ সম্ভব নয়। সেজন্য ঈশানচন্দ্রের শিক্ষক জীবনের স্বতন্ত্র দিকগুলি উন্মোচিত করা প্রয়োজন। শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা বড় গৌরব আদর্শ ও এক যুগসন্ধিক্ষণে ঈশানচন্দ্রের আবির্ভাব। উৎকট যুগসমস্যা ঈশ্বরচন্দ্রের চিত্ত ও চরিত্রে অনমনীয় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল—তেমনি ঈশানচন্দ্রও অলোকসামান্য চিত্তবলের সাহায্যে গতযুগের বাঙলাদেশে চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র যশোহর জেলার খরস্থতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মতে এই গ্রাম মাতুলালয় ধুতরাহাটী। পিতা চন্দ্রকিশোর ঘোষ এবং মাতা কালীতাবা। দরিদ্রের ঘরের সন্তান ঈশানচন্দ্র বাল্য ও কৈশোরে অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্রের জীবনের এক অশুভ বৎসর। এ বৎসরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। অধিকন্তু একাধিক আত্মীয় পরিজনের বিয়োগ ব্যথায় তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েন। মৃত্যু ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে পিতৃহীন ঈশানচন্দ্র জীবনের পথে অগ্রসর হন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ (১৮৭২ খৃঃ) করে তিনি ফরিদপুর ইংরেজী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে তিনি বিষম দারিদ্র্যে জর্জরিত। কিন্তু দারিদ্র্যের নিপীড়ন তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহাকে দমন করতে পারেনি। ছাত্রজীবনের বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ঈশানচন্দ্র 'ফরিদপুর ইংরাজী স্কুল' থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৭৫ খৃঃ) এবং বৃত্তি লাভ করেন। এফ, এ, পাশ করেন মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র হিসেবে (১৮৭৮ খৃঃ)। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ (১৮৮১ খৃঃ) ও এম, এ (ইংরেজী, অনার্স ইন সেকেণ্ড ডিভিসন্—১৮৮২ খৃঃ) উত্তীর্ণ হন, জেনারেল এসেম্বলীর (স্কটিস্‌চার্চ কলেজ) ছাত্ররূপে। কলেজের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'ম্যাকফারসন্ প্রাইজ'ও তাঁর অধিকারে আসে। সৌভাগ্য-বশতঃ এফ, এ, ও বি, এ, উভয় পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি লাভ করেন। বি, এ, গণিতে ঈশানচন্দ্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম ছাত্র। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজীতে ঈশানচন্দ্রের পারদর্শিতা সত্ত্বেও, তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর কেউ কেউ তাঁকে গণিতের এম, এ, হিসেবে দেখতে চেয়ে-ছিলেন। গতযুগের স্বনামখ্যাত গণিতাচার্য্য গৌরীশঙ্কর দে প্রিয় ছাত্র ঈশানচন্দ্রকে প্রদত্ত এক প্রশংসাপত্রে (২৮, ডিসেম্বর, ১৮৮৭ খৃঃ) আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লিখে-ছিলেন—"I believe he would have passed the M. A. Examination

in Mathematics creditably, if he had taken up that subject, instead of English language and literature, in the M. A. examination." বিধাতার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে ঈশানচন্দ্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের এম, এ, পাশ করে ছাত্রব্রত সম্পন্ন করেন।

ঈশানচন্দ্র যে যুগের লোক, সে যুগে ইংরেজীশিক্ষিত এতদ্দেশীয় জনের সম্মুখে চাকুরীর অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু ঈশানচন্দ্র রেনেসাঁ যুগের চরিত্রগৌরব ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। জাগৃতি ও জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার যে প্রবল বন্যাবেগ জাতীয় মানসে তরঙ্গাঘাত করেছিল, তা ঈশানচন্দ্রের তরুণচিত্তকে উদ্বেলিত করে। সেজন্য ঈশানচন্দ্র অপেক্ষাকৃত স্বল্পআয়ের শিক্ষাব্রতীর বৃত্তি গ্রহণ কবেন। সে যুগে যাঁরা এ পথ বেছে নেন তাঁদের অনেকেই ক্লেশ স্বীকার করেছেন —দারিদ্র্যবরণ করেছেন। সুকঠিন ত্যাগ, অধ্যবসায় ও চরিত্রশক্তির বলে ঈশানচন্দ্র গতযুগের বাঙলাদেশে আদর্শ শিক্ষকের গৌরব লাভ করেন। সে যুগের তরুণচিত্তে তিনি যে আদর্শ ও স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্র মুদ্রিত করেছেন তা আমাদের শিক্ষা সাধনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আদর্শবান হয়েও ধূলামাটির পৃথিবীকে তিনি অস্বীকার করেননি। ছাত্রজীবনেই অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র শশিমুখীকে বিবাহ করেন সুতরাং জীবন-জীবিকার দিকটি তিনি বিস্মৃত হননি। তথাপি শিক্ষকতা, সারস্বতচর্চা ও স্বাধীন ব্যবসাকে তিনি জীবনচর্চার পাথেয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এম, এ, উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশানচন্দ্র জেনারেল এসেমব্লীজ ইনষ্টি-টিউশনে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এনট্রান্স ও কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা-পত্র পরিশুদ্ধ করার ব্যাপাবে তিনি সহযোগী অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। খুব অল্পকালের মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা। ঈশানচন্দ্র সে ক্ষেত্রে সার্থক শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা পদ্ধতি ছিল স্বকীয়তায় ভাস্বর। কেবল-মাত্র মেধাবী ছাত্রসমাজ নয় অতি সাধারণ ছাত্রও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সাফল্যের আস্বাদ লাভ করত। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সমূহের মধ্যে তিনি বিদ্যাকে সীমিত করে রাখতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিষ্ণাত ঈশানচন্দ্র প্রবল ইংরেজ আধিপত্যের যুগেও দেশের তরুণচিত্তে স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত করে দিতেন। নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত গুণাবলী ছাত্রসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁর মতে সত্যানুসন্ধান শিক্ষার মূলমন্ত্র। এ

ব্যাপারেও তিনি ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করতেন। কর্মকুশলতায়, স্বাদেশিতায়, স্পষ্টবাদিতায় এবং বলিষ্ঠ চরিত্রবত্তায় ঈশানচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ সন্তানদের সমকক্ষ ছিলেন। দারিদ্র্যের কঠিন নিপীড়নে তাঁর বাল্যজীবন ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। দুঃখ ও দারিদ্র্যের মর্মজ্বালা তিনি নিজে অনুভব করেছিলেন। সে কারণেই বোধকরি ঈশানচন্দ্র পরবর্তী জীবনে দেশ ও জাতির গৌরববৃদ্ধি করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে পড়ছে বিশ্রুতকীর্তি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কথা। প্রফুল্লচন্দ্র এদেশে শেক্সপীয়র চর্চার ইতিহাসে একটি বিরলতম নাম। তাঁর এই কৃতিত্বের মূলে পিতৃদেব ঈশানচন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম। ঈশানচন্দ্রের এইরূপ কীর্তিমান ছাত্রের সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু এখানে সে ইতিবৃত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশে আমার ঐকান্তিক অনীহা।

ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীলাভ করার অব্যবহিত পরে ঈশানচন্দ্র সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ইংরেজী এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায়ই তিনি অবাধ বিচরণ করতেন। প্রথম জীবনেই তিনি ইংলিশম্যান ও অমৃত বাজার পত্রিকায় অনুবাদকের কাজ করেন। তাঁর লিখিত সংবাদ নিবন্ধাদি বহুল প্রশংসিত হয়। ইংলিশম্যান পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর J. O. B Saunders একখানি পত্রে (১৬, মার্চ, ১৮৮৫ খৃঃ) সংবাদপত্রসেবী ঈশানচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় তাঁর যোগ্যতা একপ্রকার অবিসংবাদিত হলেও, নির্লিপ্তভাবে সাহিত্য সেবা তিনি করতে পারেননি; তৎসত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যকীর্তি অকিঞ্চিৎকর নয়। তাঁর অত্যাশ্চর্য অবদানে বঙ্গসাহিত্যও সমৃদ্ধ। এই সূত্রে তাঁর বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সমূহের কথা স্মর্তব্য।

বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকাদি রচনার ক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্র এ দেশে অন্যতম অগ্রপথিকের মর্যাদা লাভ করেছেন। বস্তুতঃ বিশেষ শিল্পচেতনা ব্যতিরেকে আদর্শ ছাত্রপাঠ্যপুস্তক রচনায় সাফল্য সম্ভব নয়। শিশু অথবা কিশোর শিক্ষার্থী সমাজের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সদাজাগ্রত মানসিকতা নিয়েই আদর্শ পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্ভব। বিশেষতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস বিষয়ক প্রস্তাবগুলি প্রাঞ্জল ও পরিমিত না হলে এরূপ গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঈশানচন্দ্র ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষার্থী সমাজের মনোজগতের অতল গহ্বরে তাঁর জাগ্রত দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিলেন। কেবল পাঠ্য-বিষয় নয়, ছাত্রসমাজের নৈতিক, মানসিক

চরিত্রের সৌকর্য বিধানে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। দেশের প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতি আকর গ্রন্থগুলিকে তিনি জ্ঞান ভাণ্ডার বলে মনে করতেন। সদাচার, বিনয়শীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী এই সমস্ত পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে তরুণ মনে মুদ্রিত করে দিতেন। আবার ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙলা প্রভৃতি ভাষাসমূহ শিক্ষার জন্য তিনি সহজ প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় পুস্তক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনায় তিনি বিদ্যাসাগরের অনুগামী। সে যুগের শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল। ঈশানচন্দ্র সে অভাব বহুলাংশে পূরণ করেছিলেন।

ঈশানচন্দ্র প্রণীত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সমূহের একটি সম্ভাব্য পঞ্জী বর্তমান ক্ষেত্রে উপস্থিত করা যাচ্ছে। হয়ত এই গ্রন্থপঞ্জীও সম্পূর্ণ নয়। তাঁর এই সমস্ত গ্রন্থের প্রকাশকাল আজ আর সর্বত্র সুলভ নয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর কার্যালয়ে বোধকরি এই সব প্রকাশ তারিখ অনুসন্ধান সাপেক্ষে মিলতে পারে। বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থসমূহের নাম (১) মহাপুরুষ চরিত (ওয়াশিংটনের জীবনী), ২য় সং ১৩০৬, (২) নূতন শিশুপাঠ ১৯০৫, (৩) হিতোপদেশ ১৯০৫, (৪) শিশুপাঠ্য ভূগোল বিবরণ ১৯০৫, (৫) বালকপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৯০৬, (৬) শিশুপাঠ্য বাঙলাদেশের ইতিহাস ১৯০৬ (৭) বিজ্ঞান পাঠ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সহযোগে) ১৩০৯ (৮) ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৯) প্রবন্ধ মুক্তাবলী (গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগে) (১০) আদর্শ শিশু পাঠ (যোগীন্দ্রনাথ বসু সহযোগে) (১১) ঐতিহাসিক পাঠমালা (বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহযোগে) (১২) সেকালের কথা (১৩) পুরাকাহিনী, (১৪) বালক পাঠ (১৫) First Book of Reading (১৬) Second Book of Reading (১৭) Student's History of India (আবদুল করিম সহযোগে) (১৮) Model papers with answers on the English Entrance Course (গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগে)-১৯০৫, (১৯) Days of Ancient Rome (২০) Rip Van Winkle—Legends of the sleepy Hollow প্রভৃতি।

গত যুগে ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত পুস্তক পাঠ করেননি এমন বাঙ্গালী ছাত্র বিরল, বোধহয় এরূপ মন্তব্য অত্যুক্তি নয়। তিনি বাঙলা ভাষায় ভারতবর্ষের যে ইতিহাস প্রণয়ন করেন, অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল বাঙলাদেশের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক এই পুস্তকখানি আদৃত ছিল। তাঁর নূতন শিশুপাঠ, সেকালের কথা, প্রবন্ধ মুক্তাবলী, পুরাকাহিনী, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ, বিজ্ঞান পাঠ, ঐতিহাসিক পাঠমালা

প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকসমূহ একদা সমাদৃত ও বহুল প্রচারিত ছিল। বিদ্যাসাগরের 'কথামালার' প্রকাশকাল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ। তিনি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং-এর নির্দেশে রেভাঃ টমাস জেমস্ সম্পাদিত 'ঈশপস ফেব্‌ল্‌স' অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচনা করেন। ঈশানচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত ফেব্‌ল্‌স সমূহ বাঙলায় 'হিতোপদেশ' নামে প্রচার করেন। হিতোপদেশের প্রচারে তিনি এতদ্দেশে পুরোধাব্যক্তির গৌরব অর্জন করেন। এই গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগরের 'কথামালার' একাধিপত্য বহুলাংশে খর্ব করে। এতৎব্যতীত তাঁর সটীক সংস্করণ Days of Ancient Rome এবং Rip Van Winkle—Legends of the Sleepy Hollow পুস্তক দুখানির জন্য এতদ্দেশীয় শিক্ষিত মহলে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মধ্যে ঈশানচন্দ্রের সারস্বত সাধনা সীমাবদ্ধ ছিল না। জীবনের ঊষালগ্নে সাংবাদিকতায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও দুরূহ জ্ঞান সাধনাতে তাঁর সারস্বত জীবন চরিতার্থ হয়। শিক্ষকতার সঙ্গে জ্ঞান সাধনাও ছিল তাঁর জীবনের অনন্য ব্রত। জ্ঞান কাণ্ডের বহুধা শাখায় তিনি বিচরণ করতেন—এখানে তাঁর লক্ষ্যও ছিল সুনির্দিষ্ট। সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ও গণিতে ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তিনি আমৃত্যু গণিত শাস্ত্রের অনুশীলনে অবিচল ছিলেন। সংস্কৃত রসসাহিত্যই নয়, এর ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অনুশীলনে তিনি গভীর আনন্দ লাভ করতেন। তাঁর সমধিক আসক্তি ছিল ইতিহাসে। জ্ঞান চর্চার বহুধাক্ষেত্রে তাঁর এই আত্যন্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগের কাহিনী লিপিবদ্ধকালে কেউ কেউ লিখেছেন—

"His special hobby was history. In his historical studies, he loved to go always to the original sources. In the last six months of his life, he renewed his acquaintances with Thucydides, Xenophen, Tacitus and Suetonius and the last book he had in hand before he was taken ill was Herodotus In ancient literature, Homer and Kalidas were his chief favourites. He had once planned a series of books in Bengali on the lines of Blackwood's "Ancient Classics for English Readers' and himself written parts of Homer's Illiad and Kalidas's Vikramorvasi ; Fragments of these projected works are among the family papers. In later life, he found delight

in critical study of the Upanisads." (The Amrita Bazar Patrika, 29 Octo. 1935)

ঈশানচন্দ্র ঘোষের অক্ষয় সারস্বত কীর্তি 'বৌদ্ধ জাতকের' অনুবাদ। কেবলমাত্র এই অদ্বিতীয় সারস্বত কর্মের জন্য বঙ্গসাহিত্যে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মিথায়েল ফিগো ফৌসবল 'জাতকথ বন্ননা' নামক সুবিশাল পালিগ্রন্থ-খানি সম্পাদনা করেন। ঈশানচন্দ্রের জাতক (ছ'খণ্ড) এই দুরূহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ কর্ম, ঈশানচন্দ্রের জীবনের এক সারস্বত যজ্ঞ। সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে ঈশানচন্দ্র দীর্ঘ ষোল বৎসর কাল সুকঠিন অধ্যবসায় ও শ্রমের বিনিময়ে এই অসাধ্য ব্রত সম্পন্ন করেন। বার্দ্ধক্য, ভগ্নস্বাস্থ্য, মৃত্যুশোক, এবং জীবনচর্য্যার বহুবিধ দায় দায়িত্বকে অস্বীকার করেও তিনি বঙ্গভাষায় জাতকের বাণীরূপ সুসম্পন্ন করেন! ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ কর্মের জন্য ছয় জন পণ্ডিতের নিয়ত পরিশ্রম ব্যতিরেকেও বিদ্বৎ সমাজের পক্ষ থেকে সর্ব প্রকার সহায়তা অপরিহার্য হয়েছিল—প্রৌঢ় ঈশানচন্দ্র একক কৃতিত্বে ন্যূনাধিক বারো হাজার টাকা নিজ অর্থব্যয়ে সেই দুঃসাধ্য সাহিত্যব্রত সম্পন্ন করেন। এজন্য বৃদ্ধ বয়সে যৌবনোচিত উদ্যমে তিনি পালি ভাষা ও সাহিত্য অধিগত করেন। মাতৃভাষার সেবায় ঈশানচন্দ্রের এই অবিস্মরণীয় সাধনা একপ্রকার বিরলদৃষ্ট ও তুলনারহিত। দুর্নীতিমূলক উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহামূল্যগ্রন্থ অধিকসংখ্যক পাঠকের মনোরঞ্জন করবে না জেনেও, তিনি এই বহু ব্যয়সাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে আসে সম্মান ও প্রশংসা। 'সর্বভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন' তাঁকে 'সদ্ধর্ম রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। জাতক পাঠ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"জাতকের বঙ্গানুবাদ পরলোকগত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অপূর্ব কীর্তি। বৃহৎ এই গ্রন্থখানির মধ্যে কোথাও শৈথিল্য নাই, সর্বত্রই লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরিচয় আছে, এইরূপ বহু প্রয়াসসাধ্য ও চিন্তাসাধ্য অধ্যবসায় বাঙলা সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। এই অসামান্য উদ্যোগে লেখক বাঙলা পাঠকদিগের নিকট চিরস্মরণীর হইয়া রহিলেন। এই গ্রন্থখানির অনুশীলন করিয়া অনেক উপকার পাইতেছি। সেজন্য অনুবাদকের নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।" (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩) মাতৃভাষায় বৌদ্ধ 'জাতকের' আস্বাদ মূলতঃ ঈশানচন্দ্রের সাধনার ফলেই সম্ভব হয়েছে। পালিভাষার রত্ন ঐশ্বর্য বঙ্গভারতীর মনিমঞ্জুষাকে ঋদ্ধ করে তুলেছে। 'জাতকের' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। ৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে। প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধ স্বরূপ ছুটি নিবন্ধে 'জাতক' সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা একাধারে গবেষণা-ধর্মী—পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিন্তাসমৃদ্ধ। 'জাতকের' ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে নিবন্ধ ছুটি বহু মূল্যবান। বৌদ্ধ 'জাতক' নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্র এদেশে অগ্রপথিকের মর্য্যাদা পাবেন। পরবর্তী কালে অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন Studies in the Jatakas, Journal of the department of Letters. Vol, XX, 1930) এবং গোকুলদাস দে "Significance of Jatakas (1951) প্রভৃতি গবেষণামূলক রচনায় ঈশানচন্দ্রের উদ্দেশ্যকে ব্যাপ্তি দান করেছেন। ঈশানচন্দ্রের পৃথক গ্রন্থ 'জাতক মঞ্জরী' (১৯৩৪ খৃঃ) প্রকাশ করেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থখানি মূল 'জাতকের' নির্বাচিত উপাখ্যানের সংকলন। এই গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'উপক্রমণিকায়' 'জাতক' বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর অবিসংবাদিত মনস্বিতা ও পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' এক বিশেষ অধিবেশনে আচার্য যদুনাথ সরকার ও ডঃ সিলভা লেভী তাঁর সারস্বত সাধনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষক সমাজের কল্যাণ বিধায়ক বহুবিধ সংস্থা, সমিতি সংগঠনের কথা শোনা যায়। বাঙলাদেশে বেসরকারী বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও অসহায় শিক্ষক সমাজের দুঃখ দুর্দশার ইয়ত্তা ছিল না। ঈশানচন্দ্রই সর্বপ্রথম অবহেলিত শিক্ষক সমাজের দুঃখ মোচনের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জীবন ধারণের উপযুক্ত বেতন পান না। চাকুরীর স্থায়িত্বও নির্ভর করে ম্যানেজিং কমিটির খামখেয়ালীর উপর। এই সুস্পষ্ট বৈষম্য ও অবিচার ঈশানচন্দ্রের মর্মস্থলে আঘাত হানে। এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিরোধ কল্পে তিনি বাঙলাদেশের শিক্ষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। ঈশানচন্দ্র বাঙলাদেশে শিক্ষক আন্দোলনের পথিকৃৎ। মূলতঃ তাঁরই নেতৃত্বে এদেশে প্রথম 'শিক্ষক সমিতি' গঠিত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত বাঙলার রংপুর জেলার গাইবাঁধা মহকুমায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে যে শিক্ষক সম্মিলন হয়—ঈশানচন্দ্র ছিলেন এই সম্মেলনের প্রাণ-স্বরূপ। এই সম্মেলনেই "নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি"র জন্ম। ঈশানচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সমিতি পরিচালনার সর্ববিধ দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু শুভকর্ম নির্বিঘ্নে

সম্পন্ন হয় না। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।' বহু বাধা বিপত্তিকে অঙ্গীকার করে ঈশানচন্দ্র 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি'কে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিক্ষক সমিতির পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচিতব্য নয়। ঈশানচন্দ্র ১৯২১—৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি'র সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সমিতির মুখপত্রের নাম Teachers' Journal' ও "শিক্ষা ও সাহিত্য।" ঈশানচন্দ্র এই পত্রিকা দু'খানি প্রায় বারো বৎসরকাল (১৯২৩—১৯৩৪ খৃঃ) অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন (Teachers' Journal, March, 1934)। বস্তুতঃ ঈশানচন্দ্র ছিলেন শিক্ষক সমাজের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টা। 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির' প্রাণপুরুষ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুতে সমিতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ঈশানচন্দ্রের পদ শূন্য থাকেনি—কিন্তু তাঁর মত বুকভরা সহানুভূতি ও নিষ্ঠা নিয়ে সমিতির কাজে অন্য কেউ আত্মনিয়োগ করেননি। এজন্য এপার-ওপার বাঙলার শিক্ষক সমাজ ঈশানচন্দ্রের পুণ্যনাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ঈশানচন্দ্র তাঁর জীবৎকালেই ক্রমবর্ধমান স্বাদেশিকতার পদসঞ্চারণকে প্রত্যক্ষ করেন। ইংরেজ সরকার পরিচালিত শিক্ষাবিভাগে চাকুরীজীবন অতিক্রান্ত ও 'রায় সাহেব' খেতাব লাভ করেও, ঈশানচন্দ্র ছিলেন স্বদেশ আত্মার মূর্ত বিগ্রহ। দেশ-হিতৈষণা অস্থি মজ্জার মত তাঁর জীবনের সঙ্গে ছিল ওতঃপ্রোত। তিনি তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে নির্মোহ জ্ঞানবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন অকুণ্ঠ মানবপ্রেম। প্রজ্জ্বলন্ত পৌরুষদীপ্ত ঈশানচন্দ্রের জীবন ও সাধনার গূঢ়তর বাণী কর্মযোগ। এক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের অনুগামী এবং সমকালীন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। চাকুরীজিবী ও ব্যবসা-বিমুখ বলে বাঙালীর অপবাদ আছে। ঈশানচন্দ্র বাঙালীর এই জাতীয় অপবাদ অনেকাংশে অপনোদন করেন। পণ্ডিতলোকের বিষয়বুদ্ধি কম, প্রায়শঃ এইরূপ গল্প শোনা যায়। কিন্তু ঈশানচন্দ্র এই দুর্মর কিংবদন্তীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তদানীন্তন বাঙলার ব্যবসাক্ষেত্রে ঈশানচন্দ্র একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। শিক্ষাবিভাগ হ'তে অবসর নেওয়ার পর তিনি বহু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। এক্সচেঞ্জ মার্কেটের খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে থাকত। নিজ ব্যবসা-বুদ্ধি বলে ঈশানচন্দ্র অনেকগুলি জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর ডাইরেক্টর হন। ইকুইটেবল কোল্ কোম্পানী, রাণীগঞ্জ কোল এসোসিয়েশন, কুয়ারদি কোল কোম্পানী, বেঙ্গল. পেপার মিল্স্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ পরিচালিত ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তিনি ডাইরেক্টর ছিলেন। কোনো কোনো বিদেশী কোম্পানীতে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ডাইরেক্টর। ব্যবসায় জগতে অদৃষ্টকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। "উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" এই চিরায়ত প্রবাদ তাঁর জীবনে সার্থকতায় মণ্ডিত হয়। একদা যে দরিদ্র বালক খেয়ার কড়ি ও গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্য অর্থের জন্য নির্যাতন সহ্য করেছিলেন—কর্মশক্তি ও পুরুষকার বলে পরবর্তী জীবনে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা লাভ করে হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ঈশানচন্দ্র বিলাসিতাকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। অর্জিত বিপুল অর্থ ও ঐশ্বর্য তিনি দেশ-হিতৈষণার কাজে মুক্তহস্তে দান করেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রেও ঈশানচন্দ্র স্বাতন্ত্র্যের যে পদচিহ্ন অঙ্কিত করেন তা কেবল স্বদেশী যুগেই নয়—একালের শিক্ষিত বেকার ও দিশেহারা তরুণ সম্প্রদায়কে নূতন জীবন মন্ত্রের সন্ধান দেবে।

বদান্যতা, দানশীলতা ও পরোপচিকীর্ষা ঈশানচন্দ্রের চরিত্রের মহত্তম দিক। প্রচার-বিমুখিনতা তাঁর দান কর্মের সৌন্দর্য। নীরবে নিভৃতে দান করাই ছিল তার স্বভাব ও চরিত্রলক্ষণ। বাল্য জীবনে তিনি অশেষ দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করেছেন। পিতৃহীনতার দুঃখ তিনি নিজ জীবনে অনুভব করেছিলেন। সে জন্য অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকাদের প্রতি তিনি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। কোলকাতায় সুদৃশ্য ও সুরম্য সৌধ নির্মাণ করে বসবাস করলেও, জন্মপল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। আমাদের পাশ্চাত্য ও পরানুকরণের যুগে পল্লী বাঙলার শিক্ষিত ও অর্থবান ব্যক্তিরা নগরাভিমুখী হয়ে পড়ায়, বাঙলার গ্রাম জীবনে দেখা দেয় চূড়ান্ত অবক্ষয়। পল্লীজীবনের প্রতি আমৃত্যু আকর্ষণ ছিল তাঁর। তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি-বিজড়িত খরস্যুতি গ্রামের জন্য ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই গ্রামের শ্রী ও সৌকর্যবিধানে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। গ্রামে মাতার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পিতার নামে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর একমাত্র কীর্তি নয়। এই দুটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি 'রিজার্ভ ফাণ্ডে' দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখেন। সুপেয় জলের জন্য জন্মপল্লীতে তিনি দুটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও নলকূপ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মচর্চার জন্য স্থাপন করেন একটি শিবমন্দির। পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তার অভাব। ঈশানচন্দ্র গ্রামবাসীদের যাতায়াতের জন্য একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করে দেন। দরিদ্র গ্রামবাসীরা মহাজনের কবলে পড়ে প্রায়শঃ লাঞ্ছিত হয়। এজন্য তিনি নামমাত্র সুদে বা বিনা সুদে ঋণ প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। বস্তুতঃ স্বগ্রাম খরস্যুতির

উন্নতি বিধানে তিনি যে ত্যাগ ভালবাসা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন একালের দেশ-নেতৃবৃন্দের পক্ষে তা অনুসরণযোগ্য। শুধু স্বগ্রামেই নয়, কুকুরদষ্ট বাঙালীদের চিকিৎসার জন্য তিনি পাঞ্জাবে "কশৌলি পাস্তর ইনষ্টিটিউটে" সহধর্মিণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি পৃথক ভবন নির্মাণ করে দেন। মৃতা কন্যার নামে যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে রোগীদের বাসোপযোগী একটি কুটীর দান করেন।

এতৎব্যতীত তিনি অর্জিত অর্থের বিপুল অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেন।

বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান বৌদ্ধ 'জাতক।' তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পিতার নামে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে, তাঁর কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করেন। প্রতীচ্যভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদকল্পে 'ঈশান বৃত্তি' প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষক সমাজের উন্নতি ও জনকল্যাণ বিধায়ক বহুবিধ হিতকর্মের জন্য আচার্য ঈশানচন্দ্র সমকালীন দেশ-গৌরব নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন সভার সাধারণ নির্বাচনে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রে প্রতিনিধি পদপ্রার্থী ছিলেন। এই নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সমর্থিত, স্যার নীলরতন সরকার এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সমর্থিত বিজয়কৃষ্ণ বসু। কিন্তু স্যার নীলরতনের অনুরোধক্রমে ঈশানচন্দ্র নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর এই নীরব দেশ হিতৈষণা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সুগভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে সুভাষচন্দ্র সুদূর ভিয়েনা থেকে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে লেখেন—"তিনি বিদ্বান, চরিত্রবান ও সকল দিক দিয়া যোগ্যপুরুষ ছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার সমাজ হিতৈষণা সকলের গৌরবের বিষয় ছিল। তাই তাঁহাকে হারাইয়া আমরা সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।"

আচার্য ঈশানচন্দ্র ঘোষ সেকালের শিক্ষক সমাজে যে আদর্শ ও জীবনমন্ত্রের বাণী প্রচার করেছিলেন, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব জাতিকে নানাভাবে চরিতার্থ করেছিল। জ্ঞানে-পাণ্ডিত্যে-দানশীলতায়-দেশহিতৈষণায়-সারল্যে তিনি ছিলেন

কীর্তিমান প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালী। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে (২৮, অক্টোবর) ৭৭ বৎসর বয়সে আচার্য ঈশানচন্দ্র লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র বাঙলাদেশ শোকমগ্ন হয়। কোলকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে "এলবার্ট হলে" অনুষ্ঠিত লোকসভায় সভাপতি আচার্য যদুনাথ সরকার উত্থাপিত প্রস্তাবটি বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য।

"কলিকাতা নগরীর অধিবাসীবৃন্দের এই সভা বাণীর সুসন্তান, দানবীর, শিক্ষক সমাজের গৌরবস্থল, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ আচার্য ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভার মতে, তাঁহার মৃত্যুতে শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। তাঁহার চরিত্র হইতে নিয়ম-নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলানুরাগের আদর্শ আমাদের অনুকরণীয়। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদিগের সহিত তিনি একান্তভাবে মিশিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এই দিক দিয়া দেখিলে তিনি একজন বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার কীর্তি তাঁহাকে বাঙালীর মনে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। ছাত্রদের কর্তব্য, তাঁহার জীবনপথ ও তাঁহার আদর্শ সর্বান্তঃকরণে অনুকরণ করা" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৪২)।

বাস্তবিকই বর্তমান শিক্ষাসংস্কৃতির এই নৈরাজ্যের যুগে ঈশানচন্দ্রের পূত জীবনকথা পুনঃপুনঃ পঠিত ও পর্যালোচিত হওয়া প্রয়োজন। ঈশানচন্দ্রের মত আদর্শ শিক্ষকবৃন্দই এই লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে নূতন পথের সন্ধান দিতে পারেন। নব যুগের বাঙলাদেশ রচনায় ঈশানচন্দ্র একজন বড় স্থপতি ছিলেন। কিন্তু সেই ঈশানচন্দ্র আজ বিস্মৃতির অতলে। তাঁর সারস্বত কীর্তি magnum opus 'জাতক' অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বৌদ্ধ সাহিত্যের এই অমূল্য তথ্য আকর গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণের দ্বারা ঈশানচন্দ্রের স্মৃতির কথঞ্চিৎ রক্ষিত হতে পারে।*

---

* ঈশানচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠপুত্র অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র ঘোষ ঈশানচন্দ্রের জীবনী বিষয়ক তথ্যাদি দিয়ে আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন এজন্য তাঁর কাছে বর্তমান লেখক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

রসময় মিত্র

১৯১৬ সালের ১৩ই নভেম্বর। সন্ধ্যা সমাগত। রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল প্যালেসে জম-জমাট বিদায় সম্বর্দনা সভা। সভায় উপস্থিত আছেন কোলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অধ্যক্ষ আরকুহার্ট, রায় হরিধন দত্ত বাহাদুর, ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক পি, সি ঘোষ—এমনি অগণিত গণ্যমান্য নাগরিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, ও ছাত্রসমাজের কলমুখর সভা। ভাষণও শেষ হয়ে এল। চোগা চাপকান পরা শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত দীর্ঘ সৌম্য ও সুবক্তার কণ্ঠ শেষের দিকে খানিকটা আবেগকম্পিত, ভারী ও মন্থর। তবু তাঁর কথাগুলো সকল শ্রেণীর মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ল। বক্তা বলে চললেন—"I do not know if, when I die, my spirit will not hover round the historic hall and precincts of the Hindu School, watching the boys in their games as well as in their studies, but of one thing I am certain, that when this earthly frame of mine burns on the cremation ground, two words written in bold letters will be found next to my heart. I dare say, boys, you can very well guess the words I mean They are the name of your venerabel institution, Hindu School, hoary with the noble tradition of a hundred years" এই ভাষণ হিন্দু স্কুলের প্রখ্যাতনামা হেডমাষ্টার রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের। হিন্দু স্কুলে রসময় মিত্রের এই শেষ দিন। একটানা দীর্ঘ ষোল বৎসর হেডমাষ্টারের গুরু দায়িত্ব পালন করে, তিনি চোরবাগানের 'রসময় আশ্রমে' ফিরে যাচ্ছেন। জুড়িগাড়ি করে চলেছেন। পথের দু'ধারে লোক। মাষ্টার মশায়ের গুণগানে ও প্রশংসায় শতমুখ, পথের দুধারের মানুষ। জুড়ি গাড়ির ঘোড়া খুলে দেওয়া হোলে অভিজাত বংশের চারজন ছাত্র টেনে নিয়ে চলল বাঙলাদেশের এক বরেণ্য প্রধান শিক্ষককে। যে সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন ইতিহাসে তার নজির নেই। বাঙলাদেশের একজন শিক্ষকের জীবনে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আর কিছুদিন পরেই হিন্দু স্কুলের শতবর্ষের প্রায় পরিসমাপ্তি—নবযুগের বাঙলাদেশের শিক্ষা সাধনার দ্বিতীয় শতকের জয়যাত্রা।

রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, গতযুগের বাঙলাদেশের শিক্ষক সমাজের একটি স্মরণীয় নাম। রসময় সেযুগের এক কিংবদন্তী, একটা বিস্ময়। দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের একটানা শিক্ষক জীবনে তিনি বাঙালীর তরুণ চিত্তে মহাজীবনের যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। হিন্দু স্কুল থেকেই মূলতঃ এদেশে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার। এ বিষয়ে হিন্দু স্কুলের একটা সুদৃঢ় ঐতিহ্য আছে। বছরের পর বছর ধরে সেই ঐতিহ্যের বনিয়াদ রচিত হয়েছে। হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষকের পরিশ্রমের ফল সেই ঐতিহ্য। হিন্দু স্কুলের সেই গৌরবদীপ্ত ইতিহাসে রসময় মিত্র নিজেই একটা ইতিহাস—কিন্তু রসময় শুধু হিন্দু স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। এর বাহিরেও ছিল তাঁর জগত। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী।

ঊনিশ শতকের বাঙলাদেশে তখন নবযুগের প্রলয় কল্লোল। নবজীবনের প্লাবনী ধারায় বহুশতাব্দীর জীর্ণ সমাজদেহ সমূলে উৎপাটিত হতে চলেছিল। বাঙলাদেশের দিকে দিকে তখন নবযুগের মশাল জ্বলছে। সেই রাগরক্ত উত্তপ্ত বাঙলাদেশের গগনতলে বহু মনস্বী বাঙালী দেখা দিলেন। তাঁদের মধ্যে রসময় মিত্র এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৮৫৯ সালে রসময় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান বর্দমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার অধীন 'চানক' গ্রাম। চানক গণ্ডগ্রাম। গ্রামের নানা ঐতিহ্য ছিল। পাঠশালা ছিল দু'তিনটি। এখানকার পাঠশালার একমাত্র পাঠ্যপুস্তক ছিল 'শিশুবোধক' এবং বটতলার অসংস্কৃত-সংস্কৃত এবং বাঙলা পদ্যানুবাদে রচিত "চাণক্য শ্লোক'। চানক গ্রামে বহুল পরিমাণ সংস্কৃতের চর্চা ছিল। গ্রামে ছিল গোটা চারেক টোল। শচীনন্দন বিদ্যালঙ্কার ছিলেন গ্রামের অলঙ্কার। এই শচীনন্দনের 'উজ্জ্বল নীলমণির' পদ্যানুবাদ এবং মথুরা নাথের 'বৃন্দাবন চন্দ্রোদয়' মূলত এই গ্রামেরই সম্পদ। এই উভয় লেখকই ছিলেন চানক গ্রামের অধিবাসী। সঙ্গীতবাদ্যের চর্চা ছিল চানক গ্রামে। এখানে ছিল অনেকগুলো করে যাত্রা কীর্তন ও পাঁচালীর দল। 'বৈঠকা' গানেরও বহুল প্রচলন ছিল। চানক পল্লীর এই সব গ্রামীন সংস্কৃতি রসময়ের চরিত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী জীবনে কীর্তন ও বৈষ্ণব পদ সঙ্গীতে রসময়ের দেশব্যাপী খ্যাতির মূলে ছিল অজয় উপত্যকার এই সঙ্গীত মুখর পল্লী চানক।

নবদ্বীপচন্দ্র রসময়ের পিতা, মাতা মাখনমণি। পিতা চকদিঘির সুবিখ্যাত সিংহরায় জমিদারদিগের সংসারে নায়েবী করতেন। নবদ্বীপচন্দ্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি,

নির্ভীক, সরলচেতা স্পষ্টবাদী এবং ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। এই অঞ্চলে নবদ্বীপচন্দ্র একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। ১২৭০ সালের পৌষ মাসে নবদ্বীপচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তখন রসময়ের বয়স পাঁচ বছর দু'মাস। রসময়ের মাতা মাখনমণিও ছিলেন নিরুপম-চরিত্রা। রসময় নিজেই বলেছেন—"তাহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ও মেধা ছিল।" রাস পঞ্চাধ্যায় ও কমলাকান্ত দত্ত কৃত উহার বাঙলা পদ্যানুবাদ এবং 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' প্রভৃতি আমার মাতার কণ্ঠস্থ ছিল (কৃপাদৃষ্টি-পৃঃ ৪০) চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রসময়ের মাতৃদেবীও ইহলোক ত্যাগ করেন। বাস্তবিকই অতি অল্পবয়সে রসময় পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়েন। কনিষ্ঠ পিতৃব্য বিনোদচন্দ্র মিত্র রসময়ের সর্ববিধ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর যত্নে রসময় কোনদিন পিতার অভাব অনুভব করেননি। পিতৃব্য বিনোদচন্দ্র মিত্রের কাছে রসময়ের ঋণ অপরিশোধ্য।

পাচ বছর বয়সে রসময়ের হাতে খড়ি। কয়েকদিন লেখাপড়ার পরই রসময়কে পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। বামবগলে তালপাতায় তাড়ি এবং দক্ষিণ হস্তে দোয়াত কলম নিয়ে রসময় পাঠশালায় যেতে শুরু করেন। পাঠশালা রসময়ের মন হরণ করেনি। দু'বছর গুরু মশায়ের পাঠশালায় পড়াশুনা চলল। এই সময়ে গ্রামে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে দু'তিন বছর অধ্যয়ন কালে রসময় 'আখ্যান মঞ্জরী' ও 'চরিতাবলী' প্রভৃতি পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত হন। এর পরেই রসময় চানকের সন্নিকটবর্তী 'বৈরাগীতলা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে' প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ নন্দী মহাশয়ের নিকট রসময়ের ঋণ অপরিসীম। বৈরাগী-তলা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে বসময় যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃ-জামাতা কাটোয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। তিনি রসময়ের বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিভার লক্ষণ উপলব্ধি করে, তাঁকে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করার নির্দেশ দান করেন। দারিদ্র্যকে অঙ্গীকার করেও রসময়ের মাতা ও পিতৃব্য রসময়কে সিউড়ি জিলা স্কুলে ভর্তি করতে সম্মত হলেন। ইতিমধ্যে চানক গ্রামের নিকটবর্তী গণপুর মধ্য বাঙলা বিদ্যালয়ে রসময়কে কিছুদিনের জন্য অধ্যয়ন করতে হোল। তখন বীরভূম জিলা স্কুলে প্রথিতযশাঃ শিবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিবচন্দ্রের ন্যায় চরিত্রবান, কর্তব্যপরায়ণ ও ছাত্র হিতৈষী শিক্ষক সেকালেও প্রায় দুর্লভ ছিল। কিন্তু রসময় স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন

না। দীর্ঘকাল ধরে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের আশা বিলীন হতে চললো। অগত্যা তিনি সিউড়ী বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে মনস্থ করলেন। বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেদারনাথ ভট্টাচার্য গণিতে ও সাহিত্যে পারদর্শী শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে সিউড়ীতে তিনি একজন পাদ্রীর সহিত পরিচিত হলেন। পাদ্রীর দেশান্তরে গমন করার সময় "সম্বন্ধনিরূপণ" (খৃষ্টধর্ম সমর্থক) লোহারাম শিরোরত্নের 'বাংলা ব্যাকরণ', 'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগ, যদুগোপালের 'পদ্যপাঠ' তৃতীয় ভাগ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রসময়কে উপহার দিয়ে যান; রসময়ের ছাত্রজীবনে এ এক পরম লাভ। রসময় বঙ্গবিদ্যালয়ে শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে বিবেচিত হ'লেন। বঙ্গবিদ্যালয় থেকে 'ছাত্রবৃত্তি' পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে বৃত্তিপ্রাপ্ত হলেন। ইংরেজী স্কুলে পড়বার পথ আবার উন্মুক্ত হোল। চার বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করলেন। রসময় এবাব পুনরায় সিউড়ী জিলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এই বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন আজীবন রসময়ের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সিউড়ী জিলা স্কুলে অধ্যয়ন কালে তাঁর বিবাহকর্ম সুসম্পন্ন হয়। তারিখ ১২৮২ সালের মাঘ মাস। জিলা স্কুলে রসময় মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হলেন—প্রতি বৎসরই পারিতোষিক লাভ করতে লাগলেন। সিউড়ী জিলা স্কুলে অধ্যয়নকালে বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক সাহিত্যসেবী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই স্কুল পরিদর্শনকালে রসময় মিত্র সম্পর্কে লিখেছিলেন "Half a dozen of boys can write English well, of whom Rasamay can write English most correctly. এনট্রান্স পরীক্ষার ঠিক প্রাক্কালে রসময়ের মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতৃভক্ত রসময়ের জীবনে নেমে আসে গাঢ় তমিস্রা। তথাপি এনট্রান্স পরীক্ষায় বর্ধমান ডিভিশনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ১৫ টাকার বৃত্তিলাভ করেন। এনট্রান্স পাশের কাল ১৮৭৭ সাল। বন্ধু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এই পরীক্ষায় ১০ টাকার বৃত্তি লাভ করেন। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবচন্দ্র সোম মহাশয় রসময়ের প্রশংসাপত্রে লিখেছিলেন—"The Progress he has made reflects great crediton himself."

এবারে রসময়ের কলেজ জীবন। এডুকেশন্ গেজেটে রসময় বৃত্তিলাভের সংবাদ অবগত হন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট

হলেন। দরিদ্রতা নিবন্ধন রসময় কোলকাতা প্রেসিডেন্সীতে প্রবেশ করতে পারলেন না। হুগলী কলেজেই অগত্যা ভর্তি হতে হোল। এফ, এ, পরীক্ষায় বিভাগীয় বৃত্তিলাভের অধিকতর সম্ভাবনা বিবেচনায় তিনি ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত হুগলী কলেজকেই অধ্যয়নক্ষেত্র নির্বাচন করেন। তখন হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ডবলিউ গ্রীফিথস্ সাহেব। তিনি ছাত্র-হিতৈষী ও মহানুভব শিক্ষাব্রতীরূপে অশেষ শ্রদ্ধা ও খ্যাতি অর্জন করেন। রসময়ের ভবিষ্যৎ জীবনের দিক নির্ণয়ে গ্রীফিথস্ সাহেবের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কিন্তু মাতৃবিয়োগ জনিত শোক, অর্থাভাব এবং ক্রমাগত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রসময় পড়াশুনায় তেমন মনোযোগী হতে পারলেন না। তথাপি অধ্যক্ষ গ্রীফিথস্ সাহেবের আনুকূল্য ও উৎসাহে তিনি এফ, এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল পেলেন না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু এ বৎসর কোন ছাত্রই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, সেজন্য দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও রসময় ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করলেন। হুগলী কলেজের ছাত্রজীবনে অধ্যক্ষ গ্রীফিথস, অধ্যাপক জনম্যান, রেভাঃ লালবিহারী দে এবং অবিনাশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ কৃতবিদ্য অধ্যাপকবৃন্দের পদতলে বসে তিনি পাঠ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এঁদের কাছেই রসময় জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন জগতের সন্ধান পান।

নানা কারণে, বহু বিলম্বে তিনি বি, এ ক্লাসে যোগদান করেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের অফিসে ৩০ টাকা বেতনের একটা চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। সে সময়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কমিশনারের পার্শোনাল এ্যাসিসট্যান্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালদাস চট্টোপাধ্যায় রসময়ের সহাধ্যায়ী ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রসময়ের বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁকে অতিশয় তিরস্কার করেন এবং চাকুরীর আশা ত্যাগ করতে উপদেশ দেন। যাহোক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় তিনি হুগলী কলেজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেন। হুগলী কলেজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তিনি মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। মাসিক ২৫ টাকার এই বৃত্তি উচ্চ শিক্ষায় আরও প্রেরণা দিল। বি, এ, পরীক্ষায় রসময় গণিতে কলেজের মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেন, এজন্য Thwaytes Gold Medalও তাঁর অধিকারে আসে। অধ্যক্ষ গ্রীফিথস্ সাহেবের ইচ্ছা ছিল রসময় গণিতে এম, এ

পড়বেন। কিন্তু এ সময়ে সংসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য তাঁর নিতান্ত কর্তব্য হয়ে পড়েছিল। গণিতে এম, এ অধ্যয়ন করলে নিজের পড়াশুনা ব্যতীত তিনি কিছু মাত্র সময় পাবেন না। অথচ ছাত্র পড়িয়ে অর্থ উপার্জন তাঁকে করতেই হবে। এজন্য রসময় ইংরেজীতে এম, এ, দেওয়ার অভিপ্রায় করলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক জন ম্যান তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে এম, এ পরীক্ষায় রসময় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করলেন। এখানেই রসময়ের ছাত্র জীবনের পরিসমাপ্তি।

পাঠ্যাবস্থাতেই রসময় আইন ব্যবসায়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সময় তিনি মোক্তারি পরীক্ষার কথা মনে করেছিলেন। এনট্রান্সের সময় আইন পরীক্ষা দিয়ে মুন্সেফী আদালতে আইন ব্যবসার কথা ভেবেছিলেন। বি, এ পাশের পর বি, এল, পরীক্ষা দিয়ে জজ আদালতে ওকালতীর আশা করেছিলেন। এমন কি, বি, এ ও এম, এ পাঠের সময় তিনি কিছুকাল আইন অধ্যয়নও করেন। কিন্তু তাঁর এই সজ্ঞান চিন্তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। অলক্ষ্য থেকে ঈশ্বর তাঁকে নবযুগের বাঙলাদেশের একজন বরেণ্য শিক্ষকরূপে তাঁর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিলেন। গ্রীফিথ্‌স্‌ সাহেবের উপদেশে তিনি ব্যবহার-জীবি হওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। অথচ অর্থোপার্জন একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষা-বিভাগের একটি চাকুরীর জন্য তিনি তাঁর বিদেশী অভিভাবক ও হিতৈষী গ্রীফিথস্‌ সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। তিনি কোন স্কুলের হেড মাষ্টার বা কোন কলেজের লেকচারারশিপের জন্য সুপারিশ করে তদানীন্তন শিক্ষাধিকারে বেলেট্ সাহেবের নিকট পত্র দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শূন্যপদের সন্ধান মিললো না। উত্তরপাড়া জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে শুনে, তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ পদে একজন তৃতীয় শ্রেণীর গণিতের এম-এ-র নিয়োগ নিশ্চিত হয়ে যায়। সে সময় নবপ্রতিষ্ঠিত মেদিনীপুর টাউন স্কুলে ১০ টাকা বেতন একজন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল। এই মেদিনীপুর টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে রসময়ের কর্ম-জীবনের সূচনা।

উনিশ শতকের শেষলগ্ন। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রসময় মিত্র। অনায়াসে অর্থকরী সরকারী কাজ জুটিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষক জীবনকেই তিনি বরণ করে নিলেন। অধ্যক্ষ গ্রাফিথ্‌স্‌ সাহেবের কাছে ওকালতীকে তিনি অবজ্ঞা করতে শিখেছিলেন। শিক্ষক জীবনের মধ্যে তিনি

Plain living and high thinking' এর মন্ত্র খুঁজে পেলেন। আজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখ জর্জরিত রসময় মিত্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর টাউন স্কুলে ১০০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন। মানুষ তৈরীর মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলেন রসময়। কিন্তু মেদিনীপুর টাউন স্কুলে এক মাসের অনধিককাল ছিলেন। এ সময়ে মহামান্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশে ৫০ টাকা বেতনে হুগলী নর্মাল স্কুলে গণিত শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন। বেতন কম হলেও হুগলী তাঁর পুরাতন স্থান। তাছাড়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও গ্রাফিথ্‌স্‌ সাহেবের সাহচর্যকে তিনি অতিশয় মূল্যবান মনে করলেন। বাঙলার নর্মাল স্কুলগুলি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্ষয় কীর্তি। হুগলী নর্মাল স্কুলে তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধীমান্ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি সে সময়ে হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

হুগলী নর্মাল স্কুলে পাচ ছ' মাস কাজ করার পর রসময় "আরা জিলা স্কুলে" ৬ষ্ঠ গ্রেডে অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। সে সময় হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন 'আরা জিলা স্কুলেব' দ্বিতীয় শিক্ষক। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গণিতে এম-এ হলেও বহু বিষয়েই পণ্ডিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন নৈহাটীর নিকটবর্তী মাদরাল গ্রামের বাসিন্দা। ইনি পরে হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলের হেডমাষ্টার পদে বৃত হন। আরা জিলা স্কুলে থাকাকালীন তাঁকে রোগ-শোক এবং কন্যার মৃত্যুজনিত বিপর্যয়েব সম্মুখীন হতে হয়। সেজন্য তিনি 'আরা জিলা স্কুল' থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। সেই সময় বীরভূম জিলা স্কুলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক শিবচন্দ্র সোম মহাশয় হুগলী জিলা স্কুলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক। হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল। এই পদে যোগদানের ব্যাপারে তিনি শুভানুধ্যায়ী অধ্যক্ষ গ্রীফিথ্‌স্‌ সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। সাহেব তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ। মুখ্যতঃ গ্রীফিথ্‌স্‌ সাহেব ও শিক্ষাগুরু শিবচন্দ্র সোম প্রভৃতির প্রচেষ্টায় রসময় হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলে বদলি হয়ে এলেন। হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলে রসময় আনন্দের সঙ্গে কাজ করে চললেন। তাঁর আগমনের পর থেকে স্কুলের নানা বিষয়ে উন্নতি হতে লাগল। এই সময়ে রসময়ের জীবনে নেমে এল দুর্দিনের কালো মেঘ। তার প্রথমা কন্যা মাত্র ন' বছর বয়সে বৈধব্য বরণ করে। অকালে লোকান্তরিত হয় পিতৃব্য পুত্র এবং অবশেষে পিতৃব্যদেব। রসময়ের কাছে জীবন ও জগৎ বিষময় মনে হল। কিন্তু মহৎ চরিত্র কখনই দুঃখের কাল সাগরে

বিলীন হয়ে যায় না। সম্মুখের বাধা বিপত্তি অঙ্গীকার করেই তাঁরা নব দিগন্ত সন্ধানের পথিক। আজীবন ভগবদ্ভক্ত রসময়ের সুপ্ত বৈষ্ণব চেতনা এই সময়েই প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। তাঁর দেশ, সমাজ ও বংশে বৈষ্ণবতার প্রবাহ ছিল। 'রসময়' নামটিই বৈষ্ণবসুলভ। রসময় জীবনের এই ঘোর দুর্দিনে সেই মহৎ বৈষ্ণব বচন 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা' সেটি স্মরণ করলেন। হুগলী থেকেই কমলাকান্ত দত্তের 'রাস-রস-কণিকা' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলে রসময় শিক্ষক হিসেবে তাঁর পারদর্শিতাকে পরিস্ফুট করে তুললেন। নন্দলাল কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর অনুপস্থিতি-কালে এক বৎসর রসময় ৮৮ জন ছাত্রকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনীত করেন—সে বৎসর বিদ্যালয়ের চরম সাফল্যে গ্রীফিথ্‌স্ সাহেব অতিশয় প্রীত হন। হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলে যখন শিক্ষক হিসেবে তাঁর যশোরাশি সদ্যবিকশিত প্রায়—সে সময় তিনি হুগলী কলেজেও কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনা করেন। অধ্যক্ষ মৌয়াট সাহেব রসময়ের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কলেজের লেকচারার পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আর একবারও গ্রীফিথস্ সাহেব তাঁকে কলেজের অধ্যাপনা কাজে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন্দলাল দাস মহাশয় বিদ্যালয়ে অপরিহার্য বিবেচনায়, তাঁর ছাড়পত্র মঞ্জুর করেননি। হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলে তিনি ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলেই তাঁর শিক্ষকখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। K. Zacharia তাঁর History of Hoogly College গ্রন্থে লেখেন "Till 1895, the school had the advantage of an excellent Second master, Rasamay Mitra, after wards Rai Bahadur and Head master of the Hare and Hindu School." (page. 107)

১৮৯৫ সালের শেষ দিকে অধ্যক্ষ গ্রীফিথস্ সাহেবের আহ্বানে তিনি কোলকাতা হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক পদে যোগ দেন। গ্রীফিথস্ সাহেব তখন প্রেসিডেন্সীর অধ্যক্ষ। রসময় হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। সে সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু শিক্ষাগুরু গ্রীফিথস্ সাহেবের উপদেশকে তিনি অবহেলা করতে পারেননি। কারণ গ্রাফিথস্ সাহেব রসময়ের ছাত্র ও শিক্ষকজীবনে যাবতীয় উন্নতির কারণ। হেয়ার স্কুলে যোগদানের অল্প দিন পরেই হেডমাষ্টার অক্ষয়কুমার লোকান্তরিত হন। সে সময়ে বিদ্যালয়ের অবস্থা অবনতির পথে।

গ্রীফিথস্ সাহেব চলে গেলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হলেন পেডলার সাহেব। আরও পরে রো, গিলিল্যাণ্ড, বুথ, এডওয়ার্ডস্ প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফটের স্থলাভিষিক্ত হলেন মার্টিন সাহেব। মুখ্যতঃ গ্রীফিথস্, পেডলার ও ক্রফট প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিদগণের প্রচেষ্টায় রসময় হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন। হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি 'প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস' লাভ করেন। রসময় তাঁর নবীন উদ্যম ও অদম্য উৎসাহ নিয়ে হেয়ার স্কুলের উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করেন। রসময়ের পারদর্শিতা লক্ষ্য করে শিক্ষা বিভাগ মন্তব্য করে লিখলেন "The steady progress of the Hare School under the present Headmaster is highly satisfactory." রসময়ের জীবনে 'হেয়ার স্কুল' সরকারী বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টারীর প্রথম পরীক্ষাস্থল। রসময় হেয়ার স্কুলে পাঁচ বৎসর ছিলেন।

আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের অবদান ও ঐতিহ্য গৌরবময়। উনিশ শতকের গোধূলিলগ্নে ঐতিহ্যপুষ্ট এই দুই বিদ্যানিকেতন প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছিল। রসময়ের পরিচালন দক্ষতা ও শিক্ষা নৈপুণ্যে হেয়ার স্কুল অচিরে নবজীবন লাভ করল। শিক্ষক হিসেবে রসময়ের দক্ষতা অচিরে শিক্ষা-বিভাগের গোচরীভূত হল। হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক হিসেবে তাঁর পারদর্শিতার কথা প্রচারিত হয়েছিল। এই সময় হিন্দু স্কুলের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে গভর্ণর স্যার চার্লস্ এলিয়ট বিদ্যালয় উঠিয়ে দেওয়ার জন্য সার্কুলার জারি করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এইরূপ প্রস্তাবকে অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের যুক্তিপূর্ণ তীব্র আবেদনের ফলে বড়লাট এই বিদ্যালয় বন্ধ করবার প্রস্তাব রহিত করে দেন। এই সংকটজনক সময়ে ডিরেক্টর স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার রসময়কে হিন্দু স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত করলেন। এ ১৯১৯ সালের কথা। অতঃপর হিন্দু স্কুলের হেডমাষ্টার হিসেবেই রসময় বাঙলা-দেশের শিক্ষাজগতে অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেন। হিন্দু স্কুলেই তাঁর অবশিষ্ট কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। রসময় পতনোন্মুখ হিন্দু স্কুলকে গৌরবের চরম শিখরে উন্নীত করেন। বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতির ব্যাপারে সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ তাঁর সহযোগী হলেন। বিশেষ করে, অভয়চরণ পাল, রামযদু ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত কেদার-নাথ ঘোষ, সুবলচন্দ্র দাস, কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত,

ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামানুজ বিদ্যার্ণব এবং পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ হিন্দু স্কুলের উন্নতিবিধানে রসময়কে নানাভাবে সাহায্য করলেন। রসময়ের অক্লান্ত চেষ্টায় স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হ'ল। ছাত্র-সংখ্যা বাড়ল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়, নাটক অভিনয়ে, আবৃত্তিতে, দেশহিতকর কাজে, সর্বত্রই হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের নাম তালিকার পুরোভাগে দেখা গেল। প্রতিবৎসরেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জুনিয়র স্কলারশিপ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে চলল। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে নিয়মানুবর্তিতা, শিষ্টাচার, বিনয়, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি উল্লেখ-যোগ্যভাবে দেখা দিল। হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ শিষ্টাচার ও শৃঙ্খলা দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ জেমস্ লিখেছিলেন "It is always a pleasure to come to the Hindu School." মৃতপ্রায় বিদ্যালয়টি রসময়ের পরিচালন নৈপুণ্যে অচিরে যেন মন্ত্রশক্তি স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়টি বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসলো। বাঙলা সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, লায়ন সে সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে লিখেছিলেন—"Rai Rasamay Mitra Bahadur by devoted service and high character saved the school from what might have been a disaster and raised it again to the high place it now holds in the judgment of the people."

শিক্ষাজগতে হিন্দু স্কুলের গৌরবের দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮২ এই পাঁচ বছরে এই স্কুলের ছেলেরা পর পর পাঁচবার এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করে। এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো, ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৫ সালে। চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র দত্ত ও ক্ষিতিশচন্দ্র সেন, পালা করে এই তিন বছর এনট্রান্সে প্রথম স্থান দখল করেন। তখন স্কুলের হেডমাষ্টার রসময় মিত্র। রসময় ছিলেন নিপুণ সংগঠক এবং আদর্শ শিক্ষক। নিজের চারিত্রিক সততা তিনি ছাত্র ও সহকর্মীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। হিন্দু স্কুলের শিক্ষকজীবনে রসময় অন্যূন আট বৎসর কাল "সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির" সভ্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। পেডলার ও আর্ল সাহেবের সময় শিক্ষা সংস্কার মূলক যে কমিটি গঠিত হয়, রসময় সেই কমিটিতেও সদস্যপদ লাভ করেন। স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ম্যাট্রিকের পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

উপচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এ বিষয়ে রসময়কে আনুকূল্য করেন। শিক্ষা-বিভাগে রসময়ের নিরলস সাধনাকে তদানীন্তন সরকার সমাদৃত করলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হলেন। সামান্য শিক্ষকের পক্ষে এই সম্মানলাভ বোধহয় রসময়ের ক্ষেত্রেই প্রথম। তাঁর এই সম্মানলাভে ভাষাচার্য হরিনাথ দে মহাশয় লিখলেন—"Permit me to congratulate you in your new honours and may you live long to enjoy even higher ones, etc."

রসময়ের অগণিত ছাত্র বাঙলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি—প্রায় সর্বক্ষেত্রে সেকালের বাঙলাদেশে এবং একালেও ইতিহাস সৃষ্টি করেছে—আজও তার শিক্ষা নির্বাপিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর কতিপয় কৃতী ছাত্রের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মহীশূরের দেওয়ান জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, বিচারপতি কমলচন্দ্র চন্দ্র, বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী, ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার, ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জী, ডাঃ নীলরতন সেনগুপ্ত, ডাঃ গণপতি পাঞ্জা, কবিরাজ শিবনাথ সেন, তুষারকান্তি ঘোষ, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, দেবপ্রসাদ খৈতান, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বী বাঙালী রসময়ের শিক্ষকজীবনের গৌরব। এইরূপ বিপুল সংখ্যক কৃতী ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ বাঙলাদেশের আর কোন শিক্ষকের জীবনে সম্ভব হয়েছে কিনা আমাদের সঠিক জানা নেই। ১৯১৬ সালের ১০ই জানুয়ারী হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব একই সম্মিলিত সভায় অনুষ্ঠিত হয়। উভয় বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রসময় সভাপতি লর্ড কারমাইকেলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর আচার্য রসময় হিন্দু স্কুলে একাদিক্রমে সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর অবসর গ্রহণের সময় স্যার গুরুদাস বলেছিলেন "A brilliant termination of a brilliant career." অবসর গ্রহণের পর রসময় ১৫ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কাটোয়ায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে রসময় ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল নবযুগের বরেণ্য শিক্ষক রসময় মিত্র ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সংবাদপত্রগুলিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। বাঙলার শিক্ষক সমাজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রসময় খাঁটি শিক্ষক। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট শিক্ষক হওয়া যায় না। রসময় বহু শাস্ত্র-বিশারদ হয়েও ছাত্রসমাজের মধ্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশে তাঁর অনীহা ছিল। শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে ছাত্রহৃদয় জয় করা যায় না—প্রয়োজন স্নেহময় হৃদয়। রসময় তাঁর অবারিত হৃদয় দাক্ষিণ্য দিয়ে শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজের হৃদয় জয় করেছিলেন। ছাত্র সমাজের সঙ্গে হৃদয়গত আত্মাগত যোগ না থাকলে শিক্ষকের কোন শিক্ষণই ছাত্র হৃদয়ে মুদ্রিত হয় না, ছাত্রহৃদয় স্পর্শ করে না। এই ভালবাসা সেই স্পর্শমণি—যার পরশে ছাত্রদের লৌহহৃদয়ও সোনায় পরিণত হয়। জন্ম-শিক্ষকের চরিত্রে ভালবাসার এই অফুরন্ত নির্ঝরধারা চির প্রবহমান। এই সব শিক্ষকের কাছে ছাত্রসমাজই তাঁদের স্বপ্নের জগত। কোন প্রলোভন তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে না। তাঁরা যেন জন্ম শিক্ষক হয়ে এসেছেন। সেজন্যই পাণ্ডিত্যগর্বী, হৃদয়হীন শিক্ষকের শিক্ষা প্রায়শ ফলপ্রসূ হয় না। রসময় ছিলেন এই রকম হৃদয়বান, স্নেহপ্রবণ এবং তীক্ষ্ণধী আদর্শ শিক্ষক।

রসময় আজীবন ছাত্রদের জন্য ভেবেছেন। য়ুরোপীয় ও দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিষ্ণাত হয়েও তিনি কোন উল্লেখ্য সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয় রাখেননি। এসব ক্ষেত্রে তাঁর ভাববার সময় ছিল না। মানুষ তৈরীর সাধনাতেই তিনি মগ্ন। সেজন্য তিনি যা কিছু লিখেছেন সেই ছাত্রসমাজের শুভাশুভ বিবেচনা করে। সেকালের বাঙলাদেশের ইংরেজী ও বাঙলা ভাষা শিক্ষার জন্য রসময় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'বাঙলাদেশের শিক্ষা জগতে রসময়ের এই সব ছাত্রপাঠ্য পুস্তকগুলি প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী ব্যাপী অপরিহার্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত ছিল। তাঁর রচিত মৌলিকগ্রন্থ ও কিছু কিছু নিবন্ধাদির কথাও শোনা যায়। তাঁর রচিত সব পুস্তক-পুস্তিকার খবর হয়ত সঠিক দেওয়া যাবে না। তবুও তাঁর রচিত কয়েকখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করছি :—

(১) Matriculation Translation
(২) Matriculation English Grammar and Composition
(৩) Matriculation Bengali Composition
(৪) Notes on Entrance English
(৫) English unseens
(৬) Pearl Reader
(৭) কৃপাবৃষ্টি (আত্মজীবনী-১৩২৫)
(৮) রাস-রস কণিকা (কমলাকান্ত দত্ত কৃত সম্পাদিত গ্রন্থ ১৩০২)

বাঁশবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত, 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে তিনি

প্রায়শঃ লিখতেন। তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কৃপাবৃষ্টি, গ্রন্থখানি বাঙলা আত্মজীবনী মূলক সাহিত্যে অতুলনীয়। এই গ্রন্থখানি বাঙলা গদ্য শিল্পের সার্থক নিদর্শন। তিনি গতযুগের বাঙলাদেশের স্নিগ্ধ মনোগ্রাহী বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে। রসময় সাহিত্যসেবায় মনোযোগী হলে সাহিত্যকেও শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে পারতেন। 'কৃপাবৃষ্টি'তে এই সত্যের নিদর্শন বিদ্যমান।

রসময়ের শিক্ষক জীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় উপস্থিত করা গেল। অতিশয় দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে আপন প্রতিভাবলে নবযুগের বাঙলাদেশে তিনি স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মহিমা অর্জন করেন। শিক্ষা সদাচার এবং সন্তোষই ছিল তাঁর চরিত্র গৌরবের মূল। শিক্ষক হিসাবে তাঁর মহত্বের দিকটি সুবিদিত। এই সূত্রে তাঁর চরিত্রের আর একটি গৌরবের দিক উল্লেখ করতে হয়। রসময় ধার্মিক—রসময় পরম বৈষ্ণব। বাঙলার কীর্তন সঙ্গীতে তিনি এক কিংবদন্তী। কণ্টকনগর কাটোয়া বৈষ্ণব তীর্থভূমি। কাটোয়ার নিকটবর্তী 'চানক' তাঁর জন্মপল্লী। এই জনপদে বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গে বৈষ্ণব সংস্কৃতির স্ফূরণ ও পরিবর্দ্ধন। তাঁর পিতৃ ও মাতৃকুল বৈষ্ণব ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট। জননীর ক্রোড়ে বসে তিনি বৈষ্ণব মন্ত্র লাভ করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যে রসময়ের জননী বিদুষী ছিলেন বলা যায়। অতি তরুণ বয়স থেকেই রসময়েব মধ্যে বৈষ্ণবকারের স্ফূরণ ঘটে। পরিণত বয়সে কীর্তন সঙ্গীতে রসময় বাঙলার শিক্ষিত সমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। ইংরেজী শিক্ষালাভের ফলে তা দূরীভূত হয়নি। আত্মজীবনী 'কৃপাদৃষ্টিতে' তাঁর বৈষ্ণবানুরাগ সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বঙ্গবাসী প্রকাশিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থখানির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তিনি বহু পদসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, টাকীর জমিদাব যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, স্যাব দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেকালের গণ্যমান্য অনেকেই রসময়ের কীর্তন গান শুনে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে একটা পৃথক নিবন্ধের অবতারণা করা যেতে পারে। কীর্তন সঙ্গীত ও বৈষ্ণবতায় তিনি যে সেকালীন বাঙলাদেশে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলে' শিক্ষকতা কালে তিনি 'রাস রসকণিকা' নামে একখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় তিনি প্রায়শঃ বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে লিখতেন।* কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাহাদুর 'কীর্তনীয়া রসময় মিত্র' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি অন্যত্র লিখেছিলেন—"In his death Kirton music has lost one of its most devoted exponents. It will be possible to listen to better renderings of Kirton as a style of music, but it will be difficult to find even one who can bring home both the music and the inner meanings in the manner in which Late Rasamay Mitra Bahadur did it. His music and not merely appeal to the senses but went straight to the soul."

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর বাঙলাদেশে যে নূতন শিক্ষক সমাজের আবির্ভাব হয়—রায় রসময় মিত্র বাহাদুর সেকালের সেই শিক্ষক সমাজে একটি অবিস্মরণীয় নাম। রসময়ের তিরোধানের পর বাঙলা শিক্ষাজগতে কত গঙ্গার জল মিলে মিশে একাকার হয়েছে—কিন্তু রসময়ের শিক্ষক খ্যাতি আজও একটা দূরশ্রুত কিংবদন্তীর মত। যুগ প্রবাহে ভিত্তিমূল উৎপাটনকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত চিন্তাধারা এসে মিলিত হয়েছে—সমাজচিন্তায় ও শিক্ষা পদ্ধতিতে এসেছে কত ভাবপ্লাবন। কিন্তু মানুষ গড়ার বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকের চরিত্র গৌরব, শিক্ষকের বিদ্যা, সরলতা, ত্যাগ, স্নেহ, সহানুভূতি এই সব চিরকালীন গুণগুলির নিশ্চয়ই আজও মূল্য আছে। বাঙলাদেশের এই শিক্ষাসঙ্কটে রসময়ের মত খাঁটি শিক্ষকদের প্রয়োজন বোধ হয়। ইহা ক্ষোভের বিষয় এঁদের অনন্যব্রত শিক্ষা ও সাধনার কথা একালে প্রায়-বিস্মৃত। তবু এই নূতন বাঙলাদেশ রচনার ইতিহাসে—নবযুগের স্থপতিদের শোভাযাত্রায় রসময় মিত্রের মত শিক্ষক সমাজের অবদান নগণ্য নয়। তাঁর অন্যতম কৃতী ছাত্র ঐতিহাসিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর স্মৃতি তর্পনচ্ছলে যথার্থই লিখেছিলেন—"I still remember the enthusiasm with which he tried to make every student do his best—and this seems to be the secret of his succes. He loved his pupils and was loved by them, but he was a disciplination"

* নির্দেশপঞ্জী :

(১) কৃপাবৃষ্টি (১৩২৫)

(২) Hindu School Magazine, Rai Rasamay Mitra Bahadur Memorial Number (1931)

(৩) History of Hooghly College (1936) By K. Zachariah

(৪) Hooghly College Register (1936) by Members of the College Staff.

জগদীশ মুখোপাধ্যায়

উনিশ-শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধকাল। বাঙলায় তখন Revivalism এর যুগ। রেনেসাঁসের মর্মবাণী অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। ধর্মান্দোলন, স্বরাজ সাধনা, সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারের বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ তখন দেশ ও জাতিচিত্ত মথিত করে চলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে অর্গলরুদ্ধ বাঙালীর মানস দুয়ারে এসেছে আঘাত। দিকে দিকে জাগরণের নিশান। সুপ্তিমগ্ন বাঙালীর চিত্তজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। এই লগ্নে পূর্ববাঙলাও কালনিদ্রায় নিদ্রিত থাকেনি। বরিশাল সেই জাগরণের দিব্য বোধন কেন্দ্র।

বাঙলার নবযুগের ইতিহাস, আধুনিক বাঙালীর চিন্তাতে ও চরিত্রে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে গড়ে তোলার জন্য শতাব্দীব্যাপী একটা সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের নায়করূপেই বাঙালী বিগত শতবর্ষকাল ধরে সমগ্র ভারতবর্ষে আধুনিক চিন্তার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করে আছে। বন্ধনের অনুভূতি বেদনা থেকে স্বাধীনতার লিপ্সা স্ফুরিত হয়। গত শতকে নবশিক্ষার আহ্বানে বাঙালী চিন্তা ও হৃদয়-বিপ্লবের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিল, সেই ইতিহাসে নব্য শিক্ষিত শিক্ষক সম্প্রদায়ের অবদান নগণ্য ছিল না; সেদিন বাঙালী চরিত্রে জ্ঞান-প্রেম-মনীষার বহ্নুৎসব ঘটেছিল। মানুষ গড়ার যজ্ঞবেদীতে বাঙালী করেছিল আত্মোৎসর্গ। দুঃখের বিষয় বাঙালীর নবজাগরণের সঠিক ইতিহাস এখনও লিখিত হয়নি। এবং মানুষ গড়ার যথার্থ শিল্পী শিক্ষক-সমাজের অবদানের দিকটি নিতান্তই উপেক্ষিত আছে। গত শতকের আটের দশক থেকে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালের যে জাগরণ ঘটেছিল, তা আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। শিক্ষা-সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তায় যুগন্ধর পুরুষরূপে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তানায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শুধু বরিশাল কেন, সমগ্র দেশ ও জাতিকে তিনি এক অভিনব বাণীমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের বড় পরিচয় শিক্ষকরূপে—মানুষ গড়ার শিল্পী হিসাবে। তাঁর অমর কীর্তি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়, ব্রজমোহন কলেজ। অশ্বিনীকুমারের এই মহান আদর্শব্রত ও তাঁর সাফল্যের অবিসংবাদিত সহায়ক ও ভাবশিষ্য ছিলেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়।

আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষক বা পূর্ববাঙলার অন্যতম শিক্ষক বা পূর্ববাঙলার অন্যতম শিক্ষকরূপেই নয়,—তদানীন্তন বাঙলাদেশের শিক্ষক সমাজের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের সফল শিক্ষাপন্থার অন্যতম বার্তাবাহী। সেকালের বাঙলাদেশে ভাবনায়ক ও চিন্তানায়কের অভাব ছিল না। উনিশ-শতকীয় নবজাগৃতির উৎসমূলে ছিল জ্ঞান-প্রেমময় বঙ্গমনীষার মিছিল। অশ্বিনীকুমার ছিলেন জাতির যথার্থ লোকনায়ক। শিক্ষকের সরণী ধরেই তিনি লোকশিক্ষকের পদে উন্নীত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর শিক্ষাপ্রচারের ব্যাপারে অশ্বিনীকুমারের মত নিঃস্বার্থ শিক্ষাব্রতী এদেশে বিরল। স্কুল কলেজে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করলেই শিক্ষা শেষ হয় না। তাই, ছাত্রদের চরিত্র গঠনের জন্য বিবিধ নির্দেশ ছিল। বিভিন্ন সদানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতির যুব চরিত্র যথার্থ পথনির্দেশ পেতে পারে—এই ছিল অশ্বিনীকুমারের শিক্ষাদর্শ,—লোকশিক্ষার মন্ত্র। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল 'চরিত-চিত্র' গ্রন্থে 'অশ্বিনীকুমার' নিবন্ধে বলেছিলেন—"এই জন্যই বোধহয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন।" অধ্যাপক মিঃ কানিংহাম ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মত উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বঙ্গদেশে থাকিতে ছাত্ররা বিদ্যাশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড, কেমব্রিজে কেন যায়, আমি বুঝিতে পারি না।" ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এই গৌরবের জন্যই বরিশাল মূলত পূর্ববাঙলার আদর্শ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ববাঙলার নবজাগ্রত শিক্ষার্থী সমাজের কাছে বরিশাল পুণ্যপীঠের গৌরব লাভ করে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এই গৌরবের মূলে ছিল আচার্য জগদীশের অনন্যসাধারণ প্রয়াস ও সাধনা।

আচার্য জগদীশের জন্মস্থান বারুইখালি গ্রামে। বারুইখালি খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায়। জন্মতারিখ ১৮ই ভাদ্র, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ১৮৬১ সাল। পিতা কালীকুমার মুখোপাধ্যায়—মাতা প্যারীদেবী। জগদীশ বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান। উনিশ শতকের গ্রাম্য সামাজিক জীবনের তুলনায় তাঁর মাতৃ ও পিতৃবংশ উদার ও আধুনিক ভাবাপন্ন ছিল। পিতা, খুল্লতাত ইত্যাদি পরিবারের সকলেই ছিলেন ধর্মানুরাগী। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর অধ্যয়ন সুরু হয়। এখানে তিনি ছাত্রাবস্থায় গণিত অপেক্ষা সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। পরবর্তী

ছাত্রজীবনে গণিতে তাঁর দুর্বলতাকে অতিক্রম করেন। এই বাঙলা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তিলাভ করেন। এরপর তিনি যশোহর জিলা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি 'সদ্ভাবশকের' কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে শিক্ষক হিসেবে লাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৮৮১ সালে। এ পরীক্ষায় তিনি ১৫ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। কলেজীয় শিক্ষালাভের জন্য তিনি ঐ একই বৎসরে কোলকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ.-তে ভর্তি হলেন। তখন এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সেবক পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত। বিদ্যাসাগরের সুমহান চরিত্রাদর্শ ও কর্মোদ্দীপনা জগদীশকে অনুপ্রাণিত করলো। ১৮৮৩ সালে জগদীশ বৃত্তি নিয়ে এফ, এ, পাশ করলেন—আর ১৮৮৫ সালে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি, এ। সদ্যস্নাতক জগদীশ প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে। কোলকাতায় অবস্থান কালে, উনিশ শতকীয় ভাব আন্দোলনে তাঁর যুবচিত্ত হয়েছিল উন্মথিত। তিনি দেশ ও জাতি গঠনের মন্ত্র নিয়ে ফিরলেন। আরও উচ্চতর শিক্ষালাভের পথ খোলা ছিল—মুক্ত ছিল নানা অর্থকরী রাজকীয় কর্মের তোরণদ্বার। কিন্তু এ সমস্তকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রতিজ্ঞা নিলেন দেশ গঠনের—জাতিচরিত্র নির্মাণের। বস্তুত কোন দেশ ও জাতির প্রগতি দেশের কৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান মানুষের দ্বারাই নিরূপিত হয়। সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে ওঠে সেই দেশের বৃহত্তমসংখ্যক মানুষের কর্ম-ভাবনা-চিন্তা ও আচরণের সামগ্রিক প্রকাশে। নানা ভাবতরঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশে জগদীশ মানুষ গঠনের যথার্থ পথ খুঁজে পেলেন। শিক্ষক-জীবনকে তিনি স্বাগত জানালেন। বিজয়মাল্য এল তাঁর অনাড়ম্বর শিক্ষকজীবনের মধ্যে দিয়ে।

বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত ছাত্রজীবনেই জগদীশকে চিনতেন। অশ্বিনী-কুমার সে সময়ে বরিশালের জনপদে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছেন। স্বদেশ, সমাজ ও শিক্ষাচিন্তায় তিনি এনেছেন জাগরণ। সমগ্র পূর্ববাঙলার জনমানস তখন বরিশালের দিকে। ১৮৮৪ সালের ২৭শে জুন বরিশালের ইতিহাসে একটা লাল তারিখ। এই দিনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সদ্যস্নাতক জগদীশ আহ্বান পেলেন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার। ১৮৮৫ সালেই তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরূপে যোগ দিলেন। এখন থেকে বরিশাল হ'ল তাঁর কর্মক্ষেত্র। প্রথম দিকে অশ্বিনীকুমার নিজেই এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছেন। জগদীশ যখন এ বিদ্যালয়ে এলেন, তখন প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। এর আগে বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য কিছুদিনের জন্য প্রধান শিক্ষক

ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পর প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন ত্রৈলোক্য ভট্টাচার্য। ত্রৈলোক্যবাবুও এক বৎসর পর এ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। স্থির হয় ত্রিগুণাচরণ সেন প্রধান শিক্ষক হয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি না আসায়, জগদীশকেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত করা হয়। তদবধি তিনি আমৃত্যু এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জগদীশ যখন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে প্রবেশ করেন তখন উচ্চতর ক্লাসে ইংরেজী পড়াতেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ভাই কামিনীকুমার। কামিনীকুমার অন্য কর্মে যোগদান করায় জগদীশ উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরেজী পড়ানোর ভার নেন। তদবধি তিনি ইংরেজীর শিক্ষকরূপেই কাজ করে চলেন। বাস্তবিকই ইংরেজীতে ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। অচিরে দক্ষ ইংরেজী শিক্ষকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-সমাজতন্ত্র—সমস্ত বিষয়েই জগদীশের অসামান্য দক্ষতা। বিদ্যালয়ের কিশোর চিত্ত গঠনে তিনি তাঁর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর নায়কত্বে অচিরে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ চরিত্রধর্ম, শৃঙ্খলা-নীতিজ্ঞান-জীবনচর্চা ও জ্ঞানের গভীরতায় সমগ্র বাঙলাদেশের ছাত্রসমাজের কাছে আদর্শস্থল হয়ে পড়ে। কেবল বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পঠন-পাঠনেই নয়—পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরীর দিকে নজর রেখেই তাঁর শিক্ষাপ্রদান প্রণালী নিয়োজিত থাকতো। কেতাবী ছাত্র না হয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক একটি যথার্থ মানুষ হয়ে উঠত। সেজন্যই যশোহর-খুলনা থেকে সুদূর শ্রীহট্ট পর্যন্ত নব্যশিক্ষিত যুবকসমাজে তাঁর অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে ছাত্র এসে তাঁর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে জীবনের একটা মহত্তম অংশ অতিবাহিত করে যেত। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে জগদীশ তাঁর শিক্ষাপ্রণালীতে যুবচিত্তের এই মাদকতা এনেছিলেন। তাঁর শিষ্যরাই পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় স্বদেশীর পুরোহিত হয়েছিলেন। সাহিত্য-বিজ্ঞান-দেশসেবায় তাঁর অগণিত ছাত্রসমাজ পরবর্তী বাঙলাদেশে যুগান্তর এনেছিল।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ঘটল দিনে দিনে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে জগদীশও এই গৌরবের অংশীদার হলেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয় কালক্রমে কলেজে পরিণত হোল। অশ্বিনীকুমারের একটা বড় উদ্দেশ্য সফলতায় মণ্ডিত হোল। জগদীশ এই কলেজীয় শিক্ষার পরিমণ্ডলেও সফল শিক্ষকতার পরিচয় দিলেন। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক হিসেবেও আচার্য জগদীশ ছাত্রসমাজে গভীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। জগদীশ কোন বিশেষ

বিষয়ে পারদর্শী—এমন ছিলেন না। তিনি জ্ঞানসমুদ্রে ছিলেন হংসস্বরূপ। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী—ইংরেজী, সংস্কৃত, গণিত, ইতিহাস, জ্যোতিষ, দর্শন, তর্কবিদ্যা, উদ্ভিদ, স্বাস্থ্য, আয়ুর্বেদ—জ্ঞান-মনীষার সর্বক্ষেত্রে তাঁর ছিল অনায়াস যাতায়াত। এ সবই ছিল তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। তিনি ব্রজমোহন কলেজের বি, এ ক্লাসে গণিত ও Astronomy পড়াতেন। এ ছাড়া লজিক-সংস্কৃত-বোটানি প্রভৃতি বিষয়েও অধ্যাপনা করতেন। বি, এ ক্লাসের ছাত্রগণ তাঁদের কঠিন বইগুলোর জটিল অংশসমূহ তাঁর কাছে বুঝে নিতেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য প্রতিদিন বেলা একটার সময় গীতা ব্যাখ্যা করতেন। কেবলমাত্র স্কুল-কলেজের পরিমণ্ডলের মধ্যেই নয়, নিজ বাসভবনেও ছাত্রগণের মধ্যে তিনি শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী থাকতেন।

বিদ্যালয় ও কলেজ সীমার বাইরেও আচার্য জগদীশ একজন অত্যাশ্চর্য লোক শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। মানুষ গড়াই ছিল তাঁর ব্রত। মালিন্য সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। মানবিক ও সামাজিক সব রকমের কল্যাণমূলক কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বরিশালের সব সেবাপ্রতিষ্ঠান তাঁরই নেতৃত্বে চলত। সেকালে বরিশালের মুক্তি যজ্ঞের প্রধান পুরুষ অশ্বিনীকুমার—সে সঙ্গে অপর যে দুজনের নাম অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য—তাঁরা হচ্ছেন জগদীশ ও কালীশচন্দ্র। শেষোক্ত দু'জনেই ছিলেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে জগদীশ আর্তমানুষের সেবা করতেন। কুসংস্কারের উচ্ছেদ করতেন যে কোন মূল্যে। চরিত্র গঠন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ-সংস্কার ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। এজন্য তাঁকে গুরুবরণ করতে হয়নি। আত্মাই ছিল তাঁর জীবনের দিশারী ও গুরু।

প্রতিদিন জনসমক্ষে গীতা ভাগবত ও উপনিষদ ব্যাখ্যা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। সমাজ-সংস্কার ও চরিত্র গঠন ছিল এগুলির মূল লক্ষ্য। সে সময় কালীকুমার বসু বরিশালে 'নববিধান সমাজ' গড়েন। ইনি প্রত্যহ উষাকীর্তন করতেন। জগদীশ এই নববিধান সভার আচার্য ছিলেন। এজন্য সাধারণ লোকে তাঁকে ব্রাহ্ম বলে মনে করতো। অশ্বিনীকুমারও বরিশালে ব্রাহ্ম বলে গণ্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতির দিকটিকেই বরণ করেন। কেহই ব্রাহ্ম হননি। জগদীশ পরে নিজ বাসভবনে দেবমূর্তি স্থাপন করেন। ধর্ম ও চরিত্র-শিক্ষার জন্য জগদীশ 'বাল্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বরিশালে বান্ধব সমিতি, অমৃত সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি এদের সেবায় জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৩১৫।১৬

সালের দিকে বরিশালে একটা সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। গণেশচন্দ্র দাসের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। জগদীশ এই বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বিবাহে তিনি পৌরোহিত্য করার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগরের শিষ্য। সে সময়ে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন—"শাস্ত্র বিচারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই পড়ে নেবেন।" অস্পৃশ্যতা নিবারণ ছিল তাঁর জীবনের আর এক ব্রত। এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্য্যকলাপের দ্বারা আচার্য জগদীশ সমাজজীবনে এক বৈপ্লবিক চেতনা আনয়ন করেন। জগদীশ হয়ে ওঠেন বিরলদৃষ্ট লোকশিক্ষক। সেজন্যই তিনি 'আচার্য' আর তাঁকে বলা হোত বরিশালের শিব।

ছাত্রজীবনে জগদীশ রাজনীতিতে অনুরাগী ছিলেন না। তথাপি তিনি ছিলেন স্বদেশভক্ত কিন্তু প্রকাশ্য রাজনীতিতে তাঁর কোন স্পৃহা ছিল না। তথাপি তৎকালীন কংগ্রেসে তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। তিনি নাগপুর কংগ্রেসে বরিশালের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। রাজনীতিতে হিংস্রপন্থাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। গঠনমূলক রাষ্ট্রান্দোলনে তাঁর সহানুভূতি থাকলেও জনসেবা, চরিত্রগঠন, ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সমাজসংস্কার তাঁর প্রিয় কাজ। তিনি এক সময়ে বরিশাল হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি অসাম্প্রদায়িক। অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন করলে জগদীশ তা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালন ব্যাপারেও অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর একবার মতভেদ হয়। তখন তিনি কর্ম থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে তার আগ্রহ তেমন ছিল না, কিন্তু যখন বরিশালে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আচার্য জগদীশ সহযোগের হস্ত প্রসারিত করেন। তাঁর সর্বপ্রকার আচরণে একটা স্নিগ্ধ মধুর প্রশান্ত সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটত। জগদীশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভাবরাজ্যের লোক। তিনি জ্ঞান ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। অশ্বিনীকুমার বিবৃত ভক্তিযোগের সম্যক আদর্শটি শিক্ষক জগদীশের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করে। গীতা ও ভাগবতের উপদেশ ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সত্য-প্রেম-পবিত্রতার মন্ত্রে দীক্ষিত। আত্মসেবা নয়, পরসেবা ছিল ছাত্রসমাজের একটা মহান ব্রতের দিক। জগদীশ ছাত্রদের শিক্ষাপ্রদানকালে কেবল পাঠ্যপুস্তক নয়—ঐ পবিত্র আদর্শগুলিও

যুবচিত্তে মুকুলিত করে তুলতেন। সেজন্যই তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অনেকেই জীবন্ত মানুষ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। জগদীশ মুখোপাধ্যায় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন জীবনব্যাপী। কিন্তু তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের কোন পরিচয় তিনি রেখে যাননি। কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা তিনি অনায়াসে হতে পারতেন, বহু গ্রন্থ লিখে যেতে পারতেন। নিজের যশ প্রতিষ্ঠা ও গৌরব অর্জনের জন্য তাঁর স্পৃহা ছিল না। আনন্দ ছিল না। অর্থ উপার্জনের মধ্যে মানুষ তৈরীই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। গীতা ছিল তাঁর জীবনের দিশারী গীতা তাঁর পথ-প্রদর্শক। তাঁর নিজের জীবনখানি গীতার একটা জীবন্ত ভাষ্য। সেজন্যই ভবিষ্যৎ বাঙালী জনের জন্য তিনি কোন স্মৃতি রেখে যাননি, কোন গ্রন্থের রচয়িতারূপে দেখা দেননি। তিনি সকলের মধ্যে নিজেকে বিতরণ করেছিলেন। তবু অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রন্থগুলি প্রকাশের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, প্রেম প্রভৃতি পুস্তকগুলির প্রকাশক ছিলেন জগদীশ নিজে। এই পুস্তক তিনখানির মূল্যবান ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর আরও কতিপয় প্রকাশিত রচনার কথা শোনা যায়।

নবযুগের বাঙলাদেশে আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় পূর্বদিগন্তকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা প্রসার চিন্তা ও শিক্ষাপ্রদান প্রণালী সেকালের নব শিক্ষিত যুবকগণের আদর্শ হয়েছিল। জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে-পবিত্রতায় তিনি পুরুষ চরিত্রের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার (ইং ১০ই নভেম্বর, ১৯৩২) চিরকুমার আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার চরিত্র-চিত্র প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করেন দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা। ১০ই নভেম্বর মফঃস্বল সংস্করণ আনন্দ বাজারে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। এই জগদীশকে দেখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার বলেছিলেন—"এ কাঁচা সোনা কোথায় পেলে অশ্বিনী ?" হরিদাস মজুমদার সম্পাদিত আচার্য জগদীশ প্রসঙ্গ (১৩৪০) পুস্তকের ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রদ্ধা নিবেদনকালে বলেছিলেন—"কুটীরাশ্রমবাসী আচার্যদেবকে দেখে পুরান ভাগবতের ঋষি চরিত্রের মধুর স্পর্শ যেন আমার মনে পেয়েছিলাম।" এমন শ্রদ্ধানিবেদন অনেকেই করেছেন। অধুনালুপ্ত বরিশাল অমৃত সমাজের মুখপত্র 'অমৃত' পত্রিকা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণকালে "ব্রহ্মর্ষি জগদীশ" শিরোনামায় লিখেছিল,—"ব্রহ্মর্ষি জগদীশ আজ মরজগতে নাই।

আদর্শ পণ্ডিত, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মানব, আদর্শ ভক্ত এ ঋষি আজ লোক-চক্ষুর অন্তরালে চিরকালের জন্য লুকাইয়াছেন। পরমহংসদেব যাঁহাকে 'কাঁচা সোনা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সিদ্ধ মহাপুরুষ সোনাঠাকুর যাঁহাকে একদিন না দেখিলে অস্থির হইতেন, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার যাঁহাকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া চিরজীবন শক্তির সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি আজ অমৃত লোকের অধিবাসী।" (অমৃত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের কৃতী ছাত্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক স্বর্গীয় ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় ১৩৬১ সালের পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় নামযুক্ত রচনায় অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বর্তমান যুগ ছাত্র বিশৃঙ্খলার এক সংকট মুহূর্ত। সমাজের সকল স্তরে উন্মার্গ-গামিতার ব্যাপকতা এবং দেশের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই নৈরাশ্যপীড়িত ও উদ্বিগ্ন। শিক্ষাজগতের এই ঘোর দুর্দিনে জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষাবিদদের জীবনচর্চা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কামাখ্যাচরণ নাগ

গত শতকের শিক্ষা আন্দোলন জাতীয় জাগরণের এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই সময়ে বাঙলাদেশ অগণিত স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছিল। এদের অনেকের কথা নানাভাবে আলোচিত হয়েছে—কিন্তু অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্রগুলিকে আমরা ভুলে গেছি। আমরা বিস্মৃত হয়েছি এ যুগের অনেক হৃদয়বান উদার ও কর্মবীর মানুষের মুখর মিছিলকে। আপামর জনসাধারণের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই জাতির আত্মজাগরণ সম্ভব, সে যুগে এই ভাবাদর্শকে গ্রাহ্য করে যাঁরা পুরোবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—কামাখ্যাচরণ নাগ সে অধ্যায়ে এক দীপ্ত নক্ষত্র।

অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ, এ নামেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। জীবনের দীর্ঘতম সময় তিনি কলেজের অধ্যক্ষরূপেই অতিবাহিত করেছেন—তবুও কেবলমাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠাতেই নয়, বাঙলাদেশের বহুক্ষেত্রে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক রূপেও তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। সে সময়ে দেশের যেখানেই কোন স্কুল কলেজের গুঞ্জন শোনা গেছে, সেখানেই সহযোগীরূপে কামাখ্যাচরণকে দেখা গেছে। তিনি ছিলেন গতযুগের একজন কৃতবিদ্য ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তদানীন্তন বাঙলাদেশের প্রথম সারির অধ্যাপকবৃন্দের একজন। আজীবন শিক্ষাব্রতী তিনি। কিন্তু অধ্যাপনা অপেক্ষাও তাঁর বড় কৃতিত্ব ছিল—দেশে শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে।

এদেশের এক গভীর ভাবান্দোলনের যুগে কামাখ্যাচরণের আবিভাব। জন্ম সন ১৮৬৮ সাল। নদীয়া জেলার চূর্ণীতীরের এক অনাদৃতপল্লী চন্দনগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "দেবতার গ্রাস" কবিতায় চূর্ণীকে অমর করে গেছেন—

…হেমন্তের প্রভাত শিশিরে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণী নদী তীরে।

চূর্ণী তীরে চন্দনগর এমনই একখানি গ্রাম। আর পরপারে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস-খ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাসপুরী। কামাখ্যাচরণের

পিতা ঈশানচন্দ্র নাগ।১ চন্দননগরের নাগেরা ঢাকার বারোদীর নাগবংশসম্ভূত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নয়নানন্দ নাগের ১০ম পুরুষ মনোহর নাগ বারোদী গ্রাম পরিত্যাগ করে নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের অন্তর্গত চন্দননগর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। মনোহর নাগ চিকিৎসক ছিলেন। নদীয়ার এ অঞ্চলে তখন বিদ্যাভিমান করার মত কেউ ছিল না। তবু এরই মধ্যে চারিদিকে উষার কলকাকলি শোনা গেছে। নব্য শিক্ষা অর্জনের মত তখন এ অঞ্চলে কোন উল্লেখ্য স্কুল বা কলেজ ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাস তখন মন্থর শাসন নিয়েই ব্যস্ত। প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সরকার চৌধুরীদের আড়ম্বরের রাজসিক ঐশ্বর্য্যে তখন ভাঁটা পড়েছে। নীলকুঠীর সাহেবরা ইতিমধ্যেই দরিদ্র কৃষকদের আপন আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। বয়সার কুঠী হতে চৌগাছা পর্যন্ত তখন তাদের প্রবল প্রতিপত্তি। গ্রাম পথে তাদের অশ্বখুরের ধ্বনিতে নদীয়া যশোহরের কৃষক গৃহস্থের অন্তঃপুরে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হত আজও তা আতঙ্ক আনে। নবাবী আমলে এ অঞ্চলে টোল চতুষ্পাঠি, পাঠশালা, মাদ্রাসার প্রাচুর্য থাকলেও এবং ইতিহাসের দলিলপত্রে তার নজির মিললেও তখনকার দিনে তা ছিল অবাস্তব। কামাখ্যাচরণের জন্মভূমির আশে পাশেই মোগল যুগের অবক্ষয় কোথাও কোথাও হয়ত স্মৃতি নিয়ে তখনও উঁকি দিচ্ছিল। কামাখ্যাচরণের কালে এ অঞ্চলে মানুষ ছিল, কিন্তু পূর্বের শৌর্য বীর্য ঐশ্বর্য ও দীপ্তি ছিল না। ম্যালেরিয়া, মহামারী, অশিক্ষা ও গোঁড়া গ্রাম্য শিরোমণিদের অত্যাচারে গ্রামীন সমাজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল। কামাখ্যাচরণ শিক্ষা ও বিদ্যার অমৃতবারি এনে ঢেলে দিলেন এই ম্রিয়মান পল্লী মানবাত্মার মধ্যে। কিন্তু সেকথা পরে।

এই পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে কামাখ্যাচরণের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তিনি প্রথম পাঠ নিলেন কৃষ্ণপুরের বিখ্যাত হরচন্দ্র পণ্ডিতের কাছে। কৃতিত্বের সঙ্গে অতিক্রম করলেন—এনট্রান্স ও এফ, এ। ১৮৯৩ সালে তিনি কোলকাতায় 'সিটি কলেজ' থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে 'ডবল অনার্স' নিয়ে বি, এ পাশ করলেন। সেকালে তাঁর এই অর্জিত বিদ্যা বড় সরকারী চাকুরী লাভ বা সাহেব-সুবো হবার পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন কঠিন পথ। এ পথ দারিদ্র্যের ও ত্যাগের। কারণ তিনি গত শতকের বাঙলাদেশে

১ সুরেন্দ্রকুমার নাগ। নাগবংশানুচরিত (১৩৪৯)

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম পথিক হতে চাইলেন। সেকালের মানবধর্মের আলো বাতাস, খাদ্য-পানীয়ে তিনি লালিত হয়েছিলেন। বাঙলার জাতীয় আন্দোলন স্বাদেশিকতা এবং. বাঙলার সন্তানগণের বিশ্ব বিজয় কাহিনী তাঁকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাঙালী সেকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখাতে স্বদেশ সেবার কাজে নিয়োজিত ছিল। কামাখ্যাচরণ নিরক্ষর জনগণের মধ্যে বিদ্যা বিতরণের মহাব্রত গ্রহণ করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। প্রথম শিক্ষক জীবন সুরু করলেন, নদীয়া জেলার ভাজনঘাট স্কুলে। এখানে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে নায়কত্ব করার আহ্বান এল। সে সময় বাঁকুড়া জেলায় Kurchilal H. E. School প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলেছিল, তাঁরা কামাখ্যাচরণের সহযোগিতা চাইলেন; এই বিদ্যালয়ের প্রাধন শিক্ষক হিসেবে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে সকলের প্রশংসা কুড়ালেন। কেবল শিক্ষকরূপেই নয় বিদ্যোৎসাহী সংগঠকরূপে দেশবাসী তাঁকে শিরোপা দিলেন। বৃহত্তের আহ্বান যাঁর চিত্ততলে আলোড়ন তুলেছিল তিনি এই সীমিত সিদ্ধির বন্ধনে বন্দী থাকলেন না। ১৯০২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পাশ করলেন। কিন্তু এই কলেজীয় শিক্ষা বা তার শ্রেণী দিয়ে বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কলেজী শিক্ষা বিদ্যামন্দিরের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—বিদ্যামন্দিরের পূজারী হতে গেলে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ত অনুধ্যান অনুশীলন করতে হয়। এখন কামাখ্যাচরণের মধ্যে এই অনবদ্য প্রস্তুতি। শিক্ষাব্রতের পথ কঠিন। সরস্বতীর বরপুত্র হতে হলে কিংবা সাধনানিষ্ঠ ত্যাগব্রতী না হলে, এ সাধনায় সিদ্ধি দুর্লভ। কামাখ্যাচরণ ছিলেন তাই। তারুণ্যের মধ্যেই শিক্ষকের সর্ববৃত্তি তাঁর মধ্যে স্ফুরিত হয়েছিল। তিনি জন্ম-শিক্ষক। ইচ্ছা করে কখনও বড় শিক্ষক হওয়া যায় না। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর কোন ছাত্রকে বি. টি. পড়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'Teachers are born" কেবল বি. টি. পড়লেই শিক্ষক হওয়া যায় না। এম. এ পাশ করার পর তিনি কিছুকাল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

মহৎ শিক্ষাব্রতীর সব রকমের গুণ নিয়ে সবপ্রকারের অর্থ প্রলোভনকে দমন করে শিক্ষকের বাঞ্ছিত পদকে গ্রহণ করে, তিনি দেশসেবায় নামলেন। ১৯০৭ সাল খুলনা জেলার দৌলতপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল। নূতন

কলেজকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারেন এমন একজন যথার্থ বিদ্যোৎসাহী অধ্যক্ষের প্রয়োজন। তাঁরা কামাখ্যাচরণের নাম শুনেছিলেন—দৌলতপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারা কামাখ্যাচরণের সেবা চাইলেন। কলেজের নাম হল "দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী"। ১৯০৭ সালে কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্নেই কামাখ্যাচরণ অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। কামাখ্যাচরণ "হিন্দু একাডেমীর" প্রথম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। কামাখ্যাচরণের কালেই কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হ'ল। কৃতবিদ্য অধ্যাপক-বৃন্দের সঙ্গম করে তুললেন এখানে। এখানেই পেলেন "যশোহর ও খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সতীশচন্দ্র মিত্রকে। ১৯১৪ সালে তিনি দৌলতপুর থেকে বিদায় নিলেন।

এবারে আবার নতুন বিদ্যালয়ের কর্ণধার। মালদহ জেলার চাঁচলের রাজা নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কামাখ্যাচরণের সহযোগিতা চাইলেন। কামাখ্যাচরণ সানন্দে সাড়া দিলেন। পদ-মর্য্যাদা বা আত্ম-গৌরবকে তিনি বড় করে দেখেননি। নতুন দেশ ও জাতি তৈরীর স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন। সেজন্য দেশের যেখানেই কোন শিক্ষা সমস্যার গুঞ্জন শোনা গেছে, বিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠার সংবাদ এসেছে দেশবাসী সেখানে কামাখ্যাচরণকে পেয়েছেন। তিনি উৎসাহিত করেছেন উদ্যোক্তাদের, অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের। কামাখ্যাচরণের এটাই ছিল আনন্দের জগৎ। ১৯১৪ সালে কামাখ্যাচরণ Chanchal H. E. School এ রেক্টরের পদে যোগদান করলেন। ১৯১৮ সালের মধ্যে স্কুলের বিপুল উন্নতি ঘটল। শিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে নিজের কৃতিত্বকে তিনি আর একবার প্রতিষ্ঠিত করে দেখালেন। ১৯১৮ সালে কামাখ্যাচরণ চাঁচল ছেড়ে চলে এলেন খুলনা জেলার 'বাগেরহাটে'।

যশোহর ও খুলনাবাসীরা পূর্ব থেকেই কামাখ্যাচরণের গুণপনায় মুগ্ধ ছিলেন। এ সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল। বাগেরহাটের উদ্যোক্তারা কামাখ্যা-চরণের সহযোগিতা চাইলেন, এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। কলেজের নাম হোল "প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ"। প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯১৮ সাল। অনেক আগেই প্রফুল্লচন্দ্র রায় কামাখ্যাচরণের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মুখ্যত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুরোধে কামাখ্যাচরণ "বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে"র অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন। জীবনের অবশিষ্ট ২১ বৎসর তিনি এই কলেজের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সময়েই বাগেরহাট কলেজের সমূহ উন্নতি ঘটে,

অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণের যশোগরিমা সমস্ত বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বরিশাল থেকে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁকে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য ডাকলেন; আহ্বান এল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য। নানা-স্থানে আহূত হয়েও তিনি কখনও আর বাগেরহাট কলেজকে পরিত্যাগ করে যাননি।

এমনি করে ভাজনঘাট, বেনারস, বাঁকুড়া, চাঁচল, দৌলতপুর, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থলে তাঁর কর্মবহুল শিক্ষাব্রতী জীবনের অনেক ঘটনাই ঘটল। কিন্তু সমগ্র বাঙলাদেশই যে তাঁর ক্ষেত্র। বাঙলাদেশের তদানীন্তন সর্বপ্রকার শিক্ষা আন্দোলনে তিনি নিজেকে জড়িত রাখলেন। শিক্ষা বিস্তারের সর্ব অঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে নিখিলবঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতিরূপে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ এদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে আজও স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। তাঁর সেই ভাষণ-গুলি তৎকালে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়েছিল। পরাধীনতার যুগে এই অধ্যাপক সম্মেলনগুলি ছিল অসীম গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানের মত লঘু ও মামুলি ব্যাপাব ছিল না। এমনি করেই চূর্ণীতীরেব এক স্বপ্ন-বিলাসী বালক স্বদেশের হৃদয়বেদনার মূর্ত প্রতীক হয়ে সমগ্র বাঙলাদেশের নমস্য হলেন।

সেকালের অনেকেব মতই কামাখ্যাচরণ ছিলেন নিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিক, আর শিক্ষা বিস্তারের পথেই কামাখ্যাচরণেব স্বাদেশিকতা। এ বিষয়ে তাঁব অত্যুজ্জ্বল কীর্তি দৌলতপুর ও বাগেরহাট কলেজ। যশোহর ও খুলনাবাসীরা সেকথা জানেন। ভারতীয় আদর্শের শিক্ষাব্রতীর মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাই তিনি মহান স্বাদেশিক হয়েও রাজনীতির পঙ্কিল পথে পা বাড়াননি। যেখানেই কোন স্কুল কলেজ ও পাঠশালা স্থাপনের গুঞ্জন উঠেছে, সেখানেই দেশবাসী পেয়েছে তার অকুণ্ঠ সহযোগিতা। তবে জাতীয় আন্দোলনের ধারাকে তিনি পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ করতেন। তিনি বলতেন, রাজনীতি ছাড়াও দেশ সেবার প্রশস্ত পথ শিক্ষাবিস্তার। ১৯২১ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের গৌরবময় যুগ। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের আন্দোলনকে সংগ্রামমুখী করে তোলেন। ঠিক এই ১৯২১ সালে, কামাখ্যাচরণ আপন জন্ম-ভূমি চন্দনগর গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১ সাল নদীয়ার একটি বিশিষ্ট জনপদের কাছে স্মরণীয় লাল তারিখ।

তখন নদীয়া জেলার এই অঞ্চল, বিশেষ করে কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি ও চাপড়া

থানার অধিবাসীদের সম্মুখে কোন বিদ্যালয় ছিল না। কামাখ্যাচরণ এই অভাব পূরণ করে দেশবাসীদের অশেষ কল্যাণ সাধন করলেন। সে যুগে যাঁরাই ভাল কাজ করতে গিয়েছেন—তাঁরাই বাধা পেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নবযুগের প্রথম মানুষ হয়ে একথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। জন্মভূমি চন্দননগরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাধা এল অনেক, কারণ দেশ তখনও বিদ্যা-বিবর্জিত; শাস্ত্রজ্ঞান তখন কুসংস্কার মাত্র। চূর্ণীর পরপারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাস থেকে চরম বাধা এল। শিবনিবাসের সাধারণী, দৈনিক, বঙ্গবাসী, হিন্দী বঙ্গবাসী, দৈনিক চন্দ্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পূর্বে অর্থাৎ ১৯১১ সালেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তবু কামাখ্যাচরণ জয়ী হলেন। কেবল মাত্র ইংরেজী শিক্ষা নয়, শিক্ষা যাতে এই শোষিত দরিদ্র জনগণের হৃদয়-মন ও জীবন ধারণের অনুকূল হয়, সেজন্য তিনি আনুষঙ্গিক ও আবশ্যিকভাবে কৃষি, তাঁত ও কুটীরশিল্প শিক্ষাকে প্রশ্রয় দিলেন। তাঁর দূরদর্শিতার ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'চন্দননগর রাধাদামোদর পলিটেকনিক্ ইনষ্টিটিউশন' আজ শুধুমাত্র নদীয়া জেলারই নয়—সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি বৃহত্তম বিদ্যা প্রতিষ্ঠান; কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্য-কৃষি এই চারটি বিষয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা কামাখ্যা-চরণ কর্ম ত্যাগ ও সাধনার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সে ইতিহাস বিস্তৃত, সুতরাং সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কবি ও দেশসেবী সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত উপাসনা পত্রিকায় "রাধাদামোদর পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট বিদ্যালয়" সম্পর্কীয় একটি বড় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ হতে জানা যায়, কামাখ্যাচরণ মাত্র তিনজন শিক্ষক, ৩টি ছাত্র, ২৫ টাকা এবং একখানা 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' পুস্তক সম্বল করে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৮০। এই বৎসরে মহারাজা কাশিম বাজার পলিটেকনিক্ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের অধ্যাপক মহামতি ক্যাপ্টেন পেটাভেল এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং কর্মবীর কামাখ্যাচরণের অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কবি সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয় ব্যক্তিগণ পেটাভেল সাহেবের সহযাত্রী হয়েছিলেন। কামাখ্যাচরণ সেকালের স্বাদেশিকতার বাণীকে এই অঞ্চলে প্রথম মূর্তিমান করে তোলেন। কামাখ্যাচরণের বিদ্যোৎসাহিতার ফলেই মহারাজা

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জগৎবরেণ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ক্যাপ্টেন স্যার পেটাভেল, কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য কবি ও মনীষী তাঁর এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। কামাখ্যাচরণ ক্ষত্রিয় হয়েও ছিলেন ঋষি। তাঁর ক্ষাত্রতেজ ও ত্যাগের গুণেই চূর্ণী তীরের উভয়তীর আজ পুলকিত।২

কামাখ্যাচরণ সেকালের বিশিষ্ট ইংরেজী অধ্যাপকদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর চিত্তস্পর্শী বাগ্মিতাশক্তি ছিল। সেকালে সারা বাঙলাদেশ তাঁর অধ্যাপন-শক্তির কথা শ্রবণ করেছিল—দেশময় ছড়িয়েছিল এই অপূর্ব ইংরেজী অধ্যাপকের কথা ও গল্প। সুদূর মফঃস্বলের অধ্যাপক হয়েও তিনি সমগ্র দেশের চিত্ত স্পর্শ করেছিলেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের কাজ। অধ্যয়নকে তিনি স্বাধ্যায় মনে করতেন, আর অধ্যাপনাকে মনে করতেন যজ্ঞ। পড়তে ও পড়াতে তাঁর ছিল অফুরন্ত উদ্যম। তিনি কিরূপ অধ্যাপক ছিলেন এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর অন্যতম কৃতী ছাত্র সুসাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখেছেন—'কামাখ্যাবাবু আমাদিগকে বাইবেল পড়াইতেন বটে, কিন্তু এমন কোন বিষয় ছিল না যাহা তিনি পড়াইতে পারিতেন না। লজিকের অধ্যাপক নাই, তিনি লজিক পড়াইতেছেন, সংস্কৃতের অধ্যাপক অনুপস্থিত, তিনি সংস্কৃত ক্লাস লইতেছেন। আমার অঙ্ক ছিল না, কিন্তু দেখিতাম অধ্যাপকের অভাবে তিনি অঙ্কের ক্লাস লইতেছেন। রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা ইহাও যেন তাঁর অধীগত সর্ববিদ্যাবিশারদ এই চৌকস মানুষটিকে দেখিয়া তাক লাগিয়া যাইত। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি উপস্থিতমত এমনভাবে পড়াইতেন যে, শ্রোতার মনে হইত যে ঐ বিষয়টিতে যেন তাঁহার কত দখল! প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি আবার রসাল করিয়া পড়াইতে পারিতেন। এমন বিদ্বান ব্যক্তির ছোঁয়া লাগায় কলেজভবন যেন সরস্বতীর পীঠস্থান হইয়া উঠিল।"৩ সেকালে তাঁর তুল্য বাইবেলের অধ্যাপক খুব কম ছিল। ইংরেজী অধ্যাপনা কালে তুলনামূলকভাবে অন্য ভাষা ও অন্য সাহিত্যের আলোচনা করতেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। এদেশের একখানি দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা তাঁর মৃত্যু সংবাদে এক সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। বিভিন্ন দৈনিকে তাঁর চরিতাখ্যান প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে অধ্যক্ষ নাগ পরলোকগমন করেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি: "Sj. Nag was an

২ উপাসনা, চৈত্র, ১৩৩০

৩ বরণীয় (১৩৬৬)—যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ২৭-২৮

erudite scholar. Though he was an M. A. in English, he could teach Chemistry, Physics and Sanskrit. There was hardly any subject on which he could not speak for hours together authoritatively. He was a linguist. He knew Latin, French and Persian and was a master of them."৪ কোন কিছু পড়াতে গেলে সেই বিষয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই তাঁর কয়েকদিন কেটে যেত। সেজন্যই এই মহাপণ্ডিত অধ্যাপকের মৃত্যুতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছিলেন—"I am greatly shocked at the news of the death of Kamakshya Babu. Kamakshya Babu was a great scholar. He was master of many subjects and languages. He was the Principal of the Bagerhat College from its very inception. The success of the College was fully due to him. He was a very popular teacher. He was loved and held in high esteem by all. The like of him we shall not meet again." শ্রদ্ধেয় বাগল মহাশয় লিখেছেন, "অন্য বহু কলেজের অধ্যক্ষপদের জন্য আহূত হইয়াও তিনি কখনও বাগেরহাট কলেজকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজেই অধ্যক্ষপদে স্থিত ছিলেন ; তাঁহার সময়ে বাগেরহাট কলেজের যথেষ্ট উন্নতি হয়।" শিক্ষাক্ষেত্রে একালে এমন চরিত্র সহজলভ্য নয়।

কেবল অধ্যাপনা নয়, কামাখ্যাচরণ সেকালের সর্বপ্রকার সমাজসেবা ও সংস্কারমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামী কৃষ্ণানন্দ ছিলেন তাঁর ধর্মগুরু। বাঙালীর জাতীয় জাগরণের ঐ যুগে শশধর তর্কচূড়ামণি, কালীবর বেদান্তবাগীশ, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য যে অনন্ত প্রয়াস করেছিলেন—সেজন্য দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এঁরা ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। কামাখ্যাচরণও ছিলেন বিখ্যাত লোকশিক্ষক, ভক্ত ও বাগ্মী। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় কামাখ্যাচরণের সংস্কৃতসাহিত্য ও হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রচর্চা, সাহিত্য আলোচনা এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতায় ভাষার লালিত্য, ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব এবং ভাবগভীরতার উল্লেখ করেছেন বাগল মহাশয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মরক্ষিণী সভায় তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি সেকালের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতো। তিনি খুলনা জেলার এক

৪ The Hindusthan Standard (Editorial), 10th Sept. 1939.

কায়স্থসভায় বলেছিলেন—"একথা আমি বুঝি না, কেন সকলে পৈতা নিতে চায় ? First deserve, then desire,—যে জাতিতে কায়স্থ, ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত নহে—সে পৈতে নিতে চেষ্টা করে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অবমাননা করে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ও আপনার জাতিকেও হীন, ঘৃণিত ও অধম প্রতিপন্ন করে। তার জানা উচিত বংশধারা আলাদা জিনিস, কর্মই একমাত্র ক্রমোন্নতির পথ।" কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি খুলনা জেলায় নানা প্রকার সংগঠনমূলক কাজ করেন। এবিষয়ে সেনহাটিতে তার বক্তৃতার কথা—সুসাহিত্যিক স্বর্গীয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর একখানি গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।৫

কামাখ্যাচরণ বাগ্মী ও সুবক্তা ছিলেন আগেই তার উল্লেখ করেছি। ১৯৩৭ সালে নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩৮ সালের নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে যে সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন তার দু'একটা লাইন এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য—"The function of education, all the worldover, and in all ages, is what may fittingly be called emancipation. Education is the phraseology of archaic hand, which manumits and edifies. First, it frees the slaves, next it builds the man To create capacity and culture, to develop skill for the hand, and sight for the soul to open the means of honourable living to the individual, and to reveal to him the full meaning of life, is the noble duty of education, and is, I consider, the highest patriotism; for the world is cursed by ignorance and darkness. It will be blessed by knowledge and light."৬ তাঁর এই বক্তৃতা পাঠ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Law College এর অধ্যক্ষ মহাশয় লিখেছিলেন—"In Principal Kamakshya Charan Nag, you heard the deep music of the old As I was reading his address the other day, I saw indeed the visions of 'Naimisarayana' of bygone days. He is indeed a Rishi in Naimisarayana which had no local habitation, which has no name." বাস্তবিকই তাঁর আচার আচরণে, ব্যবহারে,

৫ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত—ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়
৬ Presidential Address, 1938

সামাজিকতায়, প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের গুণাবলী মূর্ত হয়ে উঠত। এমন কি প্রাত্যহিক উপাসনাকালে ধ্যানস্থ এই ব্যক্তিটিকে তাঁর প্রিয় কুকুরটি প্রায়ই আদরে আঘ্রান ও লেহন করত। এই বাহ্য অনাচার তাঁর নৈষ্ঠিক অন্তরকে কোনদিন অশুচি করেনি। এ বিষয়ে উল্লিখিত অন্য একটি পুস্তিকায় বিশদ আলোচনা করেছি।৭

কামাখ্যাচরণ ইংরেজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই সুলেখক ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুখ্যত কর্মবীর। শিক্ষাপ্রসার ও শিক্ষামূলক সংগঠনের মধ্যেই তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়। গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করার অবসর মেলেনি। তবু কৃষ্ণানন্দ স্বামীর, "পরিব্রাজক" পত্রে নিয়মিত লিখেছেন। সেকালের কতিপয় ইংরেজী কাগজে তাঁর মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু একাডেমী, কলেজ পত্রিকায় তাঁর নানা নিবন্ধ আছে। বাগেরহাট কলেজের মুখপত্র 'প্রজ্ঞা' পত্রিকায় তাঁর বহু মূল্যবান ইংরেজী ও বাঙলা নিবন্ধ বিক্ষিপ্ত আছে। এগুলির সংগ্রহ আজ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁর লিখিত প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে Presidential Address (1937) ও Presidential Address (1938) উল্লেখযোগ্য। তরুণ ইংরেজী শিক্ষার্থীদের জন্য ১৯১৩ সালে A Junior English Grammar (in Bengali) নামক মূল্যবান স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানি কোলকাতার চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং-র মালিক A. N Charterjee, M.Sc. কর্তৃক প্রকাশিত হয়। একালের শিক্ষক সমাজ এই গ্রন্থখানিকে আজও বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তরুণ ইংরেজী শিক্ষার্থীদের কাছে এই পুস্তকখানি আজও বহু মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। এই গ্রন্থের Preface-এ তিনি লিখেছিলেন—"The main object of compiling this little book is to meet the 'real needs' of the junior students of our schools. I have therefore spared neither pains nor space in collecting and presenting useful information under the different heads. A mere galance at the table of contents will show that I have departed a little from the beaten track and attempted to grapple with some of the real difficulties of the students. I have lifted my voice here and there against the prevailing tendency of making Bengali appear like English and chosen the contrary but natural

৭ আচার্য কামাখ্যাচরণ নাগ (১৯৫৩)

method of making English appear like Bengali." যে সময়ে দেশে যথার্থ Text Book ও পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা দেখা দিয়েছে—সেই লগ্নে একালের শিক্ষকবৃন্দ কামাখ্যাচরণের এই অমূল্য পুস্তকখানির সময়োপযোগী প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেখতে পারেন। তাছাড়া উচ্চমানের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি একখানি 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামি সঙ্কলিত ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত 'কুমার পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয়ের ধর্ম্ম-সাধন ও প্রচার কার্য্যের আমূল ইতিবৃত্ত' (১৩৪৬) গ্রন্থখানি কামাখ্যাচরণ নাগ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে 'প্রকাশকের নিবেদন' কামাখ্যাচরণের রচনা।

কামাখ্যাচরণের ছাত্রপ্রেম, গরীব দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি, সর্বধর্মে সমদৃষ্টি, দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ, এ সকল বিষয়ে বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তা সম্ভব নয়। বাগেরহাট পি, সি, কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ, স্বদেশমন্ত্রের গুরু, বাগ্মী, বিশ্রুতকীর্ত্তি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কামাখ্যাচরণ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন—তা এই সূত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে উদ্ধৃত করছি—
"Principal Nag was 15 years my senior and he belonged to the generation preceding. I have had the honour to know him intimately for the last ten years. I have nowhere met a teacher so fatherly, so devoted, so sincere. His undoubted scholarship sat easy on him

He was in his life a true son of mother Bengal and unflinchingly loyal to his principles of life and religion He sustained good causes and valiantly faught against injustice and immorality He was an exceedingly pious' and devout Hindu and withal a staunch patriot.

I bow down my head in reverence to a man surcharged with—"the milk of human kindness," whose pity often gave before charity began. He made this College and this district his own and the College and the district nay,—entire Bengal reveres his memory today. I shall endeavour to follow humbly

his footsteps and conserve his precious legacy." বাগেরহাট পি, সি, কলেজের মুখপত্র 'প্রজ্ঞা'র কামাখ্যাচরণ স্মৃতিসংখ্যার মুখবন্ধে অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রচন্দ্র এই প্রশস্তিলিপি রচনা করেন। এমনি করেই সেকালের শিক্ষক কামাখ্যাচরণ নাগ তাঁর প্রতিভার অঙ্গার-অগ্নিদীপ্তিতে তমসাচ্ছন্ন জাতিকে আর একবারের জন্য বাণীকণ্ঠ করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই নীরব শিল্পীদের কথা আমরা মনে রাখিনি—মনে রাখিনি এমনি অসংখ্য প্রেম, পৌরুষ ও মনীষার যুগপথিক বাঙালী শিক্ষক সম্প্রদায়ের অবদানের কথা।

হারাণচন্দ্র চাকলাদার

স্বাদেশিক শিক্ষাব্রতী ও মনস্বী লেখক হারাণচন্দ্র চাকলাদার নব্য বাঙলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বাঙলার স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রাণপুরুষ হারাণচন্দ্র 'ডন' সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গণনীয় সেবক ও সৈনিকরূপে স্বাদেশিকতার যে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে পরিপুষ্ট করেছিলেন তা বিস্মরণযোগ্য নয়। আত্মপ্রচারে পরাঙ্মুখ, জাতীয় শিক্ষা ও স্বদেশী মন্ত্রের প্রচার ও প্রসারে নীরব কর্মী, ত্যাগব্রতী, ভারতীয় ঐতিহ্যের মুগ্ধ উপাসক হারাণচন্দ্র চাকলাদার ভাষাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও সুপণ্ডিত সারস্বত সাধকরূপে এদেশে নিশ্চিত স্মরণীয়। দৃশ্যত গৃহী কিন্তু অন্তরের অন্তরে প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসী হারাণচন্দ্র ছিলেন গৌরবদীপ্ত স্বদেশী যুগের সঙ্গে আধুনিক মানসের সেতুবন্ধন স্বরূপ। ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জগতে উজ্জ্বলতা ও বিবিক্ত বিরলদৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হারাণচন্দ্র চাকলাদার তথাকথিত সাধারণ ও পেশাদার বিদ্বৎ সমাজের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। এমন এক বরণীয় বাঙালীর স্মৃতি সংঘাত ও আবর্তনের ফলে এ যুগের সন্তানসন্ততিদের কাছে প্রায় বিলুপ্ত। এমন কি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে (জুলাই, ১৯৫৪) আমরা তাঁকে স্মরণ করতে বিস্মৃত হয়েছি। শতবর্ষ পরে হারাণচন্দ্রের মত প্রজ্ঞাবান, দেশপ্রেমিক ও সাধককল্প পুরুষের সুদুর্লভ জীবন-বৃত্তান্ত প্রণয়নও হয়ত সম্ভব নয়। তথাপি বক্ষমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে তাঁর জীবন ও সাধনার একটা রূপরেখা নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে।

চাকলাদার পরিবার বঙ্গীয় মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। বহুপূর্বে এঁরা পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। রাজা সীতারাম রায়ের সময় এই মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ বংশ তাঁর রাজ্যের একটি চাকলার জমিদারি লাভ করেন। চাকলাদার খেতাব রাজা সীতারাম রায় প্রদত্ত। পরে এঁদের নিবাস হয় যশোহর। নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল পর্যন্ত চাকলাদার পরিবার যশোহরে বসবাস করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার পক্ষাবলম্বী থাকায় পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী কালে শত্রুতাড়িত বিপর্যস্ত অবস্থায় এই পরিবার ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড়া নামক গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। দক্ষিণপাড়া কার্তিকপুরের নিকটবর্তী। অনেকে এই অঞ্চলকে দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে অভিহিত করেন। কার্তিকপুর: সুদাবাদ, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণপাড়া গ্রামে।

হারাণচন্দ্র দেবশর্ম্মা চাকলাদার ২২শে জুলাই ১৮৭৪ বুধবার (৭ শ্রাবণ, ১২৮১) তারিখে ফরিদপুর জেলার উপরোক্ত দক্ষিণপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাশীচন্দ্র দেবশর্ম্মা চাকলাদার, মাতা কালীতারা দেবী। কালীতারা দেবীর ১৩টি সন্তান একই সময়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে। এজন্য কালীতারা দেবী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় বাড়ির নিকটবর্তী এক শ্মশানে দিনযাপন করতেন। অনেকদিন পরে একদিবস তিনি দক্ষিণপাড়া থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে সিদ্ধপীঠ দিগম্বরীতলায় গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সেই দিবস তিনি অজ্ঞানাবস্থায় দিগম্বরীতলায় নিশাযাপন করে পর দিবস প্রত্যুষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কালীতারা দেবী মাতা দিগম্বরী দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অবগত হন, তাঁর পরবর্তী সন্তান পিতা-মাতা ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে হারাণচন্দ্রের জন্ম হয়। হারাণচন্দ্র সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনাথবন্ধু এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয় যথাক্রমে সারদা দেবী ও বসন্ত দেবী।

হারাণচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয় অতি অল্প বয়সে। তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবন নানা বিঘ্ন ও সংঘাতের মধ্যে অতিবাহিত হয়। হারাণচন্দ্র বাল্যকালে অতিশয় দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর আদৌ আগ্রহ ছিল না। রংপুর জেলায় নিলফামারী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা। ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে নবীনচন্দ্র ছিলেন একজন স্মরণীয় শিক্ষক। তাঁর আয়াস ও যত্নে হারাণচন্দ্রের শিক্ষার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩ বৎসর বয়সে নিলফামারী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ৫ টাকা বৃত্তি সহ মাইনর পাশ করেন। অগ্রজ অনাথবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হারাণচন্দ্র অতঃপর চাঁদপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে হারাণচন্দ্র ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম ডিভিশনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার-পূর্বক এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সাফল্যের জন্য তিনি ১৫ টাকা সরকারী বৃত্তি ও ৫ টাকা স্কুলবৃত্তি লাভ করেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বেল হারাণচন্দ্র অতঃপর কোলকাতায় আগমন করেন এবং ১৭০ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের মেসে অবস্থান করে জেনারেল এসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশনে (স্কটিশচার্চ কলেজ) এফ, এ, অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হারাণচন্দ্র কোলকাতার এই প্রসিদ্ধ কলেজ হতে ২০ টাকা বৃত্তি সহ এফ, এ, উত্তীর্ণ হন। বসন্তরোগে

আক্রান্ত হওয়ায় হারাণচন্দ্র ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বি, এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। পর বৎসর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হারাণচন্দ্র ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেন। বি, এ,-তে তাঁর অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের ছাত্ররূপে হারাণচন্দ্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী এম, এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হন। উত্তীর্ণদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল পঞ্চম। সে বৎসর কেউ প্রথম শ্রেণী অর্জন করেননি। আপাত দৃষ্টিতে এখানেই তাঁর মামুলী ছাত্রজীবনের যবনিকাপাত বলে মনে হলেও তিনি আমৃত্যু জ্ঞানবিজ্ঞানের বহুধাব্যাপ্ত ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন।

হারাণচন্দ্র চাকলাদার স্বদেশপ্রেমিক, সারস্বত সাধক—সর্বোপরি তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীর শিষ্য। বহিরঙ্গ গার্হস্থ্য জীবন ব্যতিরেকেও তাঁর একটি আভ্যন্তরীণ জীবন ছিল। এই জীবন সন্ন্যাসীর জীবন—হারাণচন্দ্র ছিলেন গুপ্তযোগী। হারাণচন্দ্রের এই সন্ন্যাসী-জীবনের মর্মলোকে প্রবেশ করার মত অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তি বর্তমান লেখকের কাছে দুরাশা মাত্র। হারাণচন্দ্রের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আলোচনাকালে তাঁর অধ্যাত্মপিপাসার দিকটি স্মর্তব্য। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে শেষ পাদে, ভারতবাসী স্বরাজসাধনা ও হিন্দু-ধর্মের নব অভ্যুদয়ের প্রলয়কল্লোলে সচকিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কালীবর বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ সমগ্র ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যে আলোড়ন তুলে-ছিলেন তা ছিল আমাদের ধর্মান্দোলনের এক প্রদীপ্ত অধ্যায়। সেকালের বঙ্গবাসী, ধর্মপ্রবর্তক, ব্রাহ্মণসমাজ, নবজীবন প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় যুগমানসের এই অস্থিরতা, বিক্ষোভ ও আর্তির পরিচয় মেলে। উনিশ শতকের এই অন্তিমদশা আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ কাল। এই সময়ে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের গণমানসে জাগৃতি ও জাতীয়তার বন্যাবেগ প্রলয়ঙ্কর হয়। এই মাহেন্দ্র মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় শিকাগো বক্তৃতায় (১৮৯৩ খৃঃ) পাশ্চাত্য দেশে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। আমাদের নবজাগরণের অন্যতম উদ্গাতা শ্রীঅরবিন্দ এই লগ্নে বরোদা থেকে জাগরণের নূতন মন্ত্র প্রচার করতে থাকেন। হারাণচন্দ্র তাঁর বাল্য-কৈশোর ও কলেজীয়-ছাত্রজীবনে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পালাবদলের যুগান্তকারী পদসঞ্চারণ প্রত্যক্ষ করেন। এই যুগচাঞ্চল্য হারাণচন্দ্রকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক নূতন

আদর্শবোধে প্রবুদ্ধ করে তোলে। জীবনের এই প্রত্যুষলগ্নেই হারাণচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়ে যায়। গতানুগতিক সাধারণ জীবনচর্চাকে আলিঙ্গন করে বিদ্যার্জন, চাকুরি অথবা পারিবারিক স্বার্থ-সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি নিজেকে খণ্ডিত করতে অপারগ হলেন—দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির কারণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করার এক অচিন আহ্বান শ্রবণ করলেন। খণ্ডিত স্বার্থ নয়—'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখম্ অস্তি' এই মহামন্ত্রে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল।

হারাণচন্দ্রের উষর চিত্তভূমিতে প্রশান্তির ধারাবর্ষণ হতে বিলম্ব হয়নি। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নির্ণয়ের পথপ্রদর্শক গুরু লাভ করলেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ও পুণ্যশ্লোক নাম। বাঙলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণ সম্পর্কিত বহু পুস্তক ও নিবন্ধাদি ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু পরিতাপের কথা, উনিশ শতকের উদ্‌জীবনপর্বে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অবিস্মরণীয় অবদানের দিকটি প্রায় অস্বীকৃত থেকে গেছে। বস্তুতঃ উনিশ শতকের সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রভুপাদ গোস্বামীর মৌলিক সংস্কার আন্দোলন দেশকে নবযুগের তোরণদ্বারে পৌঁছে দেয়। বঙ্কুবিহারী করের "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ" (ঢাকা ১৯১০ খৃঃ), বিপিনচন্দ্র পালের "প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ" (কলিকাতা, ১৯৩৪ খৃঃ) এবং গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরীর "প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ" (কলিকাতা ১৯৫১ খৃঃ) প্রভৃতি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থে জাতীয় জাগরণে বিজয়কৃষ্ণের অগ্রপথিকের ভূমিকার দিকটি অনুধাবন করা যায়। হারাণচন্দ্র চাকলাদার সম্ভবতঃ ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে বি, এ ক্লাসের ছাত্র হারাণচন্দ্র প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পদতলে সর্বপ্রথম গুরুভ্রাতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮ খৃঃ) সঙ্গে পরিচিত হন। সতীশচন্দ্র ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অগ্নিগর্ভ স্বদেশী আন্দোলন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসিদ্ধতম স্থপতিরূপে ইতিহাসে স্মরণীয়। উনিশ শতকের গোধূলি ও বিংশ শতকের প্রত্যুষলগ্নে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ প্রয়াসে এক দুর্মরতর প্রসিদ্ধি। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় "The Origin of the National Education Movement" (1957) নামক গবেষণাগ্রন্থ ও অন্যান্য কতিপয় পুস্তিকায় সতীশচন্দ্রের জীবন ও সাধনা

সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। হারাণচন্দ্র চাকলাদারের ভবিষ্যৎ জীবনপথ সতীশচন্দ্রের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

হারাণচন্দ্র চাকলাদার 'National Council of Education, Bengal, etc.' ১ নিবন্ধে লিখেছেন—"From the days of Sri Chaitanya down to the recent past all great movements in Bengal derived their inspiration from religion, and it was generally the man of God, who gave the start, to meet some impending crisis in the affairs of the people." বস্তুতঃ চৈতন্যদেব থেকে ঊনবিংশ শতকের অন্তিমকাল পর্যন্ত এদেশের সর্বপ্রকার জাগরণ ও জাতীয় জীবনের পালাবদলের পিছনে ছিলেন কোন না কোন যুগপ্রবর্তক সন্ন্যাসী। চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বিজয়কৃষ্ণ—এঁদের সকলকেই যুগপ্রবর্তক ঋষি বলা চলে। বিজয়কৃষ্ণের কৃতী শিষ্য বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখের সঙ্গে হারাণচন্দ্র চাকলাদারের নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য। হারাণচন্দ্রের গুরুভ্রাতা ও তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ামক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"I spoke to you other day about National Education and I spoke of a man who had given his life to that work, the man who really organised the National College in Calcutta and that man is a disciple of a Sannyasin, though he lives in the world, he lives like a Sannyasin." স্বদেশী যুগে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রচার ও ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবন প্রয়াসে হারাণচন্দ্র সতীশচন্দ্রের সবাপেক্ষা অনুগামী সহযোগী ছিলেন। এ হিসাবে হারাণচন্দ্রকে বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার গৌরবে অলঙ্কৃত করা চলে। কারণ ন্যাশনাল কাউন্সিলের পরিপূর্ণ রূপ বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। হারাণচন্দ্র আমৃত্যু গার্হস্থ্য জীবনে অবস্থান করেও সন্ন্যাসীর মত জীবন-যাপন করেছেন। গুরুর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে ফলপ্রসূ করার জন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের নবজাগরণের প্রধানতম বীজমন্ত্র হলেও এই শিক্ষা অবিমিশ্র শুভবাদে অভিষিক্ত নয়। বরং এই শিক্ষার উগ্রতম অনুরাগীদের মধ্যে ভারতের মহত্ত্ব ও চিরন্তন সম্পদগুলি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছিল। স্বদেশী যুগের চিন্তানায়করা একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের

১ Jubilee Number : National Council of Education (1956)

প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষাজগতে ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার নৈরাজ্য সতীশচন্দ্রকে পীড়িত করে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বদেশমুখী করার জন্য ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "ভাগবত চতুষ্পাঠী" প্রতিষ্ঠিত হল। এটি সতীশচন্দ্রের সৃজনীমূলক পরিকল্পনা ও সংগঠন-শক্তির প্রাথমিক প্রয়াস। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের আগ্রহাতিশয্য ব্যতিরেকে ভাগবত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়ত বিলম্বিত হত। বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত দূর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ভাগবত চতুষ্পাঠীর আচার্য ছিলেন। ভাগবত চতুষ্পাঠী প্রাচীন হিন্দু আদর্শের গুরুগৃহবাস বা আশ্রমের মত আবাসিক শিক্ষানিকেতন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা পরিপূরণের জন্য এই চতুষ্পাঠীতে একদিকে যেমন ধর্মীয় ও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল—তেমনই পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতিও সমাদৃত হয়। সতীশচন্দ্রের অনুগামী হারাণচন্দ্র চাকলাদার ভাগবত চতুষ্পাঠীর আবাসিক ছাত্ররূপে দূর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের কাছে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য ও হিন্দু শাস্ত্রাদি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। (সে সময় হারাণচন্দ্র জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে [স্কটিশচার্চ কলেজ] বি, এ অনার্স ক্লাসের ছাত্র)। অচিরকাল মধ্যে সতীশচন্দ্র ভাগবত চতুষ্পাঠীর মুখপত্রস্বরূপ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'ডন' (The Dawn) পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদক স্বয়ং সতীশচন্দ্র। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুষ্টি ও পরিবর্ধনে 'ডনের' ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৭-১৯১৩ ষোল বৎসর কাল 'ডন' সতীশচন্দ্রের সুযোগ্য সম্পাদনায় পরিচালিত হয়। ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-অর্থনীতি-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্ব-ভূগোল-শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ক সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধাদি প্রকাশের দ্বারা 'ডন' বিংশ শতকের উষালগ্নে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বার্তা-বাহীরূপে দেখা দেয়। বস্তুতঃ 'ডন' পত্রিকার প্রকাশ সতীশচন্দ্রের জীবনের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। সে যুগের যে সব লেখকসম্প্রদায় 'ডনে'র পৃষ্ঠায় নিয়ত আত্মপ্রকাশ করতেন তাঁদের সকলের নামোল্লেখ বর্তমান ক্ষেত্রে অভিপ্রেত নয়। তৎসত্ত্বেও ভগিনী নিবেদিতা, আনি বেসান্ত, স্বামী অভেদানন্দ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, যদুনাথ সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, স্যার জন বার্ডউড, ম্যাকডোনেল, হ্যাভেল, হারাণচন্দ্র চাকলাদার প্রমুখ কৃতবিদ্য সুধী সমাজের কথা স্মরণ করতে হয়। হারাণচন্দ্র 'ডন' পত্রিকার সূচনাবর্ষে ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী ছাত্ররূপে

স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করেন। সতীশচন্দ্রের অন্যতম অনুগামী ও সহযাত্রী-রূপে প্রথমাবধিই তিনি 'ডন' পত্রিকার লেখক ও একনিষ্ঠ কর্মীরূপে যুক্ত হন। পত্রিকার অবলুপ্তিকাল (নভেম্বর ১৯১৩) পর্যন্ত হারাণচন্দ্র সম্পাদকের সহযোগী ও বিশিষ্ট লেখকরূপে 'ডনে'র সেবায় অনন্যবর্তী থাকেন। ১৮৯৭-১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে ভাস্করানন্দের বেদান্তবিষয়ক রচনা 'স্বরাজসিদ্ধির' ইংরেজী অনুবাদ টীকা-টিপ্পনীসহ 'ডন' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ছিলেন হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও কেদারনাথ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। স্পষ্ট বোঝা যায়, পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে হারাণচন্দ্র 'ডনের' লেখকশ্রেণীভুক্ত হন। 'ডন' পত্রিকার সম্পাদনায় হারাণচন্দ্র ছয় বৎসর কাল (জুন ১৮৯৯ জুলাই ১৯০৪) জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যাণ্টরূপে সম্পাদক সতীশচন্দ্রকে সাহায্য করেন।২

১৯০২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হল 'ডন সোসাইটি'। এ কৃতিত্বও সতীশচন্দ্রের। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'ডন' পত্রিকা 'ডন সোসাইটি'র মুখপত্রে পরিণত হয়। পত্রিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ এতাবৎ 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র ছাত্রবৃন্দের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করা হত। এই সময়ে এই নিয়ম তিরোহিত হয়। গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্র পূর্বের মত হারাণচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে থাকেন। 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাণচন্দ্র সোসাইটির সার্বিক কল্যাণবিধানে সহযোগী হস্ত প্রসারিত করেন। সোসাইটির ম্যাগাজিনে এই পর্বে হারাণচন্দ্রের বহু জ্ঞানগভ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে হারাণচন্দ্র সোসাইটির মুখপত্র 'ডন' ম্যাগাজিনের সহযোগী সম্পাদকের গৌরব অর্জন করেন।৩ সোসাইটির শিক্ষণবিভাগে হারাণচন্দ্র ছিলেন অন্যতম অধ্যাপক।৪ অধিকন্তু হারাণচন্দ্র সোসাইটি-সম্পাদক সতীশচন্দ্রের সারস্বত চিন্তার সহকারী সচিবের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। এবম্বিধ ক্রিয়াকর্মের বাইরেও হারাণচন্দ্র সোসাইটির সাধারণ বিভাগের কাজকর্ম, হিসাব পরীক্ষা, শিল্পবিভাগের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বহুধাকর্মধারায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। সোসাইটিতে সতীশচন্দ্রের inner circle-এ হারাণচন্দ্র গণনীয় প্রতিনিধি।

২ Origin of the National Education Movement, 1957, P. 220

৩ Abstracts of the Accounts of the Dawn Society, July, 1905, Pt. IV, P. 8

৪ The Dawn, July, 1903

বাঙলার গৌরবদীপ্ত এই স্বদেশীযুগে দেশনেতৃগণ বিলাতি পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের পুনঃপ্রচার প্রয়াসে যে গণজাগরণের সূচনা করেছিলেন—সে ক্ষেত্রে 'ডন সোসাইটি'র ভূমিকা নগণ্য ছিল না। সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশী স্টোর' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হারাণচন্দ্র ও কিশোরীমোহন গুপ্ত 'স্বদেশী ভাণ্ডার' পরিচালনায় অশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। স্বদেশ আত্মার চিন্ময় মূর্তিকে জনমানসে প্রত্যক্ষ করে তোলা এবং জাতীয় শিক্ষার মর্মবাণী দ্বারা ইংরেজী শিক্ষার নৈরাজ্য দূরীভূত করার কাজে 'ডন সোসাইটি'র সর্বাত্মক প্রয়াস স্বদেশী আন্দোলনের এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। 'To love the country one must know the country' এটাই ছিল মুখপত্র 'ডনের' ঘোষিত বাণী। হারাণচন্দ্র ডন সোসাইটিতে বহিরাগত সদস্য ছিলেন—কখনই ছাত্র-সদস্য ছিলেন না। স্বদেশ-সাধনার এই গৌরবদীপ্ত কর্মযজ্ঞে হারাণচন্দ্রের নিঃস্বার্থ সেবা-নিষ্ঠা ও সততা বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"Among the workers of the Dawn Society who played a valuable role in this education movement prominent were Haran Chandra Chakladar, Radhakumud Mukherjee, Kishorimohan Gupta, Rabindranarayan Ghose and Benoy Kumar Sarkar who addressed themselves to the cause of education."

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রলয়ঙ্কর স্বদেশী আন্দোলনের কালে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শেষ পরিণতিতে এসে উপস্থিত হয়। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন আমাদের স্বরাজ-সিদ্ধির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে জাতীয় শিক্ষার দাবী দানা বেঁধে উঠলেও শেষ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ঝটিকাক্ষুব্ধ বঙ্গভঙ্গের যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আমাদের এই জাগৃতি ও জাতীয়তার পদসঞ্চারণের ইতিহাসে রাজনৈতিক চেতনার মত জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাজনৈতিক মুক্তিচেতনার ক্ষেত্রে অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল যেমন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব—জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র তেমনই প্রধানতম নায়ক। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সতীশচন্দ্রের জীবনের মহত্তম কীর্তি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে 'ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশন' স্থাপিত হল। বাঙালীর হৃদয়ে ইচ্ছার যে যজ্ঞহুতাশন জ্বলে উঠেছিল—সেই অগ্নিশিখা হতে দিব্যপুরুষ এলেন উঠে—এতদিনে শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব ঘুচল। এই বৎসরের ১৪ আগস্ট তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের

পরিচালনায় স্থাপিত হল, "বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল"। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ঘোষ। তত্ত্বাবধায়ক হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬) ডন সোসাইটির সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রসিদ্ধ অভিভাষণে প্রাসঙ্গিক ভাবে বলেছিলেন, "আজ আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা চলিতেছে, সতীশবাবু তাহার একটি মুখ্য অবলম্বন। তাঁহার উৎসাহেই ইহা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে ডন সোসাইটি জড়িত রহিয়াছে একথা বলা যাইতে পারে। এতদিন সভাসমিতিতে ঝড়ের মুখে যাঁহারা তরণী চালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা এখন উহাকে ঘাটের মুখে আনিয়াছেন বলা যাইতে পারে।" ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 'ডন সোসাইটির' যবনিকা ঘোষণা করা হয়। ডন ম্যাগাজিন অতঃপর সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাতীয়তাবাদ বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর বা শেষ সংখ্যা পর্যন্ত ডন স্বদেশী আন্দোলনের প্রধানতম বার্তাবাহীরূপে জাতীয় মানসকে নবচেতনায় বহ্নিমান করে তোলে। এই পর্বে হারাণচন্দ্র চাকলাদার অগ্নিশুদ্ধ সৈনিকের মত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। ব্যক্তিজীবনের সর্বপ্রকার স্বার্থের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন। এম, এ পাশ করার পর হারাণচন্দ্র কিছুকাল আদর্শ গৃহশিক্ষকের কাজ করেন। পরে সতীশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় হারাণচন্দ্র কোলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসে একটি সরকারী চাকুরি লাভ করেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হারাণচন্দ্র সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং পুরাপুরি শিক্ষা পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার সতীশচন্দ্র তাঁর অনুগামিগণকে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস' ও 'বৃহত্তর ভারত' সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার কাজে অনুপ্রেরণা দিলেন। প্রথমাবধি 'ডন' স্বাজাত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য ইতিহাসচর্চাকে সাতিশয় গুরুত্ব আরোপ করে। জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয়ে হারাণচন্দ্র শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অধ্যাপনাকর্মেই নিজেকে সীমিত রাখেননি। সতীশচন্দ্রের সাহিত্যশিষ্য হারাণচন্দ্র এই সময়ে 'ডন' পত্রিকায় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ গবেষণামূলক বহু মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সন্ধান দেন। এতদ্ব্যতীত হারাণচন্দ্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহকারী সম্পাদক, জাতীয়

কলেজ ও বিদ্যালয়ের সহতত্ত্বাবধায়ক এবং কলেজের যন্ত্রবিদ্যা বিভাগে তত্ত্বাবধায়করূপে শিক্ষা পরিষদের সার্বিক উন্নয়নে ওতঃপ্রোত থাকেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বহুধা কর্মযজ্ঞে হারাণচন্দ্রের সবিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ শিক্ষা পরিষদের রিপোর্টেও প্রত্যক্ষ করা যায় (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। শিক্ষা পরিষদের যুগ্মসম্পাদক আশুতোষ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ রিপোর্ট লিখেছেন —"In the matter of organisation he has been the right hand man of the Principal and Superintendent and the rapid advance which the College has been able to make in matter of organisation in the course of a year and half may be said to have been due mainly to the untiring energy and the skilled assistance of Babu Haran Chandra Chakladar."[৫] জাতীয় শিক্ষা পরিষদে হারাণচন্দ্রের বিশেষ ভূমিকার কথা 'ডন' পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় বর্ণিত আছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'ডন ম্যাগাজিন' 'Bengal National College, Technical Department' শীর্ষক নিবন্ধে হারাণচন্দ্র সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে যা লেখা হয়েছিল বর্তমান প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃতিযোগ্য—"He is the Assistant Secretary of the National Council, the Assistant Superintendent of the College, and the Superintendent of the Technical Department. He enjoys the confidence of all his superiors both as an organiser and as a lecturer: and has distinguished himself by his self sacrifice by leaving Govt. service where he was earning double his present pay. Under his able management the Technical Department is found to grow and prosper."[৬] যে তীব্র স্বদেশপ্রেম, অমিত উদ্যম এবং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দ্বারা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় কলেজের শুভ জয়যাত্রা সম্ভব হয়েছিল —১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই থেকে তা স্তিমিত হয়ে আসে, অর্থসংকট, কর্মীদের উপর রাজনৈতিক পীড়ন, কার্যনির্বাহক সমিতিতে মতপার্থক্য,—সর্বোপরি জাতীয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক অরবিন্দ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত দেশপূজ্য নেতৃদ্বয় আভ্যন্তরীণ কারণে অবসরগ্রহণে বাধ্য হওয়ায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কেন্দ্রশক্তিতে অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। ফলতঃ ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে বহু কীর্তিমান অধ্যাপক ও পদস্থ কর্মচারী জাতীয়

৫ N. C. e's Calendar for 1905—1908 (Appendix. C. P. 17)

৬ The Dawn Magazine, January—1909

বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেন। উদারচরিত্র হারাণচন্দ্র আদর্শরক্ষাকল্পে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। গুরুভ্রাতা সতীশচন্দ্রের শিক্ষাসাহচর্য ও পথনির্দেশে হারাণচন্দ্র বাঙলার প্রজ্জ্বলন্ত স্বদেশী আন্দোলনের যুগপুরুষরূপে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ৩৬ বৎসরের এই জীবনপর্বে আদর্শ শিক্ষক ও সারস্বত সাধকের সর্ববিধ গুণালঙ্কারে ভূষিত হয়ে তিনি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে উন্মুখ হলেন।

হারাণচন্দ্র চাকলাদারের জীবনে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হল। জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করে হারাণচন্দ্র শিবপুর এইচ, ই, স্কুলে (দীনবন্ধু হাই স্কুলে) দুই বৎসরকাল প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর কোলকাতা রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) (১৯১৩-১৫ খৃঃ), বিহার ন্যাশনাল কলেজে (১৯১০-১৭ খৃঃ) এবং পুনরায় রিপন কলেজে ১৯১৭-১৮ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ঠিক এই সময় (১৯১৯ খৃঃ) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সারস্বতযজ্ঞে হারাণচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক মৌলিক গবেষণাক্ষেত্রে যে অদৃষ্টপূর্ব প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর রাখেন পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষের কাছে তা অবিদিত ছিল না। স্যার আশুতোষ এই মুহূর্তে হারাণচন্দ্র চাকলাদারকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। বিভাগ প্রবর্তনের আগেই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হারাণচন্দ্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নৃতত্ত্ব' বিভাগ প্রবর্তিত হলে হারাণচন্দ্র নৃতত্ত্বের অধ্যাপক হন। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ তখন নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নৃতত্ত্ব' শাখার বিভাগীয় প্রধানরূপে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বাহ্যতঃ তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটলেও গবেষণামূলক সারস্বত কর্মে তাঁর বিরাম ছিল না। অবসর গ্রহণের পর হারাণচন্দ্র ২০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন—এই সময়ে তিনি বহু দুরূহ গবেষণাসাপেক্ষ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তাঁর ছাত্র ও অনুরক্তগণের অনেকেই তাঁকে জ্ঞানযোগীরূপে প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হতেন। শেষজীবনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, তৎসত্ত্বেও এই সময়ে তিনি গুরুমুখী ভাষায় রচিত শিখজাতির সুবৃহৎ ধর্মগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী'র বঙ্গানুবাদ ও সটীক ব্যাখ্যা পরিসমাপ্ত করেন। নিরলস অধ্যয়ন ও

গবেষণা ব্যতিরেকেও হারাণচন্দ্রের সুগভীর অধ্যাত্মপিপাসা তাঁর চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। জীবনের প্রারম্ভে যুগপ্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গুরুর নির্দেশিত পথে তিনি পরিক্রমণ করেছেন। আরও আলোর পিপাসায় উদ্বেল হারাণচন্দ্র পরমপুরুষের সাধনায় আত্মমগ্ন হন। এই সময়ে তাঁর সদ্গুরু প্রতিষ্ঠিত পুরীর বিজয়কৃষ্ণ মঠের পরিচালনাভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এইপ্রকার বহুধা কর্মধারায় আত্মনিমগ্ন হারাণচন্দ্র চাকলাদার ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি (৫ মাঘ, ১৩৬৪) রবিবার দিব্যধামে গমন করেন।

সুপণ্ডিত, গবেষক ও সারস্বত সাধক হারাণচন্দ্র চাকলাদার বাঙলার বিদ্বৎ-সমাজে একটি বিরলতম নাম। স্বদেশপ্রেম তাঁর সর্ববিধ সারস্বত কর্মের উৎস। কিন্তু স্বদেশপ্রেমসিঞ্চিত তাঁর বিপুল সাহিত্যকীর্তি অন্ধ আবেগরঞ্জিত নয়। প্রগাঢ় প্রজ্ঞা ও তত্ত্বসমৃদ্ধ তাঁর রচনারাশি যুবক বাঙলার চিত্তে নব নব চিন্তার বহ্নিদীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল। যদিচ প্রাচীন ভারত ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্তের চর্চা ও নৃবিজ্ঞানীরূপে তাঁর সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি—তথাপি আধুনিক ভারত সম্বন্ধেও তাঁর অধিকার ছিল অসামান্য। রাজনীতি-শিল্পকলা, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যেও হারাণচন্দ্রের পরিশীলিত রচনারাজি আমাদের মানস ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর সারস্বত সাধনার বিশদ বিবরণ বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে একপ্রকার অসম্ভব। ডন পত্রিকার আসরে হারাণচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার সূচনা। এবিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। 'ডনে' প্রকাশিত তাঁর সমগ্র রচনা সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ হলে কয়েক খণ্ড বৃহদাকার গ্রন্থের অবয়ব পাবে। এই সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক ভাবনার ফলশ্রুতিস্বরূপ যেসব নিবন্ধ 'ডনের' পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মার্গপ্রদর্শকরূপে অভিহিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ" প্রবর্তিত হওয়ার বহুপূর্বে ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষণ পরিষদে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চার গোড়াপত্তন হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ' প্রবর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের মুখপত্র 'ডনে' ইতিহাস সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-অর্থনীতি-শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,

বিনয়কুমার সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবৃন্দ। 'ডনে' প্রকাশিত হারাণচন্দ্রের Maritime Activity and Enterprise in Ancient India : Intercourse and trade by sea with China (মে ১৯১০, মার্চ ১৯১২) Shipbuilding and Maritime Activity in Bengal, (সেপ্টেম্বর ১৯১০, সেপ্টেম্বর ১৯১১) দীর্ঘ গবেষণা-মূলক প্রস্তাব দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্বৎসমাজে আলোড়ন দেখা দেয়। নরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত নিবন্ধ 'Indian Mirror' সম্পাদকীয় "Shipbuilding and Navigation" শীর্ষক আলোচনায় লেখেন—"The writer Babu Haran Chandra Chakladar M A. deserves much credit for his laborious researches and the Indian public ought to be deeply grateful to him for giving it the result of his labours. we wish all graduates of the Calcutta University could take a leaf out of the book of this enterprising writer and direct their attention to useful antiquarian researches which are likely to bring into view the lost and forgotten chapters of Indian history." (Indian Mirror. 5 6. 1910)। হারাণচন্দ্রের উপরোক্ত গবেষণা নিয়ে 'ডন' ম্যাগাজিনে (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১১) বিধুশেখর শাস্ত্রী ও হারাণচন্দ্রের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। বৃহত্তর ভারত বিষয়ক ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় অন্যতম স্মরণীয় নাম। যদিচ তার "হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান শিপবিল্ডিং অ্যাণ্ড ম্যারিটাইম অ্যাক্টিভিটি" নামক আলোচনা পুস্তক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরী থেকে প্রকাশিত হয় তথাপি এক্ষেত্রে হারাণচন্দ্রের অপরাপর কয়েকটি নিবন্ধের মধ্যে : (1) Fifty years ago : The woes of class of Bengal Peasantry under European Indigo Planters (July. 1905), (2) Bengali as spoken by Bengalis (Sept. 1904—Jan. 1906), (3) Darkest India (March 1905), (4) Babu Dinesh Chandra Sen's History of Bengali Literature and Language (July-Aug. 1913), (5) Cottage Industries and Manufacturing Industries for India (Aug. 1910) প্রভৃতি নিবন্ধগুলি স্মরণীয়। বিজয়কৃষ্ণের মুখনিসৃতবাণী, From the Lips of a Saint' 'ডন' পত্রিকায় ধারাবাহিক (মার্চ ১৮৯৮—জানুয়ারি ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। অনুবাদক হারাণচন্দ্র ছাড়া অপর দুইজনের নাম সুধীরচন্দ্র মিত্র ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। বস্তুতঃ 'ডনে'র পৃষ্ঠায় হারাণচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য ও মনন-

শীলতার পূর্ণচ্ছবি প্রকটিত হয়ে ওঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শতধাশাখায় তাঁর বহুচারিতা প্রত্যক্ষবৎ হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা জীবনে তাঁর গবেষণালব্ধ অপরাপর বিশদ নিবন্ধাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়ে তাঁর বহুবিধ প্রাচীন ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ 'জার্নাল অব দি ডিপার্টমেণ্ট অফ লেটার্স, জার্নাল অব দি বেহার অ্যাণ্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ম্যান ইন ইণ্ডিয়া অ্যানটিকোয়ারি, কালচারাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ম্যান ইন ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত, "প্রিহিস্টরিক কালচার অব ইণ্ডিয়া" ভারতের প্রাগ-ইতিহাস বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গবেষণা পত্র। 'ইণ্ডিয়ান অ্যানটিকোয়ারি' (১৯২২) হেরম্যান ওল্ডেনবুর্গের মূল জার্মান থেকে হারাণচন্দ্র কৃত ইংরেজী রূপান্তর "অন দি হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ান কাস্ট সিস্টেম" নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি গণনীয় সারস্বত কীর্তি।

প্রকাশিত গ্রন্থ

১। The First Outlines of Systematic Anthropology of Asia (1921)
(জুফ্রিদা রুজ্জেরি রচিত মূল ইতালীয় ভাষা থেকে অনুবাদ)

২। Studiés of the Kamasutra of Batsyayan (1925)

৩। Aryan Occupation in Eastern India in Farly Vedic Times. Printed in Part, 1925, 2nd Edn. Edited by Prof. N. K. Bose. (1952)

৪। Social Life in Ancient India (1929)

৫। Problems of the Racail Composition of the Indian Peoples (1936)

৬। The Geography of Kalidasa (1953)
(মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে মুদ্রিত)

৭। (১) শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী, ১ম খণ্ড (১৩৬৪)
(২) ঐ ২য় খণ্ড (১৩৬৫)
(৩) ঐ ৩য় খণ্ড (?)
(৪) ঐ ৪র্থ খণ্ড (?)
(৫) ঐ ৫ম খণ্ড (১৩৫৬)

হারাণচন্দ্রের গবেষণার বৈশিষ্ট্য ছিল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান। পরিপক্কতা ও সত্য নিরূপণে আত্যন্তিক নিষ্ঠা তাঁর রচনারাজিকে অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত করেছে। জটিল বিষয়ের গ্রন্থি উন্মোচন ব্যতিরেকে তাঁর আনন্দ ছিল না। জীবনচর্চার মত সারস্বত চর্চাতেও Perfection ছিল তার মূল মন্ত্র। বিজয়কৃষ্ণ সতীশচন্দ্রকে একবার বলেছিলেন, "দেরি হোক তাতে ক্ষতি নাই, নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন লেখা প্রকাশ করো না।" হারাণচন্দ্র নিজ জীবনে এই মন্ত্র চরিতার্থ করে তোলেন। বস্তুতঃ বিগত শতকের বাঙলা তথা ভারতবর্ষে বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ রূপে হারাণচন্দ্র শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডন সোসাইটি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন প্রয়াসে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা ভবানীপুরে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে হারাণচন্দ্র আর্ট সেকশনের দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীবনে তিনি "এশিয়াটিক সোসাইটি"র কর্মকাণ্ডের সহিত যুক্ত হন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে নৃতত্ত্ব বিভাগে কয়েক বৎসর সম্পাদকের গুরুভার বহন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে নৃতত্ত্ব বিভাগে সভাপতিত্ব করেন হারাণচন্দ্র। সভাপতিরূপে প্রদত্ত "Problem of the Racial Composition of the Indian Peoples"৭ নৃতত্ত্ব বিষয়ক জটিল বিষয়ে তাঁর মনোমত ও জ্ঞানগর্ভ প্রতিবেদন নৃতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে। হারাণচন্দ্রের সারস্বত কর্মের গরিষ্ঠ অংশ ইংরেজী ভাষায় বিবৃত।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে হারাণচন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদান 'শ্রীশ্রীগুরু-গ্রন্থ সাহিবজী'। বিপুলায়তন 'গুরুগ্রন্থ সাহিবজী' শিখজাতির ধর্মগ্রন্থ। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই গ্রন্থকে নিত্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর শিষ্যবর্গের কাছে এই গ্রন্থপাঠকে স্বাধ্যায়রূপে গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। তাঁর উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর শিষ্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত ও কিরণচাঁদ দরবেশ এই ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষের সহিত বাঙালী পাঠক সমাজের পরিচয় ঘটিয়েছেন। যদিও আদিগ্রন্থের ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ অনেক আগে সম্পন্ন হয়েছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হারাণচন্দ্রই সর্বপ্রথম সম্পন্ন করেন। শ্রীশ্রীগ্রন্থ সাহিবজী সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা নিবেদন করা প্রয়োজন।

শিখ ধর্মের পঞ্চম গুরু অর্জুন দেব ১৫৮১-১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ

৭ Man in India, July-Sept. 1961

সাহিবজী'র সংকলন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের সর্বপ্রকার সাহায্য ও আনুকূল্যে জার্মান মিশনারি আর্নেস্ট ট্রাম্প গ্রন্থ সাহিবের ইংরেজী রূপান্তরকরণের কাজে হাত দেন, কিন্তু তাঁর প্রয়াস অসম্পূর্ণ থাকে। পরবর্তী কালে শিখ সমিতির অনুরোধে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্ আর্থার ম্যাকলিফ গ্রন্থ সাহিবের ইংরেজী তর্জমা আরম্ভ করেন। প্রায় কুড়ি বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ম্যাকলিফ বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ 'দি শিখ রিলিজিয়ন' প্রকাশ করেন। কিন্তু এ গ্রন্থে মূলতঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রাধান্য। আরও পরে ফরিদকোট রাজার আগ্রহাতিশয্যে শিখধর্মবেত্তাগণের সমবেত প্রচেষ্টায় গুরুমুখী ভাষায় গ্রন্থ সাহিবের বিস্তৃত ও প্রামাণ্য গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থই ফরিদকোট সংস্করণ নামে প্রসিদ্ধ। এটিই সর্বাপেক্ষা বিপুলায়তন গ্রন্থ।

হারাণচন্দ্র গুরু বিজয়কৃষ্ণের উপদেশাবলীর যথার্থ অনুধাবন করে গুরুমুখী ভাষায় রচিত এই বিশাল ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করে গুরুর অব্যক্ত বাণীকে পরিপূর্ণতা দানে কৃতসংকল্প হন। বহুভাষাবিদ হারাণচন্দ্র ফরিদকোট সংস্করণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত না থাকায় প্রথমতঃ তিনি ম্যাক্লিফ-কৃত 'দি শিখ রিলিজিয়ন' গ্রন্থের অনুবাদে হাত দেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছয় খণ্ডে এই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এ বৎসর হারাণচন্দ্র কাশীতে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সেখানে বিজয়কৃষ্ণের প্রশিষ্য প্রভাতচন্দ্র দাঁ এম, এ, বি, এল, মহাশয় সতীশচন্দ্র ও হারাণচন্দ্রের দৈহিক সেবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। হারাণচন্দ্র প্রভাতচন্দ্রের নিকট ফরিদকোট সংস্করণের সন্ধান পেয়ে তাঁর সহায়তায় নব উদ্যমে গুরুমুখী ভাষা থেকে ফরিদকোট সংস্করণের অনুবাদ শুরু করেন। এজন্য তিনি আগস্ট ১৯৪৫ জানুয়ারি থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কাশীতে প্রভাতচন্দ্রের বাসভবনে অবস্থান করেন। আমৃত্যু তিনি এই ফরিদকোট সংস্করণের অনুবাদকর্মে নিবিষ্টমনা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুবাদের যে পাণ্ডুলিপি তিনি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তার মুদ্রিতরূপ ১৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ হতে পারে। এই আকর ধর্মগ্রন্থের প্রকাশক হারাণচন্দ্রের খুড়তুত ভ্রাতা অধুনা বহরমপুর গঞ্জাম নিবাসী কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার। সটীক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজীর ৫টি খণ্ড এতাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের মুদ্রিতরূপ অনুবাদক হারাণচন্দ্র মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য

লাভ করেছিলেন। গ্রন্থের প্রকাশক কবিরাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন এই বৃহৎ পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ মুদ্রণ বহুলব্যয়সাপেক্ষ। তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশনকাজ সম্পূর্ণ হবে কিনা এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর সাধনায় হারাণচন্দ্র দুরূহ গুরুমুখী ভাষায় বিধৃত শিখধর্মের এই আকরগ্রন্থ বঙ্গভাণ্ডারে উপহার দিয়ে গিয়েছেন। এইরূপ আয়াসসাধ্য অনুবাদকর্মে তিনি যে পরিশ্রম নিষ্ঠা ও সুগভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন তাকে ঋষির তপস্যা বলা চলে। সন্ন্যাসীর শিষ্যেরাই যুগে যুগে এমন অসাধ্য সাধন করেন। 'শ্রীশ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবজী' হারাণচন্দ্রের কঠোর তপস্যার ফল। আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ধর্মগ্রন্থকে পাঞ্জাব তথা উত্তর ভারতের ঋগ্বেদ বলেছেন। হারাণচন্দ্রকৃত ঐ গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ড সম্বন্ধে সমালোচনাচ্ছলে তিনি লিখেছেন—"A distinguished and erudite professor of the University of the Calcutta Sri Haran Chandra Chakladar, who was an authority on Cultural and Religious History and other aspects of Indian Studies, including Sanskrit, and other Indian religious literature, had, during his retirement, the happy idea of bringing out in Bengali, a complete edition of the entire Gurugrantha in the Bengali character and with Bengali translation and notes. It is a misfortune for the Bengali language and for the Bengali people that he could not live to complete the publication of this translation."[৮]

আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বদেশীযুগে হারাণচন্দ্রের ভূমিকা ছিল "It was like a Encyclopaedist paying the way of the French Revolution." এই হারাণচন্দ্রের জীবন ও সাধনার প্রচেষ্টা রূপরেখা চিত্রণের প্রয়াস বর্তমান নিবন্ধে কথঞ্চিৎ আভাসিত হলেও পর্যাপ্ত নয়। তাঁর বাহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাদের মত একালের অনেকের কাছেই সহজলভ্য নয়। অথচ সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা দিব্যদৃষ্টি না থাকলে হারাণচন্দ্রের মত স্বদেশ-আত্মার মূর্ত বিগ্রহের প্রতি যথোচিত সুবিচার করা যায় না। সেই জাতীয় উন্মাদনার কাহিনীও একালে এক দূরশ্রুত রাগিণীর মত। সন্ন্যাসীর শিষ্য হারাণচন্দ্র আমাদের জাতীয় জাগরণের বহুধা জয়যাত্রার সঙ্গী ও সারথি কিন্তু

---

৮ এই নিবন্ধ রচনায় হারাণচন্দ্রের খুড়তুত ভ্রাতা 'শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী'র প্রকাশক ধর্মরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

একালের যৌবচিত্তে ও জাতিমানসে তাঁর কিঞ্চিৎ স্মৃতিও প্রতিবিম্বিত নয়। তাঁর গ্রন্থসমূহের অনেকগুলিই এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁর বিপুল রচনারাজি আজও ধূলিধূসর, অনেকাংশে অলভ্য পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অথচ সেগুলির সংকলন ও গ্রন্থন অনিবার্য কারণেই দ্রুততর সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এগুলির মধ্যেই তাঁর চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান ও মননের প্রত্যক্ষবৎ প্রতিধ্বনি মেলে। তাঁর যথার্থ অনুরাগীরা অচিরকালমধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করলে বিগত বাঙলার এক বরণীয় সন্তানের যথার্থ স্মৃতিরক্ষা সম্ভব হয়ে উঠবে।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

সংস্কৃত সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও পরিবর্ধন ক্ষেত্রে সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বঙ্গভাষা-সাহিত্যেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দান ন্যূন নয় বরং বলা যেতে পারে অপরিসীম। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাঙলা মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তনের পর বহু প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে প্রচারিত হতে থাকে। এ কাজ এ দেশের পণ্ডিতসমাজ প্রত্যক্ষভাবে বা অন্তরালে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। পণ্ডিতসমাজ প্রবর্তিত সেই সারস্বত কর্মপ্রবাহ আজও অব্যাহত আছে। দুঃখের বিষয় সেই সব পুরাতন অনুবাদ বা অনুবাদক পণ্ডিতদের কথা আমরা মনে রাখিনি। বস্তুতঃ প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ বিগত শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি ঘটান। শুধুমাত্র অনুবাদই নয় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তাৎপর্য বঙ্গভাষায় বিধৃত হওয়ায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক সমাজের কাছে জ্ঞানভাণ্ডারের নব নব দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনই চরিতার্থ করেনি—বহু গ্রন্থের প্রয়োজন ও মূল্য চিরন্তন। একালের শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রায়-বিস্মৃত—দ্রুত বিলোপোন্মুখ এই পণ্ডিত সমাজের কর্মকীর্তির কাহিনী একপ্রকার অজ্ঞাত। তথাপি ঊনবিংশ শতকের প্রথমপর্বের পণ্ডিত সম্প্রদায় ও সংস্কৃত শিক্ষার কিছু কিছু বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড ও এডামসাহেব বহু পূর্বেই গ্রন্থবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ও ব্যক্তিগত প্রয়াসে পণ্ডিত সমাজের জীবনীযুক্ত বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে—তথাপি বাঙলা সাহিত্যে সংস্কৃত পণ্ডিতদের দানের পূর্ণ বিবরণ অদ্যাবধি লিপিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের একজন বিশিষ্ট ও কৃতবিদ্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবন ও কর্মকীর্তি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অধুনা প্রায়-বিস্মৃত। সংস্কৃত সাহিত্যেও শাস্ত্রনিপুণ, নৈয়ায়িক, বৈষ্ণবধর্মের রহস্য ব্যাখ্যাতা এবং সুলেখকরূপে বিগতযুগে তাঁর অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা ছিল। তিরোধানের সুদীর্ঘকাল পরেও বিবিধশাস্ত্রনিষ্ণাত বিশিষ্ট পণ্ডিত ফণিভূষণের জীবনকথা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আলোচিত হয়নি। বিগত ঊনবিংশ শতক থেকে ইংরেজী শিক্ষাভিমান আমাদের জাতীয় সাহিত্য-

সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাবটিকে উত্তেজিত করে এসেছে। দেশীয় শিক্ষা-সাহিত্য ও ধর্মের প্রতি এই অবজ্ঞা আজও তিরোহিত হয়নি—বোধকরি একালের শিক্ষিত সমাজে ফণিভূষণের মত পণ্ডিতের বিস্মৃতির কারণও তাই।

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমা অন্তর্গত তালখড়ী (বর্তমান বাংলাদেশ) গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ, সোমবার, ২৪ জানুয়ারী (১১ই মাঘ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ) তারিখে ফণিভূষণ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ফণিভূষণের পিতা সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য, মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী। ফণিভূষণ পণ্ডিত বংশসম্ভূত। নিজ গৃহেই প্রথম শিক্ষার সূচনা। তিনি প্রথমে পিতৃদেব ও পরে পিতৃব্য মনোরঞ্জন চূড়ামণি মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি কাব্য-অলঙ্কার এবং স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন জ্ঞাতিভ্রাতা কৈলাশ-চন্দ্র স্মৃতিরত্ন বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট। বাল্যকালেই তাঁর অত্যাশ্চর্য-স্মৃতি, মেধা এবং সর্বতন্ত্রী প্রতিভার লক্ষণ স্ফুরিত হয়। এজন্য উচ্চতর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ক্ষীণ স্বাস্থ্য ফণিভূষণকে দূরদেশে যোগ্য শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করা হয়। নিজ বাসভূমি থেকে অদূরবর্তী ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের টোল ছিল। ফণিভূষণের ছাত্রজীবনের বৃহত্তম অংশ অতিবাহিত হয় জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের টোলে। কৃতী অধ্যাপক জানকীনাথের নিকট তিনি নব্যন্যায়, প্রাচীনন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত বিদ্যার সর্বশাখায় বিশেষ করে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। ভারতবর্ষে নবদ্বীপ ন্যায়-চর্চার গুরুস্থান। পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত বাসুদেব সার্বভৌম ও তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির পূর্বেও বঙ্গদেশে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হয়েছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক শ্রীধর ভট্ট ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। প্রশস্তবাদভাষ্যটীকা 'ন্যায় কন্দলী' তাঁর অক্ষয় কীর্তি। মহানৈয়ায়িক শ্রীহর্ষকেও অনেকে গৌড়দেশীয় বলে প্রতিপন্ন করেছেন। একাদশ শতকে রাঢ়দেশে রাজা হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী সিদ্ধলগ্রামবাসী মহামীমাংসক ভট্ট-ভবদেবও ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের বিশিষ্ট পণ্ডিত। রঘুনাথ শিরোমণির প্রায় চারিশত বৎসর পরেও নবদ্বীপ নব্য-ন্যায়চর্চার মহাতীর্থ। ফণিভূষণ নবদ্বীপে অবস্থান করে নব্য-ন্যায় অধ্যয়নে ব্রতী হলেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ও মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন

করে ফণিভূষণ 'তর্করত্ন'ও 'তর্কবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত হন। এখানেই তাঁর ছাত্রব্রতের পরিসমাপ্তি। ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণের যুগে আবির্ভূত হয়েও ফণিভূষণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেননি। 'বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী'র পৌষ (১৩৪৭) গ্রন্থকার শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় জানিয়েছেন—"অল্প বয়সেই ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে এবং কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইহার দ্রুত রচিত সংস্কৃত কবিতা শ্রবণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ইহাকে পুরস্কৃত করেন। কৌড়কদীতে অধ্যয়ন কালে ইনি সহধ্যায়ীদিগকে এবং অন্যান্য ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন।" 'ন্যায় পরিচয়' (২য় সং—১৩৪৭) গ্রন্থের শেষে আত্মপরিচয়মূলক তৎকৃত সংস্কৃত শ্লোকটি বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য—

যুগাষ্ট-দ্ব্যেকবঙ্গা বঙ্গাব্দে (১২৮২) মাসস্যৈকাদশে দিনে।
সোমবারে চতুর্দশ্যাং লগ্নে চ মিথুনে শুভে॥
যশোহর-প্রদেশে যো বিদ্বদ্বিপ্র কুলান্বিতে।
গ্রামে 'তালখড়ি' নাম্নি, ভট্টাচার্য্য—কুলেহভবৎ॥
পিতা সৃষ্টিধরো নাম যস্য বিদ্বান্ মহাতপাঃ।
মাতা চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভুবি যা স্থিতা॥
সরোজবাসিনী পত্নী নিজমুক্ত্যর্থমেব হি।
যৎ কাশীমনয়দ্ বৃদ্ধা পূর্বং পূর্বতপোগুণৈঃ॥
সোহধুনা কলিকাতাস্থো বদ্ধঃ কর্মবশাদহন্।
বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধঃ পাঠয়ামীশ্বরেচ্ছয়া॥
অশক্তেনাপি তেনাত্র নিযুক্তেন যথামতি।
ন্যায়দর্শন-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ কৃতা॥

ছাত্রজীবনে ফণিভূষণ অধ্যাপনাকর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ) তর্কবাগীশ মহাশয় পাবনার (বর্তমান বাংলাদেশ) দর্শন টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে চৌদ্দ বছরকাল তিনি দক্ষতার সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। তাঁর অধ্যাপনা নৈপুণ্যে দর্শন টোলের খ্যাতি বহুব্যাপ্ত হয়। টোলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ঘটে। কৃতবিদ্য শিক্ষক—নব নব চিন্তার উন্মেষক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তিরূপে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ফণিভূষণ কাশীর টীকমানী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। কাশীর অধ্যাপক জীবনে

কেবলমাত্র কলেজের ছাত্র-অধ্যাপনাতেই নয়, গৃহাগত ছাত্রবৃন্দকেও সমভাবে শিক্ষাদানে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। হিন্দুধর্ম-হিন্দুদর্শন ও সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পুণ্যভূমি কাশী। তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনের এই পর্বে কাশীতে তৎকালীন প্রচলিত ধর্মজীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে পড়েন। এখানকার জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে কাশীবাসের আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে বলবতী হয়। টাকমানী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে নয় বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে (জুলাই, শ্রাবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) তর্কবাগীশ মহাশয় কোলকাতার সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে নব্যন্যায় ও সাধারণ দর্শনের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চাকুরীর বন্ধনে বীতস্পৃহ ফণিভূষণ স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের চাকুরীতে ইস্তফা দেন এবং পুনরায় কাশী প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে ও আহ্বানে ফণিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা কর্মে রত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী ফণিভূষণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও সারস্বতচর্চাকে করে নিয়েছিলেন জীবনের ব্রত।

ন্যায়দর্শনের কৃতী ছাত্র ফণিভূষণ; ছাত্রজীবনেই গৌতম ন্যায়সূত্রের বিশুদ্ধ পাঠ সম্বলিত প্রামাণ্য পুস্তকের অভাব তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। পাবনার দর্শনটোলে অধ্যাপনা জীবনে এই অভাব মোচনের বাসনা তাঁর মধ্যে বলবতী হয়। এজন্য তিনি ন্যায়দর্শন বিষয়ে বিধিবদ্ধ গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ন্যায়দর্শন, ষড়দর্শনের অন্যতম দর্শন। মহর্ষি অক্ষপাদ এই দর্শনের প্রবক্তা। অক্ষপাদের অপর নাম গৌতম। ভারতীয় প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্র অতি দুরূহ বলে গ্রথিত। শিষ্য পরম্পরাক্রমে গৌতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের সারগর্ভ সূত্রগুলি কেবল স্মৃতি সাহায্যেই প্রচারিত ছিল। ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণ পরবর্তীকালে গৌতমকৃত সূত্র সকলের পাঠান্তর কল্পনা করে। কোথাও বা নিজ মতানুকুল ব্যাখ্যা করে, সূত্রগুলির যথার্থ অর্থবোধে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। ন্যায়সূত্রের যথার্থপাঠ ও অর্থ নিরূপনের জন্য বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। বাৎস্যায়ন ভাষ্য গৌতমের ন্যায়সূত্রের বহু পরে রচিত। বাৎস্যায়নের ন্যায় সূত্রের ব্যাখ্যা ও তর্কপ্রণালী বিস্ময়ের বিষয়। যুগান্তকাল ধরে হিন্দু দর্শনের এই বিশিষ্ট শাখাটি পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন মুনি-ঋষিকুল ন্যায় দর্শনের ভাষ্য ও টীকা রচনা করে আমাদের

দর্শন চিন্তাকে করেছেন সমৃদ্ধ। কিন্তু যে কারণে ভারতীয় ন্যায়দর্শনের সূত্রগুলি বিকৃত হয়েছে পূর্বেই তার ইঙ্গিত দিয়েছি। কালদোষে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের বহু অমূল্য সম্পদ লুপ্ত হয়েছে। গৌতম সূত্রের বিশুদ্ধ পাঠ ফণিভূষণের কালে সহজলভ্য ছিল না। এতৎ সত্ত্বেও গৌতম সূত্রের যথাযথ পাঠ নিরূপণ একপ্রকার দুরূহ ও সুনিবিড় অধ্যাবসায় সাপেক্ষ বিবেচনা করেও তর্কবাগীশ মহাশয় এতৎ সম্পর্কিত যাবতীয় মানসিক উৎকণ্ঠা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বকে অঙ্গীকার করে নিয়ে বিশুদ্ধ পাঠ ও অনুবাদসহ গৌতম ন্যায়সূত্রের একখানি সটীক বাঙলা সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সারস্বত কর্মে তাঁকে বহুধা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হ'ল। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইংরেজী বিদ্যার বিন্দু বিসর্গ তাঁর জানা ছিল না। পরন্তু বিভিন্ন পর্যালোচনা দ্বারা মূল বচনের বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় বা বচনের ঐক্যকরণ সংক্রান্ত সর্বাধুনিক পদ্ধতির সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন না। উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পাবনা শহরে অবস্থান করে পুরাতন পুঁথি-পত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তাও সুলভ ছিল না এমতাবস্থায় তর্কবাগীশ মহাশয় মূলতঃ প্রামাণিক ভাষ্য-বার্তিক এবং সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি অবলম্বন করে ন্যায়সূত্রের বিশদ আলোচনায় ব্রতী হন। নিজ বিচারশক্তি ও যুক্তি পদ্ধতিকে সম্বল করে ফণিভূষণ ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনেক দুর্বোধ্য পাঠের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নির্ধারিত পাঠ সমূহ বিভিন্ন পুঁথি এবং নেপাল ও তিব্বত থেকে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থাদির মূল বচনের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিস্ময়ের কথা ঐ সমস্ত আবিষ্কৃত পুঁথি ও বৌদ্ধশাস্ত্র তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্বে কখনও চাক্ষুষ করার সুযোগ পাননি।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় দূর বাঙলার মফঃস্বলে বসে ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের যে বঙ্গানুবাদ, টীকা, টিপ্পনী ও বিশদ ব্যাখ্যা রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন তা আর লোকচক্ষুর অন্তরালে রইল না। তাঁর কৃতী ছাত্র পাবনা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম. এ., বি. এল. কাব্যতীর্থ, সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের ঐ রচনারাজি রায় শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন সম্পাদিত "ব্রহ্মবিদ্যা" (মাসিক), পত্রিকার পৌষ ১৩২০ বঙ্গাব্দ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে লাগল। দুরূহ, বিপুল ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের যথাযথ পাঠ নির্ধারণ ও বাঙলা ভাষ্য রচনার কাজে তিনি যে নিষ্ঠা, সাহস ও প্রগাঢ়

পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলেন অচিরকাল মধ্যে তা বঙ্গদেশের সুধীসমাজ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। কোলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' গুণগ্রাহিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রণী-ভূমিকা নিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত রত্ন এবং পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক, টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম, এ, বি, এল মহাশয়গণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহুশাস্ত্রদর্শী ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'ন্যায়দর্শন' সম্পর্কিত রচনারাজি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করলেন বঙ্গসাহিত্যে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'ন্যায়দর্শন' তাঁর সাহিত্যিক যশোমুকুটের মধ্যে হীরকখণ্ড রূপে চির বিদ্যমান থাকবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই পৃষ্ঠপোষণা ও গুণগ্রাহিতার ফলে তিনি সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) তাঁর ন্যায়দর্শনের ১ম খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় তখন পাবনা দর্শনটোলের অধ্যাপক। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। পাঁচ খণ্ডে বিন্যস্ত, ন্যায়দর্শন, মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহ প্রায় আড়াই সহস্র পৃষ্ঠার এই আকর গ্রন্থের প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। প্রায় বিংশতি বৎসরের অক্লান্ত সাধনা শ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলস্বরূপ দুরূহ ও সুবিশাল সারস্বত কীর্তি 'ন্যায়দর্শন' বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ বঙ্গভাষায় দর্শন চর্চার ইতিহাসে ফণিভূষণ তর্কবাগীশের 'ন্যায়দর্শন' অবিনশ্বর কীর্তি।

বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ আমৃত্যু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেছেন। সরল ও স্বচ্ছন্দ বাঙলায় তিনি হিন্দুশাস্ত্র-হিন্দুদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি বঙ্গভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁর নির্ধারিত 'ন্যায়সূত্র' ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যে'র পাঠ সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীকৃত হওয়ায় 'ন্যায়দর্শনে'র উচ্চতর পঠন পাঠন ক্ষেত্রে পরিষৎ সংস্করণ ন্যায়দর্শন আজও অপরিহার্য। কাশী কুইনস্ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সারস্বত ভবনের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনে নিষ্ণাত পরলোকগত, আর্থার ভিনিস্ ন্যায়দর্শনের ১ম খণ্ড অধ্যয়ন করে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে (১১, জানুয়ারী) গ্রন্থকারকে যা লিখেছিলেন বর্তমান প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"I must thank you for the kind gift of your Nyayadarsana, Volume 1. It is a valuable contribu-

tion to the study of the Vatsyayana bhasya and should receive a hearty welcome for all who are interested in that early and difficult text. In glancing through the volume (and I have not had time to do more than this so far). I have been impressed by your original and most useful tippance wishing you all success with this and the succeeding volumes."১ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় জানিয়েছেন এই পত্রখানিই তাঁর প্রথম ও শেষ প্রশংসা পত্র। তিনি অন্য কাউকে প্রশংসা পত্র দেননি।

ন্যায়দর্শন গ্রন্থরচনায় ফণিভূষণ তাঁর শিক্ষাগুরু জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের শিক্ষা উপদেশ ও অনুপ্রেরণার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এমন কি, তিনি এই গ্রন্থকে গুরুর স্মৃতিরক্ষার অক্ষম প্রয়াসরূপে অভিহিত করেছেন। শিক্ষাগুরুর প্রতি তাঁর এই অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁর চরিত্রকে দান করেছে লোকোত্তর মহিমা। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদী গ্রাম নিবাসী সর্বশাস্ত্র পারদর্শী মহানৈয়ায়িক ৺জানকীনাথ তর্করত্ন বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া যে সমস্ত উপদেশ পাইয়াছিলাম, তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ এবং তাঁহার স্নেহময় আশীর্বাদ মাত্র সম্বল করিয়া আমি এই অসাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত হই। তিনি অনেকদিন পূর্বে স্বর্গত হইয়াছেন। আজ আমি, আমার সেই পিতার ন্যায় প্রতিপালক, এবং প্রথম হইতেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক পরমারাধ্য পরমাশ্রয় স্বর্গত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি। দীন আমি, অযোগ্য আমি, তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে অসমর্থ।"২ আবার এই প্রসঙ্গে পাবনার দর্শনটোলের সম্পাদক সরকারী উকিল, গায়ত্রী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা প্রসন্ননারায়ণ শর্মাচৌধুরীর অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন—"এই প্রসন্ননারায়ণের প্রসন্ন দৃষ্টি ব্যতীত আমার ন্যায় নিঃসহায় অযোগ্য ব্যক্তির কিঞ্চিৎ শাস্ত্রচর্চার কোন আশাই ছিল না। তিনি আমার এই কার্যের মূল সহায়।" এতৎব্যতীত সর্বশাস্ত্রদর্শী শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শান্তিপুরের ভাগবত ব্যাখ্যাতা রাধাবিনোদ গোস্বামী এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রথী-মহারথীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে—পরিষদের পুঁথিশালার পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং প্রধান কর্মচারী রামকমল সিংহের

১ যাদবেশ্বর তর্করত্ন। ন্যায়ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ। অর্চনা, আষাঢ় ১৩২৫

২ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ন্যায়দর্শন। পঞ্চম খণ্ড, নিবেদন পৃঃ ৴০

সহায়তা এবং এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনগুলি মর্মস্পর্শী। "আর এই গ্রন্থের প্রকাশক সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্মচারী. শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহোদয়ের কথা কত বলিব। তিনি এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্য প্রথম হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি কলিকাতায় আসিলে তিনি অনেক সময় আমার নিকট আসিয়াও প্রুফ লইয়া গিয়াছেন। সরলতা ও নিরভিমানতার প্রতিমূর্তি স্বধর্মনিষ্ঠ শ্রীমান রামকমলের ভক্তিময় মধুর ব্যবহার এবং শীঘ্র এই গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য চেষ্টা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।" বস্তুতঃ পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের এবংবিধ বিবৃতি তাঁর সমদর্শিতা উদারতা ও মহানুভবতার নির্দেশক।

প্রথিতযশা অধ্যাপক এবং 'ন্যায়দর্শনে'র বিশ্রুতকীর্তি ভাষ্যকার ফণিভূষণের খ্যাতি ইতিমধ্যে ভারতব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। পাণ্ডিত্য ও মনীষার স্বীকৃতি স্বরূপ তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক ফণিভূষণ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন (১৯২৬ খৃঃ/১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে (সিউড়ী, বীরভূম) তিনি দর্শন শাখায় সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আহ্বানে তিনি 'প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক ফেলোশিপ' বক্তৃতা প্রদান করলেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। এই বক্তৃতামালায় তিনি 'ন্যায়দর্শনের' জটিল গ্রন্থিগুলি অতিশয় সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান। ফলতঃ অবিশেষজ্ঞ দর্শনশাস্ত্রানুরাগী সমাজের কাছে দুরূহ ন্যায়দর্শন হয়ে উঠল উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর এই বক্তৃতামালা 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' (যাদবপুর) কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনাকালে তিনি 'ন্যায়দর্শন' প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থগুলির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দেন—কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দুর্ভাগ্যবশত: ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মূত্রাশয়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সার্জিক্যাল অপারেশনে অনিচ্ছুক ফণিভূষণ দ্রুত কাশীধামে প্রেরিত হন। অবশেষে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে (২৭শে জানুয়ারী) ছেষট্টি বৎসর বয়সে ফণিভূষণ ব্রাহ্মণের চির আকাঙ্ক্ষিত কাশীপ্রাপ্তি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষ হারান সারস্বত সাধনায় নিবেদিত একজন প্রাচীনপন্থী মহাবিদ্বান জ্ঞান সাধককে।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। ন্যায়দর্শন (গৌতম সূত্র) বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১ম খণ্ড (ব. সা. প. ১৩২৪ (২য় সং ১৩৩৬)

২। গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য ২য় খণ্ড (ব সা প. ১৩২৮)

৩। গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৩য় খণ্ড (ব. সা প ১৩৩২)

৪। গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৪র্থ খণ্ড (ব সা. প ১৩৩৩)

৫। গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৫ম খণ্ড (ব. সা. প ১৩৩৬)

৬। ন্যায় পরিচয় (জা. শি. প ১৩৪০, ২য় সং ১৩৪৭)

*৭। ন্যায়সূত্রের বঙ্গানুবাদ।

*৮। উদয়ণাচার্যের ন্যায় বার্ত্তিক (টীকাসহ)

*৯। উদ্যোতকরের ন্যায় বার্তিক (টিপ্পনী সহ)৩

বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত তাঁর নিবন্ধরাজির সংখ্যাও কম নয়। বঙ্গবিদ্যা, হিন্দু (যশোহর), ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বিশ্বকোষ (২য় সং), বঙ্গীয় মহাকোষ ও অন্যান্য বহু পত্র পত্রিকায় তাঁর সারগর্ভ নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৩৬—১৯৪১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে খ্যাত-অখ্যাত বহু পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখেছেন। এই সমস্ত নিবন্ধে তাঁর বিদগ্ধতা, জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির চরম প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ফণিভূষণ সংস্কৃত-বাঙলা সাহিত্য, ভারতীয় দর্শনের চর্চা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণায় তাঁর জীবৎকাল অতিবাহিত করেন। জনসাধারণের প্রকৃতজনোচিত আস্থার ঊর্ধে যে শাশ্বত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আছে তার সন্ধানের চেষ্টায় তিনি জীবন ব্যয়ীত করেন। এই সূত্রে শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, হরিনাম প্রদায়িনী সভা (কাশী) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন

৩ শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গ্রন্থে তারকাচিহ্নিত পুস্তকগুলির কথা উল্লেখ করেছেন—বর্তমান লেখক এই গ্রন্থগুলির সন্ধান পাননি।

তিনি। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে তর্কবাগীশ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচিত হন। ১৩৩৭, ১৩৪১ এবং ১৩৪৪—১৩৪৮ মোট সাত বৎসর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'অষ্টচত্বারিংশ কার্য-বিবরণে, পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।৪

সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন অনেক পণ্ডিতের আধুনিক কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগ থাকে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক নানা আধুনিক প্রচেষ্টার সঙ্গে তার যোগ ছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চিন্তা ও গবেষণা করে সর্বত্র নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় অনেককে বিস্মিত করত। বাৎস্যায়নের ভাষ্যসহ ন্যায়সূত্রের সম্পাদনা ও বাঙলা ব্যাখ্যা তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। এই গ্রন্থে প্রচলিত অশুদ্ধ পাঠের তিনি যেরূপ সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কারের ফলে তার অনেকগুলি আশ্চর্যজনকভাবে সমর্থন লাভ করেছে। এই ধুরন্ধর নৈয়ায়িকের লোকান্তর সংবাদে 'Calcutta Review' পত্রিকা যথার্থই লিখেছিল—"The death of Mahamahopadhya Phanibhusan Tarkabagis, which occured on January 27, 1942, has removed from our midst a Sanskrit scholar of the very first rank, who had combined methods of western research with the depth and thoroughness of learning associated with the ancient seals of Sanskrit culture.

His most enduring work is a translation (with commentary) of the philosophical system of Batsyayan, published in five volumes by the Bangiya Sahitya Parisad.

He had been a teacher in the Department of Sanskrit of this University since 1935.

Pandit Phanibhusan Tarkabagis received the title of Mahamahopadhya in 1926. He had been intimately connected with various learned bodies in Calcutta. His profound knowledge and understanding of Hindu Philosophy won for him the esteem and admiration of all who had the opportunity of coming into his contact.

৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা—১৩৪৯

We offer our sincere condolence of the members of the bereaved family."৫

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ বর্তমান যুগে প্রায়-বিস্মৃত। তাঁর গ্রন্থগুলিও একালে দুষ্প্রাপ্য। তিরোধানের চৌত্রিশ বর্ষ মধ্যেও সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্ত তাঁর নিবন্ধরাজি সংকলনের কোনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়নি। এই সঙ্কট একেবারে অনাশঙ্কিত নয়। তবুও এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও দু একটি আলোকরশ্মির সন্ধান মেলে। শ্রীহেমচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী' প্রণয়ন করেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত-সমাজের উপর তিনি একখানি ব্যাপকতর গ্রন্থ সংকলনের কাজে ব্যাপৃত আছেন। ইতিপূর্বে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনেক সংস্কৃত পণ্ডিতের জীবনীযুক্ত 'বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী' সঙ্কলন করেছিলেন—কিন্তু তা প্রকাশ সৌভাগ্য লাভ করেনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্যসাধক চরিতমালায় অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উপহার দিয়েছেন। সাহিত্য পরিষদের অধুনাতন কর্তৃপক্ষ মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'ন্যায়দর্শন' পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করছেন। এই উপলক্ষে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ফণিভূষণ তর্কবাগীশের জন্মশততম বর্ষ গ্রন্থি উৎসবে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আমাদের অবশ্য কর্তব্য।৬

৫ Calctta Review Feb. 1942

৬ এই নিবন্ধ রচনায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের কৃতী পুত্র সদ্য পরলোকগত অধ্যাপক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য এবং তৎপুত্র শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য বর্তমান লেখককে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ' গ্রন্থ হতেও সাহায্য গ্রহণ করেছি।

যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদার

গত যুগের বাঙলা দেশের অভিনব আত্মজাগরণের কাহিনী জাতীয় ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়। সে কাহিনী আজও প্রেরণা দেয়—হতাশাদীর্ণ জাতিকে নূতন প্রাণমন্ত্রে উজ্জীবিত করে। সেদিনের এই নবজাগরণের পিছনে পশ্চিমের জ্ঞানস্পৃহা উৎসাহসঞ্চার করেছিল—শতাব্দীর সুপ্ত বহ্নিকুণ্ডে চেতনার অগ্নি-উৎসার দেখা দিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তি ও মানবিকতার মন্ত্রে আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথমার্ধ ইটালীয় রেনেসাঁসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সেদিনের ঐ জাতীয় জাগরণ কোন এক ব্যক্তির কৃতিত্বে নয়—বহু মানুষের ঐকান্তিক সাধনায় বাঙালীর শতাব্দীব্যাপী জাগরণ চরিতার্থ হয়ে ওঠে। সে অধ্যায়ে বাঙলাদেশের গতযুগের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের অবদানের কথা নগণ্য নয়। তাঁদের বহুধা বিকীর্ণ নীরব সাধনা বাঙলাদেশের নতুন মানুষ গড়ার ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

বরদাচরণ মজুমদার সেকালের শিক্ষক সমাজের এক অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তিনি ভারতের মহত্ত্বের একটি বড় দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন। অমৃত-লোকের আনন্দরসে তিনি মুগ্ধ ভ্রমরের মত জীবনকে তন্ময় করে রেখেছিলেন। বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক বা সেকালের ছাত্র সমাজের আচার্যরূপে বরদাচরণ ছিলেন অশেষ খ্যাতির অধিকারী। কিন্তু তাঁর যোগসিদ্ধি ও সাধনার কথা বরদাচরণের শিক্ষক খ্যাতিকেও ম্লান করে দিয়েছিল। বরদাচরণ একাধিক ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে সেকালের অগণিত ছাত্র সমাজের মধ্যে অগ্নিসন্দীপন করেছিলেন—তাঁদের ভবিষ্যৎ পথ নিরূপণ করে দিয়ে জাতির আত্মউন্মোচনের শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। বিদ্যালয়ের পুঁথি-পুস্তকের অদ্বিতীয় শিক্ষক বরদাচরণ, আবার অধ্যাত্মবাদ শিক্ষক এবং যোগশিক্ষক ও সাধক ছিলেন বরদাচরণ। গতযুগের কৃতি শিক্ষক সমাজের কর্মকীর্তির অনেক কাহিনী আজও স্মৃতির অতলে। কিন্তু শিক্ষক বরদাচরণ যোগী বরদাচরণ রূপে আজও অনেকের মধ্যে বেঁচে আছেন।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ঊর্মিমুখর বিশ-শতক। যুক্তি-বুদ্ধি ও বস্তুসত্য এ যুগের ধ্রুবপদ। সেখানে অধ্যাত্মমার্গের অলৌকিক কাহিনী সর্বগ্রাহ্য নয়—বরং খানিকটা উপহসিত। তথাপি বিজ্ঞানও, বোধহয় জগৎ ও জীবন রহস্যের

অর্গলরুদ্ধ সব বাতায়নগুলি এখনও উন্মুক্ত করতে পারেনি। তাপস যোগী ও সাধকবৃন্দ এই বৈজ্ঞানিক যুগেও মাঝে মাঝে আমাদের অহঙ্কারের সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে দেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু অজানা ও অচিন রহস্য আজও আমাদের কাছে অন্ধকারের অস্পষ্টতায় অবসিত। গত যুগের বিজ্ঞানের শিক্ষক বরদাচরণ এই রহস্যের মর্মজাল ছিন্ন করেছিলেন। তিনি সাধনাবলে বেদ-উপনিষদ-পুরাণের ঋষিদের মত দিব্য ও জ্যোতির্ময় দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

ইউরোপীয় বিদ্যার সংস্পর্শে এসে গত যুগে আমাদের অভিনব জাগরণ ঘটল —বুদ্ধি-যুক্তি পেল প্রাধান্য, কিন্তু শতকের শেষার্ধে জাগরণের চেতনা হল মন্দীভূত—নেমে এল আবেগের বন্যাবেগ। জাতীয়তা ও হিন্দু ঐতিহ্যের উন্মাদনায় আমরা আবার পিছনে মুখ ফেরালাম। তাই আমাদের এই জাগরণ কারো কারো চোখে হিন্দু জাগরণ। বাস্তবিকই গত শতকের শেষার্ধকে যে সব ভাবতরঙ্গ মথিত করেছিল—তার শীর্ষতম দিক ছিল হিন্দু নব-ধর্মচেতনা— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিজয়কৃষ্ণ প্রবর্তিত নূতন ধর্মজাগরণ। শতাব্দীর অস্তরাগ মুহূর্তে, এই প্রাণ গঙ্গার উবর পলিমাটিতে জন্ম নিলেন যোগী বরদাচরণ মজুমদার।

কাঞ্চনতলা মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসে বরদাচরণের জন্ম হয় এই গ্রামে। বরদাচরণের পৈতৃক ও আদি বাসস্থান কুষ্টিয়া শহরে, কুষ্টিয়া এখন বাঙলাদেশ। তাঁর পিতা দক্ষিণাচরণ মজুমদার মাতা মাতঙ্গিনী দেবী, পিতামাতার একমাত্র সন্তান বরদাচরণ। বরদাচরণের বংশে যোগ সাধনা সিদ্ধিলাভের পুরানো কাহিনী অবিদিত ছিল না—পূর্বপুরুষ-গণের কেউ কেউ তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। বরদাচরণের ঠাকুরদা কুষ্টিয়া থেকে চলে আসেন মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান-কাঞ্চনতলায়। তদবধি তাঁরা মুর্শিদাবাদের অধিবাসী।

বরদাচরণের লেখাপড়া শুরু এই কাঞ্চনতলা গ্রামে। তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হল এই কাঞ্চনতলায়। বহু শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের বাস এই গ্রামে। এখান থেকেই বরদাচরণ এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পড়াশুনায় ছেদ পড়লো কিছুদিনের জন্য। বরদাচরণ কাঞ্চনতলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নিলেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই আবার ছাত্রব্রত গ্রহণ করলেন। চলে এলেন বহরমপুর কলেজে। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ তখন নব্য বাঙলার জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র। কলেজে তখন বাঙলার দিগ্বিজয়ী অধ্যাপকবৃন্দ। বরদাচরণ তাঁদের পদতলে বসে চার বৎসর অধ্যয়ন করে বি, এ পাশ করলেন।

ব্রাহ্মণ বরদাচরণ কৈশোরেই শিক্ষকের বৃত্তিকে বেছে নিয়েছিলেন। সেকালের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি, এ অর্থ-উপার্জনকে চরম করে দেখলে অনেক কিছুই করতে পারতেন। কিন্তু বরদাচরণ মানুষ-গড়ার দায়িত্বকেই ব্রত করে নিলেন। বি, এ পাশ করার পর বরদাচরণ মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা 'এইচ-ই-স্কুলে' সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন—অচিরে উন্নীত হলেন প্রধান শিক্ষকের পদে। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বরদাচরণ অচিরে মুর্শিদাবাদ জেলার জনমানসে আদর্শ শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দলে দলে তরুণ ছাত্রসমাজ এসে তাঁর কাছে পাঠ নিতে লাগল—নূতন জীবনমন্ত্রের বাণী নিয়ে তাঁরা বাঙলার দিকে দিকে তুললো আলোড়ন : তিনি শুধু কেতাবি বিদ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না—ভারত-মহত্ত্বের অধ্যাত্ম ও যোগজীবনের পুণ্যবাণীতে কোন কোন ছাত্রের হৃদয়কে করে তুললেন অধীর।

বরদাচরণ শুধু শিক্ষক নন—নবযুগের ভারত আবিষ্কারক হিসেবে দেখা দিলেন। লালগোলারাজের আহ্বান এসে পৌঁছাল বরদাচরণের কাছে। আবেদন, লালগোলা এস, এন, আকাদেমীতে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন এই বিদ্যামন্দিরে। লালগোলাতে তাঁর পঁচিশ বছর শিক্ষক জীবন অতিবাহিত হ'ল। বরদাচরণ লালগোলাকে কেন্দ্র করে নবযুগের শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হলেন। লালগোলার হেডমাষ্টারের কথা তখন শিক্ষিত বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে। লালগোলাতেই প্রধান শিক্ষক বরদাচরণের আর এক খ্যাতি প্রকাশ পেয়ে গেল—বরদাচরণ 'যোগী ও সাধক' একথা কারো কাছে অজানা রইল না। দেশ বিদেশ থেকে শত শত লোক এসে বরদাচরণের দর্শন কামনা করতো। বরদাচরণ এসব তৃষিত ব্যক্তিদের পথের নিশানা দিয়ে নূতন জীবনের সন্ধান দিতেন। লালগোলার প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ ছাত্রসমাজকে জ্ঞান বিজ্ঞানে যেমন উদ্বুদ্ধ করতেন—তেমনই ভারতের অধ্যাত্মবাদ ও যোগরহস্যের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে ছাত্রসমাজকে করে তুলতেন জাতীয় ঐতিহ্যমুখীন। তাঁর বহু ছাত্রই পরবর্তীকালে দেশের বিপ্লব আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হয়েছিলেন।

বরদাচরণ যখন লালগোলার প্রধান শিক্ষক—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। লালগোলার দানবীর রাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণের বড় ইচ্ছা স্বয়ং উপাচার্য এসে যদি তাঁর বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন, তাহলে বিদ্যালয়ের জৌলুস বাড়ে। সালটা সম্ভবতঃ

১৯২৪। স্যার আশুতোষ সেবারের পুরস্কার বিতরণী সভায় এসেছিলেন—অনেকেই মনে করেছিলেন স্যার আশুতোষ আসছেন কেবলমাত্র পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করতে নয়—দানবীর মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারেও। কিন্তু আশুতোষ তাঁর সভাপতির ভাষণে সকলকেই বিস্মিত করে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি এসেছেন প্রধান শিক্ষক বরদাচরণের প্রতি প্রীতিবশতঃ। সে সভায় স্যার আশুতোষ বরদাচরণের জ্ঞানগভ ও সুললিত ভাষণে অত্যধিক মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তিনি নিজ গলার মালা বরদাচরণের কণ্ঠে পরিয়ে দেন। বরদাচরণের মত কৃতবিদ্য শিক্ষকদের দ্বারা দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি হতে পারে—দেশের শিক্ষা উন্নত হতে পারে—স্যার আশুতোষ সেদিন এই ধারণা নিয়েই ফিরেছিলেন। এমনি করে লালগোলার বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে, শিক্ষক বরদাচরণের যশোগরিমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর বরদাচরণ লালগোলা ছেড়ে এলেন বরাল এইচ-ই-স্কুল-এ। বরদাচরণ এখানেও প্রধান শিক্ষক। তিনি প্রধান শিক্ষক, তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যাপক। এখানেও শিক্ষক বরদাচরণের খ্যাতি অটুট রইল। তাঁর নিপুণ অধ্যাপনা কৌশলে অতি কঠিন তত্ত্বও ছাত্রসমাজের কাছে সহজ-সরল হয়ে উঠত। ছাত্ররা কেবলমাত্র পাশ করবে এটাকে তিনি বড় করে দেখতেন না। তাঁরা কিছু যথার্থ শিক্ষালাভ করবে, বরদাচরণ এদিকেই অধিক গুরুত্ব দিতেন। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়সূচীতে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। সেজন্য তিনি ছাত্রসমাজের কাছেও আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপদেষ্টা রূপে দেখা দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যেই নয়—বিদ্যালয় বহির্ভূত শত শত নরনারী তাঁকে শিক্ষক, গুরু ও আচার্যরূপে বরণ করে নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর সাধনা ও যোগজীবনের কথা এসে যায়। বোধ করি যোগীপ্রবর বরদাচরণের কাহিনী আরও বৃহৎ ও ব্যাপক। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণের প্রথম দিনে শিক্ষক-সাধক ও যোগী বরদাচরণ পরলোকগমন করেন।

যোগী বরদাচরণের কথা আজও অনেকে মনে রেখেছেন—তাঁর সাধক জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী এখনও অনেকে বলে থাকেন। বিশ শতকের ঝটিকাক্ষুব্ধ প্রথম চার দশকে বরদাচরণ অধ্যাত্মশিক্ষক রূপেও পূজনীয়। কিন্তু তিনি ছিলেন গুপ্তযোগী—পরিপূর্ণ গৃহী। তাঁর সাধনজীবনের কথা লোকসমাজে প্রচারিত হোক, এ তিনি চাইতেন না। সর্বসাধারণের কাছ থেকে নিজের যোগশক্তি প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। কিন্তু আগুন চিরকাল ছাইচাপা থাকে না।

তদুপরি বরদাচরণের পরোপকার স্পৃহা ছিল প্রবল—যোগশক্তির দ্বারা সাধারণের উপকার করতে গিয়ে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেননি। বরদাচরণের পিতৃকুলে যোগসাধনার ঐতিহ্য ছিল। তাঁর প্রপিতামহ কুষ্টিয়ার নির্জন নদী-তীরের এক স্থানে সাধনামগ্ন থাকতেন। ছাত্রাবস্থায় বরদাচরণ লোকচক্ষুর অগোচরে নিভৃতে সাধনা করতেন। তাঁর যোগজীবনের কোন গুরু বা দীক্ষাদাতা ছিল না। স্বয়ং আদি-দেবতা যোগীশ্বর শঙ্করের কাছ থেকে তিনি সাধনসঙ্কেত লাভ করেন। একদিন মহানিশায় গঙ্গায় স্নান যোগাদি শেষ করে বরদাচরণ গৃহে ফিরছিলেন—এমন সময় তিনি উর্দ্ধাকাশ থেকে এক বিরাট জ্যোতির্স্তম্ভকে ভূমি পর্যন্ত নেমে আসতে দেখেন—অচিরে এই আলোকরশ্মি থেকে আবির্ভূত হলেন জটাজুটধারী জ্যোতির্ময় শিব এবং চকিতে বরদাচরণকে বক্ষসংলগ্ন করে কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করে দীক্ষা দিলেন—হস্তে দিলেন বিল্বফল। বরদাচরণ এমনই অলৌকিকভাবে স্বয়ং শিবের কাছে মন্ত্রলাভ করলেন! এই অবিশ্বাস্য কাহিনী অন্যান্য সাধকজীবনেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তাঁর মন্ত্রলাভের এমনই এক অলৌকিক কাহিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন—সেখানেও শিব এসে সীতারামকে মন্ত্র দিয়েছেন এবং দেবমূর্তি অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—"And then there shone out a celestial radiance round a circle.", এমনই এক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[১] অধ্যাপক ডক্টর সদানন্দ চক্রবর্তী "Our Master Sri Sri Sitaramdas Omkarnath" (1957) গ্রন্থে সাধকজীবনের এমনই অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ছাত্রজীবন শেষ করে বরদাচরণ শিক্ষকজীবনকে বরণ করলেন,—অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত তিনি সংসারজীবন যাপন করে চললেন। কিন্তু এ সময়েই তাঁর যোগসাধনা দ্রুত পরিপুষ্টিলাভ করে চলল। তাঁর গোপন সাধনায় তিনি উদ্ভাসিত করে তুললেন জন্ম জন্মার্জিত তপস্যাসঞ্চিত এক একটি মণিমঞ্জুষা। তখন ত্রিকাল তাঁর জ্ঞানদৃষ্টির পথে উদ্ভাসিত—সত্যের স্বরূপ দিব্যদ্যুতিতে সতত প্রকাশমান—অনন্ত বিশ্ববৈচিত্র্য যেন তাঁর অক্ষিতারকার মধ্যে নিয়ত বর্তমান। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি ছাত্রদের অধ্যাত্ম সাধনার নির্দেশ দিয়ে চললেন। এমনি করে প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিয়ে এক একটি সাধক-মণ্ডলী গড়ে তুললেন—ভোগ-আসক্তির পারিবারিক পরিস্থিতি এবং বিরোধ-

১ The Road to Life Divine (1951) By Sitaramdas Omkarnath

সঙ্কুল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি নিজ বাসভবনকে সাধনাশ্রমে পরিণত করলেন। অধ্যাত্মবাদ, ভোগবাদ, মায়াবাদ, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, কোন বাদেরই বালাই ছিল না বরদাচরণের মধ্যে। অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে ভগবত সান্নিধ্যের পথে এগিয়ে চলা এবং পরমেশ্বরের পরম পুণ্য-জ্যোতিতে স্নাত হয়ে তাঁর সঙ্গে অভেদাত্ম হওয়াই ছিল বরদাচরণের আদর্শ।

সাধকপ্রবর বরদাচরণের সান্নিধ্য ও নির্দেশ লাভ করে গত যুগের খ্যাত অখ্যাত বহু নরনারী তাঁদের জীবনকে ধন্য করেছিলেন। তার পূর্ণ বিবরণ দান বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বরদাচরণের সেই অলৌকিক জীবন মাহাত্ম্য নিয়ে ও যুগের সাধকজীবনের ভাষ্যকার চরিতকারেরা পৃথক গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। বক্ষ্যমান আলোচনায় বরদাচরণের যোগজীবনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বরদাচরণ প্রসঙ্গ শেষ করবো। বরদাচরণ সে যুগে বহু লোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। প্রবীণ বিপ্লবী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকার বরদাচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি 'যোগী বরদাচরণ' নামক রম্যনিবন্ধে২ বরদাচরণের এই অদ্ভুত কৃতিত্বের কতিপয় নিদর্শন একালের পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন।

কবি নজরুল ইসলামের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বরদাচরণ। বরদাচরণের সংস্পর্শে আসার আগে নজরুল ছিলেন প্রভঞ্জনের মত দুর্বার। সে জীবনে কোন সুসংহত স্থিতি ছিল না। তাঁর বিদ্রোহী কবি-চেতনায় সেদিন সমগ্র বাঙলাদেশ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। দেশের বন্ধনমুক্তির আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠল তাঁর কবিকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে। এমনি সময়ে নজরুল পেলেন নির্মম আঘাত, তাঁর অতি আদরের শিশুসন্তান বুলবুল মারা গেল। অস্থির হয়ে পড়লেন নজরুল, জীবনের শক্তি ও শান্তি যেন কোথায় হারিয়ে গেল। উন্মাদের মত গ্রাম-নগর, মাঠ-প্রান্তর ঘুরলেন শান্তির অন্বেষণে। এই দারুণ দুর্দিনে নিরুপায় নজরুল স্মরণ করলেন বরদাচরণকে। ১৯২৮ সালের এক হিন্দু বিবাহের বরযাত্রী হয়ে নজরুল এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের নিমতিতা গ্রামে। সেখানে তিনি দেখেছিলেন, লালগোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণকে। বরদাচরণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই নজরুলের জীবনে যেন একটা নূতন অধ্যায় সূচিত হোল। নজরুল লিখেছেন—"সেই দিন হইতে আমার বহির্মুখী চিত্ত অন্তরে যেন কাহার অভাব বোধ করিতে লাগিল।"

২ শ্রদ্ধাস্পদেষু (১৩৬৪) নলিনীকান্ত সরকার।

পুত্রশোকাতুর নজরুল লালগোলায় বরদাচরণের কাছে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে নজরুল যা বলেছিলেন, নলিনীকান্তের ভাষায় তা এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য। "সেখানে গিয়ে বরদাচরণকে বললাম, 'শান্তি পাই কিসে?' তিনি এমন কতকগুলি কথা বললেন, যাতে আপনিই মন শান্ত হয়ে গেল। পরে স্থায়ী শান্তিলাভের পন্থাও দেখিয়ে দিলেন। আর একটি নিবেদন করলাম তাঁর কাছে, 'ছেলেটিকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছা হয়। কিন্তু মৃত আত্মা কি পূর্বের স্থূল শরীর ধারণ করে ফিরে আসে?' সস্নেহে বরদাচরণ বললেন, "ছেলেকে দেখতে চাও? বেশ, দেখতে পাবে, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলো না।"

"কাল রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় আমি সাধনার জন্য ধ্যানে বসেছি, তাঁর নির্দেশমত মন্ত্র জপ করেছি—এমন সময় কার পায়ের শব্দ যেন কানে এল। চেয়ে দেখি ঘরের মধ্যে বুলবুল। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার কচি হাত দিয়ে আলমারিটি খুললো; ঐ আলমারিতে সযত্নে রাখা তার পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলনাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে আলমারি বন্ধ করলো। শেষে আমার দিকে চেয়ে তার সেই মিষ্টি হাসিটুকু উপহার দিয়ে বুলবুল আমার ঘর থেকে উড়ে গেল" —নজরুল নিজেও লিখে গেছেন এই কাহিনী 'পথহারার পথ'-এর ভূমিকায়।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার পর নজরুলের সাহিত্যজীবন সম্পূর্ণ নূতন পথে মোড় নিল। পুত্র-শোকাতুর পিতা নজরুল শান্তির সন্ধান পেলেন অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে। সন্ধান দিয়েছিলেন লালগোলার প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদার। নজরুল নিজেও লিখেছেন—"আমার যাহা কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে—কাব্যে, সঙ্গীতে, অধ্যাত্ম-জীবনে, তাহার মূল যিনি, আমি যাঁহার শক্তির প্রকাশের আধার মাত্র, তাঁহাকে জানাইবার আজ আদেশ হইয়াছে বলিয়াই জানাইলাম।"[৩] শ্যামা সঙ্গীত এবং পরবর্তী সমগ্র কাব্যসাধনা বরদাচরণের অধ্যাত্ম মন্ত্রের ফল। নলিনীকান্ত সরকার আর একটি ভিন্ন নিবন্ধে[৪] নজরুলের অধ্যাত্ম সাধনার মর্মগ্রাহী আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নজরুল জীবনের এই পরিবর্তনের মূলে যোগী বরদাচরণের প্রভাব।

বরদাচরণ কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তকগুলি যোগসাধনা বিষয়ক। এগুলি এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। সাধারণের মধ্যে এগুলির তেমন প্রচার

৩ পথহারার পথ (১৩৪৭); বরদাচরণ মজুমদার, নজরুলের ভূমিকা অংশ থেকে।

৪ নজরুলের অধ্যাত্মসাধনা (শারদীয় কথা-সাহিত্য ১৩৪৭)

নেই, রচিত পুস্তক মাত্র তিনখানি। (১) পথহারার পথ (কাঞ্চনতলা—১৩৪৭) (২) দ্বাদশবাণী (কলিকাতা জুন ১৯৪২) (৩) Revealed Twelve (?)। পথহারার পথ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। এই ভূমিকায় তিনি বরদাচরণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বিশদ আলোচনা করেছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তার খানিকটা উদ্ধৃতিযোগ্য—

"আজ আমার বলিতে দ্বিধা নাই, তাঁহারই পথে চলিয়া আমি আমাকে চিনিয়াছি। আমার ব্রহ্ম ক্ষুধা আজও মিটে নাই, কিন্তু সে ক্ষুধা এই জীবনেই মিটিবে, সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে পারিয়াছি। আজও তাহা বলিবার আদেশ পাই নাই। হয়ত আজও তাহা গুছাইয়া বলিতে পারিব না। তবুও কেবল মনে হইতেছে, আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম। তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে আসিলাম।"

"...সারা জীবন ধরিয়া বহু সাধু সন্ন্যাসী যোগী ফকির দরবেশ খুঁজিয়া বেড়াইয়া যাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গেল, আলোক পাইল, তিনি আমাদেরই মত গৃহী। এই গৃহে বসিয়াই তিনি মহাযোগী শিবস্বরূপ হইয়াছেন। বাতায়ণ দিয়াই আসিয়াছে তাঁহার মাঝে ব্রহ্মজ্যোতি। তাঁহার সেই সাধনার ইঙ্গিত এই 'পথহারার পথ'-এ রহিয়াছে।"

বরদাচরণের এই অলৌকিক যোগশক্তির কথা সেকালের সাধনপথের পথিক মাত্রেই অবগত হয়েছিলেন। কেবল নজরুলের জীবনের মোড় ফিরিয়ে বরদাচরণ বিরত থাকেননি। সেকালের কৃতবিদ্য ও বরেণ্য ঋষি অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সুভাষচন্দ্র, দিলীপকুমার রায়, সঙ্গীতসাধক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি অনেকেই বরদাচরণের অলৌকিক যোগশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

পূজ্যপাদ দিলীপকুমার রায়ের অধ্যাত্ম পিপাসা জাগিয়ে তুলেছিলেন বরদাচরণ মজুমদার। যোগশক্তির সাহায্যে তিনি বলে দিয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দ তাঁকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। বরদাচরণ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন একজন নারীর সহযোগিতায় তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি ঘটবে। তাঁর এ উক্তি ব্যর্থ হয়নি। সাধনকালে বরদাচরণ যে সব মহাপুরুষের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণখণ্ডের সাধুবাবা এবং তৎকালীন বারাণসী ধামের লালবাবা ছিলেন প্রধান। দিলীপকুমার লালবাবার

যোগশক্তির কথা বরদাচরণের কাছে শুনেছিলেন—গভীর তৃষ্ণায় বারাণসীতে তাঁর সান্নিধ্য খুঁজেছিলেন। "অঘটন আজও ঘটে" গ্রন্থে দিলীপকুমার লালবাবার বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সে কাহিনী বরদাচরণের স্মৃতি-শ্রদ্ধায় সমুজ্জ্বল।

ঋষি অরবিন্দ বরদাচরণের যোগসাধনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বরদাচরণের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ আত্মসমর্পণের পথে বিচরণ করতে গিয়ে অনেকে ভ্রষ্ট হয়ে ধরাশায়ী হয়েছিলেন। বরদাচরণের "পথহারার পথ" তাঁদের জন্যই লিখিত। বরদাচরণ বারীন ঘোষ প্রমুখ পথভ্রষ্ট সাধকদের আশ্রয়স্থল হয়েছিলেন। দু' একটি অনধিকারী বিশিষ্ট ভক্তকে শ্রীঅরবিন্দ নিজে নির্দেশ দিয়েছেন বরদাচরণের আশ্রয় নিতে। বারীন ঘোষ অরবিন্দ আশ্রম ত্যাগ করে বরদাচরণের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। বরদাচরণের অলৌকিক যোগশক্তির কথা বলতে গিয়ে অমলেন্দু দাসগুপ্ত একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন—বরদাবাবু সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন "The greatest Yogi of Modern Bengal"। পরবর্তীকালে বরদাবাবু সম্বন্ধে সংসারত্যাগী জনসমাজের বাহিরে অবস্থিত সিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষদের অভিমত জানিয়াছি। তাঁহারা বলেন—"বরদা যোগের একটি নূতন পন্থা আবিষ্কারে ব্রতী হইয়াছিল।"৫

বরদাচরণ কোলকাতাতে তাঁর অনুগত এক সাধকমণ্ডলী গড়ে তোলেন। ভবানীপুর ২৫এ, মোহিনীমোহন রোডে, হোমিওপ্যাথি ডাঃ প্রভাসচন্দ্র মল্লিক মহাশয় বরদাচরণের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বরদাচরণ কোলকাতাতে এলে এখানে অবস্থান করতেন। তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী এখানে এসে সাক্ষাৎ করতেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এখানে এসে বরদাচরণের কাছে যোগশিক্ষা নিতেন। তিনি বরদাচরণের আসনে বসে ধ্যানে বসতেন এবং শেষে মুখ লাল করে বেরিয়ে যেতেন, সে সময় কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। অমলেন্দু দাসগুপ্ত নেতাজীর স্মৃতি-রোমন্থন কালে একটি নিবন্ধে লিখেছেন—"নেতাজী ভারত ত্যাগের পূর্বে বরদাবাবুর সহিত মোহিনীমোহন রোডে এবং দ্বিতল নিভৃত কক্ষে যোগে বসিতেন। বরদাবাবু মন্তব্য করেন যে নেতাজী মহাক্ষত্রিয়, যদি তাঁর ব্রাহ্মণ দৃষ্টি খোলে তবে সে অঘটন ঘটাবে।"৬

সঙ্গীতসাধক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন বরদাচরণের সাক্ষাৎ শিষ্য।

৫ দেশ, ৭ই আশ্বিন, ১৩৫৬
৬ আনন্দবাজার, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৪

বরদাচরণ সুরেশচন্দ্রকে যোগবিদ্যা সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। সুরেশচন্দ্র নিজে ছিলেন শ্যামারহস্য প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রণেতা পূর্ণানন্দ গিরির বংশধর। এবং পূর্ণানন্দ ছিলেন তারারহস্য প্রভৃতি বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ রচয়িতা ব্রহ্মানন্দ গিরির শিষ্য। বংশগত ঐতিহ্যে ও প্রকৃতিগত প্রেরণার ফলে সুরেশচন্দ্র আধ্যাত্মিকতার দিকে চিরদিনই উন্মুখ ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গীত সাধনাতে ছিল—আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা—বরদাচরণের অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণা সুরেশচন্দ্রকে করেছিল গভীরভাবে অধ্যাত্মমুখী। "ভারতের ভাতখণ্ডে সুরেশচন্দ্র" নিবন্ধে,[৭] বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সুরেশচন্দ্রের স্মৃতি-রোমন্থন করতে গিয়ে বরদাচরণের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করেছেন। এই তথ্যপূর্ণ নিবন্ধে তিনি লিখেছেন —"সুরেশবাবুর মাধ্যমে আমিও বরদাবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেছিলাম। তাই শুধু সঙ্গীতের দিক থেকে নয়, সাধনার দিক থেকেও সুরেশবাবুকে আমি জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতারূপে দেখে এসেছি।"

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বরদাচরণের পত্রালাপ হোত। বরদাচরণ গান্ধীর অহিংসা তত্ত্বকে তীব্র আক্রমণ করে সমালোচনা করেন। গান্ধী এতৎবিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করবেন এই আশ্বাস দিয়ে বিরত থাকেন। গান্ধী লিখেছিলেন—"He kept Barada Babu's letter with him, evidently with the idea of turning his advice into account." ১৯২১-২২ সালে অহিংসা বিষয় নিয়ে বরদাচরণের সঙ্গে গান্ধীর পত্রালাপ চলে। বরদাচরণ রচিত 'Revealed Twelve' গ্রন্থে এই যোগাযোগের বিবরণ আছে।

শিক্ষক ও যোগী বরদাচরণের চরণধূলি স্পর্শ পেয়ে সেকালের বাঙলাদেশের অগণিত নরনারী তাঁদের জীবনকে ধন্য করেছিল। সাধারণ গৃহীজীবনে থেকেও তিনি লোকত্তর দিব্যজীবনের আলো বিচ্ছুরিত করেছিলেন হতাশাদীর্ণ এই মানুষের সমাজে। সমাজ ও জাতি কোন্ পথে চলবে—এই যখন যুগের প্রশ্ন, তখন তিনি নিজ সাধনশক্তি বলে চিরন্তন ভারতের সত্যসুষমা এনেছিলেন আমাদের মধ্যে। তাঁর এই লোকত্তর ঋষিজীবনের কথা শুধু বাঙলাদেশ কেন—দেশের সীমা অতিক্রম করে দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। জাভা থেকে Dr. Soetema লালগোলায় এসে বরদাচরণের দর্শন কামনা করলেন। ইচ্ছা ছিল বরদাচরণকে Java-র spiritual teacher করবেন। মার্কিন মুলুক থেকে এলেন জারা (Zara) নামে একজন সন্ন্যাসী। তিনি বরদাচরণকে আমেরিকায় নিয়ে যাবেন বলে

৭ অমৃত, ৫ই কার্তিক, ১৩৭২

প্রস্তাব করলেন—বহু অর্থের প্রলোভন দেখালেন—কিন্তু গৃহী-যোগী বরদাচরণকে এসবের কিছুই আকৃষ্ট করেনি। তাঁর সান্নিধ্যধন্য ও শিষ্যকল্প অনেক ব্যক্তি আজও জীবিত আছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে এখনও বরদাচরণের নানা অলৌকিক দিব্য-কাহিনী আজও বেঁচে আছে। সেগুলিকে একত্র করার দায়িত্ব নিয়ে এখনও কেউ অগ্রসর হননি। মাত্র কয়েকদিন আগে, শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, 'যুগান্তর সাময়িকী'তে (১৮ই ফাল্গুন ও ২রা চৈত্র ১৩৪৭) ও 'বারবেলার বৈঠকে' যোগী বরদাচরণের দিব্যজীবনের অলৌকিক কাহিনী তুলে ধরেছেন। এসব কাহিনী অচিরে সংগৃহীত হলে বরদাচরণের জীবনরহস্যের অনেক দিক উদ্ঘাটিত হবে। কবি নজরুল এই মহাযোগীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখবেন একদিন এই আশা নিয়ে লিখেছিলেন— "...এই দুর্দ্দিনে এই বাঙলা-দেশেই যে সাম্যবাদী, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, নিরভিমান, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণযোগী আত্মগোপন করিয়া আছেন, যাঁহার শক্তিতে আজ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে শত শত বিখ্যাত বাঙালী উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। স্বয়ম্প্রকাশ সূর্য্যোদয়ের আগে যেমন অকারণ বিহগকাকলী ধ্বনিত হইয়া উঠে, আমারও এই কয়েকটি অসম্বন্ধ কথা সেই অরুণোদয়ের আনন্দ-আকূতির ক্ষীণ আভাসমাত্র। আদেশ পাইলে, এই মহাযোগীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিব, ইচ্ছা রহিল।" নজরুলের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। আজ তিনি স্তব্ধ ও কণ্ঠহীন। সেকালের শিক্ষক সাধক ও যোগী বরদাচরণের সেই দিব্যজীবন আস্বাদে আমাদের এ প্রয়াস নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

পশ্চিমী দুনিয়ার সান্নিধ্যে এসে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৌরকরস্পর্শে বাঙালী এই দিব্য মুহূর্তে বৃহৎ ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করেছিল।

নব যুগের এই ভাবচেতনাকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন, সেকালের নবীন শিক্ষক সম্প্রদায়। যুগের বর্তিকা থেকে অগ্নিচয়ণ করে এই শিক্ষক সম্প্রদায়ই বাঙালীর চিত্তে দাবানলের দীপ্তিকে জ্বালিয়ে রেখেছিল। নবজাগরণের বাঙলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে গেলে কেবলমাত্র দিকপাল বাঙালীর জ্ঞান-মনীষা ও তাঁদের বিচিত্র অবদানের তুঙ্গ দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করলেই হবে না—সেকালের অগণিত শিক্ষকের বহুধা বিকীর্ণ অবদানের কাহিনীও ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায় থেকে আহরণ করতে হবে।

সমগ্র বাঙলাদেশে কৃতবিদ্য শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য নয়। নতুন যুগের আলোকে স্নান করে সেযুগের অনেক বাঙালী মানুষ গড়ার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিত্ব-মনীষা জ্ঞান ও কর্মে তাঁরা বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণ-রামতনু বা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বরেণ্য বাঙালী-দের সমকক্ষ ছিলেন না; তাঁদের প্রতিভার আলো হয়ত দেশের সমগ্র জনমানসে ছড়িয়ে পড়েনি। তবুও আদর্শ-ত্যাগ-সাধনা ও নিষ্ঠায় তাঁরাও ছিলেন রামতনু-রাজনারায়ণ ও বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয়। পল্লীবাঙলার দিকে দিকে বিদ্যালয়, পাঠশালা ও মাদ্রাসায় বসে তাঁরাই মানুষ গড়ার কাজে সাধনা-তন্ময় ছিলেন। নতুন যুগের বাণীকে তাঁরাই ছড়িয়ে দিয়েছেন আপামর জনসাধারণের মধ্যে। সেকালের এই আদর্শনিষ্ঠ, জ্ঞান ও প্রেমের যুগপথিক স্বল্পখ্যাত শিক্ষক সমাজের কথা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে।

আজ নতুন যুগের ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। শিক্ষা-সাধনার ইতিবৃত্তও রচিত হচ্ছে। কিন্তু গতযুগের ভাব-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সেই বিপুল কোলাহলে সমগ্র বাঙলাদেশ ব্যাপ্ত করে শিক্ষক সমাজেরও যে একটি সোচ্চার কণ্ঠ মিলিত ছিল—এই সমস্ত পুঁথিপুস্তকে সে সব কাহিনীর কোনও উল্লেখ দেখি না। বিগত দেড়শত বৎসরে বাঙলাদেশে অগণিত কৃতবিদ্য শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের অধিকাংই কীর্তির কোন 'পাথুরে প্রমাণ' রেখে যাননি। মুদ্রিত

পুস্তকের মাধ্যমে তাঁদের যে খ্যাতি বা মহিমা প্রচারিত ছিল, আজ তাও বিলুপ্ত। অনেক শিক্ষকের স্মৃতি কিংবদন্তীর রাজ্যে স্থান পেয়েছে। ছাত্রসমাজ ও ভবিষ্যৎ গুণগ্রাহী সমাজের মুখে মুখেও সেকালের বহু শিক্ষক স্মৃতিমাত্র বেঁচে আছেন। সেকালের এই শিক্ষক সমাজের মহত্ত্ব ও কৃতিত্বের কাহিনী উদ্ধার নিঃসন্দেহে একটি শ্রমসাধ্য কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞ, তথ্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাশীল গবেষকগণ অচিরে একাজে হাত দিলে এখনও অনেক কৃতবিদ্য শিক্ষকের জীবন কাহিনীর পুনরুদ্ধার সম্ভব হতে পারে। পূর্ববাঙলার বিশাল জনপদে একদা যাঁরা মানুষ গড়ার কাজে অক্লান্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকের কাহিনী এপারের মানুষের নাগালের বাইরে। 'সেকালের শিক্ষক' এই পর্য্যায়ে গতযুগের কতিপয় যোগ্য শিক্ষকের জীবনকে প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি আলোচনা ধারার সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে। 'শিক্ষক' সম্পাদক অধ্যাপক মহীতোষ রায়চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর বিশেষ আগ্রহাতিশয্য-বশতঃ বিষয়টির গুরুত্ব অনেকেই অনুভব করছেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সেকালের শিক্ষক সমাজের এমনই একটি স্মরণীয় চরিত্র। যতীন্দ্রমোহন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের শিক্ষক। তথাপি বিংশ শতকের প্রথম দু' দশকের আলো-বাতাসে তিনি লালিত হয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের সেই ঘোর বাত্যাবিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে যতীন্দ্রমোহন পরবর্তী জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করেছিলেন। উনিশ শতকের কৃতবিদ্য শিক্ষকবৃন্দ জাতির চিন্তা ভাবনাকে লোকায়ত করার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন—যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সেই ঐতিহ্যের উপাসক। সেইজন্যই তাঁকে সেকালের শিক্ষকবৃন্দের উত্তরসাধক হিসেবে প্রদক্ষিণ করেছি। যতীন্দ্রমোহনের শিক্ষকখ্যাতি প্যারীচরণ সরকার, রসময় মিত্র বা বেণীমাধব গাঙ্গুলীর মত বহুব্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু অবিভক্ত বাঙলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চল ও জনপদে তাঁর শিক্ষকখ্যাতি অম্লান গরিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি জাতির গৌরব নির্ণীত হয় সেই জাতির অধিকতর সুশিক্ষিত মানুষের প্রতিবিম্বনে। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন মানুষ তৈরীর অনন্যব্রতী কর্মী। তদুপরি দূর পল্লীবাঙলায় বসে তিনি বঙ্গভারতীর যে সেবা করেছিলেন —সে স্মৃতিও বিস্মরণযোগ্য নয়। বাঙলা গল্প ও উপন্যাসে তিনি প্রীতি-স্নিগ্ধ লোকায়ত জীবন ও পল্লীমাধুরীর যে আস্বাদ এনেছিলেন, তাও আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনাকে নির্দ্বিধায় সমৃদ্ধি মণ্ডিত করেছিল।

যতীন্দ্রমোহন ১২৮৭ বঙ্গাব্দে (১৮৮০) খুলনা জেলার সেনহাটীর এক

প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যতীন্দ্রমোহনের পিতা মনোমোহন সেনগুপ্ত কবিরত্ন, মাতা শুভদায়িনী দেবী। আর পিতামহী ছিলেন রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের পৌত্রী কমলা দেবী। কমলা দেবীর জননী সহমরণ বরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা যতীন্দ্রমোহনের পরিবারের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। এই পরিবেশের মধ্যে তিনি লেখাপড়া স্থুরু করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন সেনহাটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নবযুগের শিক্ষাসাধনার প্রবাহ তখন নগর ও শহর অতিক্রম করে গ্রাম বাঙলার দিকে দিকে তরঙ্গাঘাত করছে। বিংশ শতকের যুগপথিক বাঙালীরা বাঙলাদেশ ব্যাপ্ত করে নূতন শিক্ষার যজ্ঞশালা নির্মাণ করেছেন—বাঙলাদেশের তরুণ সমাজে দেখা দিয়েছে নতুন শিক্ষালাভের এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। বরিশালে তখন দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী। সমগ্র পূর্ববাঙলার দৃষ্টি সে সময়ে বরিশালের দিকে। বাস্তবিকই অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুল উনিশ শতকের সন্ধ্যারাগ মুহূর্তে সারস্বতচেতনার এক বন্যাবেগ এনেছিল।

যতীন্দ্রমোহন উচ্চ শিক্ষালাভ করবেন এই আশা নিয়ে বরিশালে এসে উপস্থিত হলেন। বরিশাল তখন পূর্ববাঙলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র। এখানে এসে তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত ও আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভ করলেন। যতীন্দ্রমোহনের ধ্রুবতারা হলেন অশ্বিনীকুমার ও জগদীশ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন তিনি। পরবর্তী জীবনের দিকরেখা স্থির হয়ে গেল এখানে। ভবিষ্যৎ জাতিগঠন ও মানুষ তৈরীর মহানব্রতে তিনি সাধ্যমত নিজের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করবেন বলে স্থির করলেন। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এফ, এ ও বি, এ অধ্যয়নে ব্যাপৃত রইলেন। ১৯০৪ সালে বি, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে দেশে ফিরে এলেন। সংসারের তাগিদে আর বি, এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে পারলেন না। পরিবারের একমাত্র অভিভাবক ও প্রতিপালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকস্মাৎ পরলোকগমনে তাঁর জীবনে বিপর্যয় নেমে এল। বৃহৎ সংসারের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র হল অফিসে আদালতে নয়—বিদ্যালয়ে। দারিদ্র্যের বৃত্তিকে বেছে নিলেন তিনি। মহৎ আদর্শের তাড়না ছিল বলেই তিনি কঠিন দায়িত্বভার বহন করতে পেরেছিলেন।

শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকা অবস্থাতে ১৯১৮ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে তিনি বি, এ পাশ করেন।

যথার্থ শিক্ষক না হলে শিক্ষাকে মর্যাদার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। শিক্ষককে আমরা বলি গুরু। তিনি আচার্য। শিক্ষকতাকে নিছক পেশা বলে মনে করলে, শিক্ষকের ভূমিকাকে অমর্যাদা করা হয়। শিক্ষক হিসেবে যতীন্দ্রমোহনের ছিল একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের অর্থ প্রকাশ। মানুষের বিশেষ বিশেষ প্রবণতাকে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। গতযুগে বাঙলাদেশের বহু শিক্ষক এই কাজটি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন এইরকম একজন শিল্পী।

যতীন্দ্রমোহন আজীবন শিক্ষাব্রতী। ১৯০৪ সালের প্রথম দিকেই তিনি শিক্ষকের কাজে ব্রতী হন। খুলনা জেলার কোড়কদিগ্রামে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে তিনি প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কোড়কদিগ্রাম ছেড়ে তিনি এলেন বসিরহাট হাই স্কুলে। এখানে তিনি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষকতা করেন। তাঁর স্বতন্ত্র শিক্ষাদান পদ্ধতি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ১৯০৭ সালে যতীন্দ্রমোহন সেনহাটী হাই স্কুলে ইংরেজীর শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। তখন তিনি বি, এ অনুত্তীর্ণ। কিন্তু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সে সময়েই তিনি একজন সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন। ইংরেজী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যবোধে যতীন্দ্রমোহন অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ফলে তিনি ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের অশেষ প্রশংসাভাজন হয়ে ওঠেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে গ্রাজুয়েট শিক্ষকের সংখ্যা দেশের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে খুব বেশী ছিল না। দু চারজন গভীরতর আদর্শানুরাগ বশতঃ ত্যাগব্রতকে অঙ্গীকার করে চিরদারিদ্র্য বরণ করতেন। বি, এ পাশ শিক্ষকের অভাব ছিল বলেই অনেক বি, এ অনুত্তীর্ণ শিক্ষক এরূপ কাজে যোগ দিতেন। গতযুগের অনেক প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানী তীক্ষ্ণধী শিক্ষক ছিলেন বি, এ ফেল। কোন একটা বিষয়ে হয়ত তাঁদের অধিকার অপেক্ষাকৃত স্বল্প ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের খ্যাতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। যতীন্দ্রমোহন প্রথম দিকে ছিলেন এমনই একজন শিক্ষক। সেনহাটী বিদ্যালয়ে তিনি বি, এ পাশ করে তার অপূর্ণতাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই সেনহাটী বিদ্যালয়ে তিনি একাদিক্রমে প্রায় বিশ বছর শিক্ষকতা করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

যতীন্দ্রমোহন মাঝে খুলনা জেলার সিদ্ধিপাশা হাই স্কুলে কিছুদিনের জন্য প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু আবার ফিরে আসেন সেনহাটী হাই স্কুলে। ১৯২৭ সালে তিনি সেনহাটীর নিকটবর্তী ভৈরব তীরবর্তী মহেশ্বর-পাশা হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এই স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৫২ সালে) গত যুগের এই ত্যাগব্রতী সুশিক্ষক যতীন্দ্রমোহন পরলোকগমন করেন।

যতীন্দ্রমোহন বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের কিছুকাল পর্যন্ত শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন শত শত লোক। কালের স্রোতে তাদের অনেকের নাম হারিয়ে গেছে। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন শিক্ষকতাকে কেবলমাত্র পেশা হিসাবেই নেননি—তাঁর এই শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে এক অভিনব ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে যে সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত থাকে যতীন্দ্রমোহন সেই নিদ্রিত সম্ভাবনাকে চেতনার জীবন প্রবাহে গড়ে তুলতেন। স্নেহ, ভালবাসা ও শাসন দিয়ে জাতির কিশোর সমাজকে নতুন যুগের আলো বাতাসের আস্বাদ দিতেন। যে ছাত্রের মধ্যে যে সম্ভাবনাকে তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চাক্ষুষ করতেন, তাকে সেই পথের উপযোগী করে গড়ে দিতেন। মানুষ গড়ার এক অসাধারণ শিল্পী-সুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি অনাড়ম্বর শিক্ষক জীবন উদ্‌যাপন করেন। শিক্ষকতা অনেকেই করেন, সকলেই স্মরণীয় হয়ে ওঠেন না। যতীন্দ্রমোহনের শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে ছিল একটা স্বাতন্ত্র্য। শিক্ষক হিসাবে তার ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশ ঘটেছিল, সেখানেই সে স্বাতন্ত্র্য। "বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি" এই প্রাচীন বচনকে গ্রাহ্য করেই তিনি ছাত্র সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। ছাত্ররা তাকে যেমন ভয় করতো, শ্রদ্ধাও করতো তেমনি।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি ছাত্রশিক্ষাদানের পাঠ গ্রহণ করে ফিরেছিলেন। বাঙলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক সমাজের পুরোবর্তী আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক-জীবন ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। ছাত্র তৈরীর অভিনব প্রণালী তিনি তাঁর কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ধ্যান ও স্বপ্নের বাঙলাদেশ গঠনের জন্য মহাত্মা যে কর্মযজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রজীবনে যতীন্দ্রমোহন সেই সাধনার অমৃতবাণী পান করে এসেছিলেন। অশ্বিনীকুমারের "ছাত্র সেবা সঙ্ঘে'র অনুকরণে যতীন্দ্র–

মোহনও সেবা সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির ছাত্র সভ্যেরা তাঁর নির্দেশানুসারে আবশ্যকমত যে কোন মুহূর্তে রোগীর শয্যাপাশে বসে সেবা করেছে। ছাত্রদের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষা সেবাব্রতের আদর্শটিও তিনি রূপায়িত করে তোলেন। গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থ তাদের সংসারের বরাদ্দ চাউল থেকে দুবেলা দুমুঠো একটা পৃথক পাত্রে জমা রাখতেন। সপ্তাহান্তে ছাত্ররা সেগুলি সংগ্রহ করে এনে দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দিত। শুধু কেতাবী বিদ্যে দিয়ে নয়—যতীন্দ্রমোহন এই ভাবেই ছাত্র সমাজের মধ্যে সেবাধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অনন্যব্রতী ছিলেন। গত শতকের বাঙালীর চিন্তা ভাবনায় এই সেবাধর্মের আদর্শ ছিল ওতঃপ্রোত। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সেই কল্যাণ চিন্তার মুগ্ধ উপাসক।

যতীন্দ্রমোহনের অগণিত কৃতী ছাত্র পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির গৌরববৃদ্ধি করেছেন। তার কৃতবিদ্য ছাত্রদের মধ্যে কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক কালীপদ সেনগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর অব সার্ভেজ্ অবনীকুমার সেনগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম্ ট্যাক্স বিভাগের প্রধান অনিলকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি ছাত্রদের নাম মনে পড়ে। যতীন্দ্রমোহনের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে তাঁর মুগ্ধ ছাত্রগণের অন্তরে এক অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জীবনে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেও তাঁর প্রিয় ছাত্রগণ অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁকে অর্পণ করে থাকে। অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্তী লিখেছেন. "ইংরেজী তিনি ভাল জানতেন, ভাল পড়াতেন। শুধু তাই নয়, ভাল ইংরেজী শিখবার. নির্ভুলভাবে ইংরেজী লিখবার একটা প্রেরণা তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন। ব্যক্তিত্বে অসম্ভব রাশভারি, তিনি ছিলেন নীতিবাদী, স্বল্পভাষী অথচ সহৃদয় ও সুরসিক ব্যক্তি! দুর্নীতিপরায়ণ ছাত্ররা তাঁকে দেখে হাড়ে কাঁপত। তাদের গতিবিধি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়াত না। অথচ সুশীল, মেধাবী ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ অন্তঃসলিল ফল্গুপ্রবাহের মত বয়ে চলত।"[১]

শিক্ষক যতীন্দ্রমোহন অন্য দিক থেকে ছিলেন সেযুগের একজন বাণীসেবক। দূর পল্লীবাঙলায় বসে বঙ্গভাষার সেবায় তিনি অতন্দ্র ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের এ পরিচয় এই প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে স্মর্তব্য। বাঙলা ছোট গল্প ও কথা সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। সাহিত্যের এই অধ্যায়ে যতীন্দ্রমোহনের

১ স্মৃতিভারে (১৩৪৭)—জনার্দ্দন চক্রবর্তী। পৃঃ ৩৭

নাম বিস্মরণযোগ্য নয়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, গাছ-গাছালি নারিকেল সুপারি তালিবনের ফাঁকে ফাঁকে মাধুরী-মেশানো যে পল্লীময় বঙ্গদেশ—যতীন্দ্রমোহন অবশ্য সেই মাতৃময়ী স্নিগ্ধশ্রী রূপসী বাঙলাদেশের স্নেহসুধায় নিজেকে পরিতৃপ্ত রেখেছিলেন। বরিশাল থেকে পূর্ব-চব্বিশ পরগণার বন্যভূপ্রকৃতিতে গ্রামীন বাঙলাদেশ ধূসর অতীতকাল থেকে জীবনের এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে ব্যাপ্তি দিয়ে চলেছে। সতীশচন্দ্র মিত্রের "যশোহর ও খুলনার ইতিহাস" এবং পুততণ্ডুব "চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস" সেই বাঙালীর মানস বিস্তারের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। ভৈরব, মধুমতী, ইছামতী, রূপসার ঢেউয়ে-ভেজা সবুজ বাঙলাদেশে বসে, যতীন্দ্রমোহন হার্দ্য রসসাহিত্যের দক্ষ শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন মূলতঃ গল্প ও উপন্যাসের লেখক। অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্তী এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "একনিষ্ঠ দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, স্বল্পে সন্তুষ্টি, চরিত্রবত্তা, সহৃদয়তা, আত্মমর্যাদা, দারিদ্র্যের মধ্যে উচ্চ চিন্তা, দেশাত্মবোধ অশ্বিনীকুমারের এ সব গুণ তিনি অনুভব দিয়ে ফোটাতেন তাঁর গল্পের কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে। মুক্তার মত সুন্দর গল্পগুলির আড়ালে আমরা প্রত্যক্ষ করতাম, তাঁরই মহনীয় চরিত্র ও তাঁর আত্মবোধ। অনেক সময়ে আমাদের পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তিনি চুপ করে বসে ভাবতেন, অথবা অর্দ্ধ-সমাপ্ত গল্পের কিয়দংশ দ্রুত লিখে যেতেন। পাঠন-বিরতির মুহূর্তগুলিও আমাদের ব্যর্থ হোত-না—শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, নীরব শৃঙ্খলাবোধে ভরে উঠত। যতীন্দ্রমোহনের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য চর্চার পরিচয় বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

এইটুকু বলা যেতে পারে যে ছোট গল্প বিবর্তনের ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দান বিস্মর্তব্য নয়। অধুনা-বিলুপ্ত সামাজিক গুণাবলীর স্বচ্ছ আলেখ্য ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরতেন। গ্রাম বাঙলার ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ও বৈচিত্র্যময় জীবন-স্পন্দন তাঁর গল্পগুলিতে এক হাস্য ও স্নিগ্ধ রসের আস্বাদ এনে দিত। তিনি মুখ্যত 'মালঞ্চে'র জন্য লিখতেন। মাসিক মালঞ্চের সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত। শিক্ষাবিদ সাহিত্য সম্পাদক, সাহিত্য-সেবী এবং ন্যাশানাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে সেকালে কালীপ্রসন্নের খ্যাতি ছিল। এ ছাড়া সরলা দেবীর 'ভারতী' এবং জলধর সেনের 'ভারতবর্ষে' তিনি লিখতেন। তাঁর রচিত কোন ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের সন্ধান জানি না। যতীন্দ্রমোহন রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হচ্ছে :

১। দুর্ব্বাদল (গল্প) ২। বিল্বদল (গল্প) ৩। পুষ্পদল (গল্প) ৪। নন্দন পাহাড় (উপন্যাস) ৫। অশ্রুময় (উপন্যাস) ৬। গৌরী (উপন্যাস)।

তাঁর প্রকাশিত পুস্তক আরও আছে কিনা সঠিক জানি না। যতীন্দ্রমোহনের এসব গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন সেকালের বিখ্যাত গ্রন্থপ্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কোং। সেকালের সাহিত্য-সমাজে এই গ্রন্থগুলি বিশেষ সমাদৃত হয়। ১১২৯ সালে বার্লিনের ডঃ রেণহার্ড ও ওয়াগনার দশজন বাঙালী লেখকের লেখা জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির নাম "Bengalische Der Seig Der Secle." এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত লেখকদের গল্পের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের বিল্বদল গ্রন্থের কিছু গল্পও স্থান লাভ করে। শিক্ষক যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্য সেবা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধুর প্রকাশ হিসেবে চিরকাল আদৃত থাকবে। স্বল্পভাষী সাহেবী মেজাজের এই দক্ষ ইংরেজী শিক্ষক খাঁটি বাঙালীর মত বাঙলার গ্রামীন জীবনের রস নিজে আস্বাদন করে রূপরেখায় যে অপূর্ব বাণীরূপ দিয়েছিলেন, তা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক ও সাহিত্যসেবী যতীন্দ্রমোহন নিজেকে তুলে ধরেছিলেন সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। তিনি বহু ছাত্রের মানস বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর সস্নেহ পরিচর্যা ও লালনে। পরিশেষে অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্তীর গভীর শ্রদ্ধাপ্রসূত রচনাই উদ্ধৃত করে যতীন্দ্রমোহন প্রসঙ্গ শেষ করছি। "ভাবলে চোখে জল আসে। শাস্ত্রের কথা মনে পড়ে,—

একমপ্যক্ষরম্ যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ
পৃথিব্যাং নাস্তি তদদ্রব্যং যদদত্ত্বা সোঽনৃণীভবেৎ।

দারিদ্র্যব্রত শিক্ষক ছিলেন আমাদের আচার্যদেব। দারিদ্র্যে ছিল গর্ববোধ—দীনতা নয়। তার সঙ্গে ছিল অকৃত্রিম ছাত্র-হিতৈষণা, অস্খলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অতন্দ্রিত কল্যাণ বুদ্ধি। আমরাও শিক্ষক—মানুষ গড়ার কারখানায় মজুরি করে চলেছি। জীবন সায়াহ্নে এসে বুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় গেলেন আমাদের দেশের সেই ত্যাগী নমস্য শিক্ষকেরা? আমরা কি তাঁদেরই উত্তরাধিকারী?"

যোগীন্দ্রনাথ বসু

সুলেখক ও শিক্ষাব্রতী হিসেবে একদা যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রসিদ্ধি ছিল। উনিশ শতকে প্রতীচ্যশিক্ষার প্রভাবে বাঙালীমানসে যে নব্যসাহিত্য সংস্কৃতির সমারোহ দৃষ্ট হয়—সাধকোচিত নিষ্ঠায় যোগীন্দ্রনাথ আপন চৈতন্যে তা সঞ্চারিত করেছিলেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কে এতাবৎ প্রকাশিত প্রথাসিদ্ধ ইতিহাসে বহু অক্লান্ত কর্মী সাহিত্যসেবীর অনুল্লেখ যথার্থই পীড়াদায়ক। সাহিত্যের সামগ্রিক চলমানতাকে অস্বীকার করে বিশেষ মুহূর্ত ও চরিত্রকে সহনীয় করে তুলতে আমরা কদাচ কার্পণ্য করি না, কিন্তু কার্যতঃ পূর্ণাবয়ব সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে অনেকানেক ব্যক্তি-চরিত্রের বিশ্লেষণে আমাদের অনীহা অপরিসীম। আর বলাবাহুল্য, সেই কারণেই সাম্প্রতিক সাহিত্য চর্চায় যোগীন্দ্রনাথ বসু এক প্রায়-বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জাতীয়তাবাদের এক অভূতপূর্ব উজ্জীবন ঘটে। বিচিত্র-ভাব-কর্ম-চিন্তা ও ধর্মান্দোলনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ ভাবতরঙ্গে সেকালের অনেক সাহিত্যব্রতীই জাতীয়তার মন্ত্রে মুক্তিস্নান করেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথের যাবতীয় সারস্বত কর্মের উৎস তাঁর জীবৎকালের এই স্বাদেশিকতা-জাতীয়তা ও ধর্মবোধের মধ্যে অনুস্যূত। তাঁর কবিতা-গল্প-নাটক-শিশুসাহিত্য ও ধর্মবোধক রচনারাজির মধ্যে সাহিত্যের পালাবদলের কোনও নূতন সংকেত না থাকলেও শিক্ষাবিস্তার, চরিত্র গঠন, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা-বাদের সামগ্রিক পরিপুষ্টির দিক থেকে এগুলি মূল্যবান। আধুনিক বাঙলা চরিতসাহিত্যে তিনিই প্রথম শক্তিধর শিল্পী। বলাবাহুল্য গত যুগের সাহিত্য ও শিক্ষাচর্চায় যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন ওতপ্রোত।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যসেবায় সামগ্রিক মূল্যায়ন এতাবৎ হয়েছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। তাঁর বিপুল সংখ্যক গ্রন্থের কোনটিই একালে প্রচলিত নয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক সমূহ থেকে তাঁর রচনাদির নির্বাসন অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এমন কি তাঁর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (১৮৯৩) নামক সেই অসামান্য গ্রন্থখানি সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশিত থাকায় সাম্প্রতিক সারস্বত চিন্তা-চর্চায় যোগীন্দ্রনাথ একপ্রকার বিস্মৃত। তাঁর

সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন নয়—বরং সেই সুদুর্লভ জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আপাততঃ লক্ষ্য।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অতিক্রান্ত, নবজাগৃতির সূর্যালোকে সমগ্র দেশ ও জাতিচিত্ত উদ্ভাসিত। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পদসঞ্চারণই নয়—ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলমোচনের জন্য সমগ্র জাতি-মানস উদ্বেলিত। বাঙালীর স্বরাজ সাধনার সেই প্রথম আত্মঘোষণার লগ্ন এসে গেল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় কাল। সভ্যতার কনকপদ্ম কোলকাতা তখন নবজাগরণের পীঠস্থান। কোলকাতায় নূতন চিন্তা নূতন ভাবনার ঢেউ দূর গ্রাম বাঙলার জনপদকে প্লাবিত করেছে—বিঘোষিত হয়েছে নব্যশিক্ষার মন্ত্র। এই বৎসরের ১লা আগষ্ট (বাঙলা ১৮ শ্রাবণ, ১২৬৪) ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার 'নিতাড়া' নামক ছোট্ট গ্রামে যোগীন্দ্রনাথ বসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিতাইচাঁদ বসু, মাতা বামাসুন্দরী। পিতামাতার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় শিশু যোগীন্দ্রের লেখাপড়া সুরু। পুত্রকে আধুনিক শিক্ষায় পারদর্শী করবেন মাতা-পিতার এই বাসনা। কিন্তু শৈশবেই তিনি দুজনকেই হারালেন। নিরুপায় যোগীন্দ্রনাথ বারাসতে মাতামহ দীনবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে এসে উপস্থিত হলেন। মাতামহী ক্ষমাময়ী চৌধুরীর পরম স্নেহচ্ছায় তিনি আশ্রয় পেলেন। দক্ষিণ বারাসত বঙ্গবিদ্যালয়ে তাঁর শৈশব শিক্ষার সূচনা। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রজনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁকে মাতৃভাষা ও সাহিত্যে অনুপ্রাণিত করেন। বিশুদ্ধ বাঙলা লেখার পাঠ নিলেন যোগীন্দ্রনাথ। শৈশব গুরু ব্রজনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ সলজ্জ পদক্ষেপে বঙ্গবাণীর অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। উত্তরকালের যশস্বী-সাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথ তাঁর এই শৈশবগুরুকে বিস্মৃত হননি। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিতা প্রসঙ্গ' (১৮৯৯) গ্রন্থখানি শৈশবপণ্ডিত ব্রজনাথ ভট্টাচার্যের নামে উৎসর্গ করেন।

অল্প বয়সেই সাহিত্যের প্রতি যোগীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল অপরিসীম। ছাত্র-জীবনেই সেই অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। ইতিমধ্যে 'বসিরহাট মিউনিসিপ্যাল স্কুল' থেকে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[১] এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কোলকাতায় প্রেরিত হলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ কোলকাতা 'মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন' থেকে দ্বিতীয়

১ The Calcutta University Calendar, 1881-82

বিভাগে এফ, এ পাশ করেন।২ আর বি, এ পাশ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে।৩ অতঃপর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এম, এ পরীক্ষাতে অবতীর্ণ হয়েও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে পরীক্ষা অসমাপ্ত রাখেন। এখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' উদ্যোগে কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'একশত নয়তম' জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এই উপলক্ষে কবিপৌত্র অমলেন্দু বসু মহাশয় রচিত একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্র প্রকাশিত হয়। এই প্রচারিত বিবরণ থেকে অবগত হওয়া যায় যোগীন্দ্রনাথ কর্মজীবনের সূচনাতে কিছুকাল রিপন কলেজে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত নিবন্ধেও রিপন কলেজে অধ্যাপনার কথা সমর্থিত হয়।৪ কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য যোগীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য উদ্ধারের কারণে দেওঘরে উপস্থিত হন। এখানে অবস্থান কালে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যোগীন্দ্রনাথ 'দেওঘর এইচ-সি ই স্কুলে' প্রধান শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর কর্মজীবনের যথার্থ সূচনা এই দেওঘর বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক জীবনেই অচিরকাল মধ্যে শিক্ষক ও সাহিত্যসেবা হিসেবে যোগীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক স্বাদেশিকতা-জাতীয়তাবোধ ও উগ্র হিন্দুত্ববোধের পুনরুজ্জীবন লগ্নরূপে ইতিহাসে চিহ্নিত। বাঙলার এই ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন একটা বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের যুগ, তেমনই সে যুগ আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগও বটে। এই উপচেতনা যোগীন্দ্রনাথে সংক্রামিত হয়েছিল। দেওঘরের শিক্ষক জীবনেই যোগীন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবা সমাজসেবা ও স্বাদেশিকতার মন্ত্রে প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যপুষ্ট বাঙলা কবিতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। বিচিত্র বিষয়িণী সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাঙলার জাগ্রত স্বাদেশিকতার পরিবর্ধন ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই সময়েই দুরূহ সমাজসেবাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। সাহিত্য-সমাজ-শিক্ষা ও স্বাদেশিকতার মিলিত ভাবগঙ্গায় যোগীন্দ্রনাথ নিজেকে নিমগ্ন রাখেন।

দেওঘরে অবস্থানকালে যোগীন্দ্রনাথ লোকহিতকর বহুবিধ কল্যাণ কর্ম সম্পন্ন করেন। দেওঘরে দেশ ও সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর আসন ছিল শীর্ষস্থানে।

২ Ibid 1883-84

৩ Ibid 1886

৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু (বিবিধ প্রসঙ্গ), প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৪

এখানকার Rajkumari Lepar Asylum নামক কুষ্ঠাশ্রম মূলতঃ তাঁর প্রচেষ্টার ফল।৫ তাঁর কর্মদক্ষতা ও একাগ্র সাধনার ফলে প্রতিষ্ঠানটির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এখানকার সংস্কৃত পাঠশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শববাহীদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি একাধিক প্রতিষ্ঠান যোগীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থায়ী রূপ লাভ করে। যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রবাসী (ভাদ্র, ১৩৩৪), মডার্ণ রিভিউ (আগষ্ট, ১৯২৭), মাসিক বসুমতী (শ্রাবণ, ১৩৩৪) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে এসব বিষয় অবগত হওয়া যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেওঘরের এই জনপদে আধুনিক শিক্ষাপ্রসারে যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীটির কথা উল্লেখকালে তাঁর বিদায় মুহূর্তে দেওঘরের গুণমুগ্ধ সুহৃদসমাজ তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ করে লিখেছিল —"An educationist and Sanskrit Scholar as you are, you took the loveliest interest in the Baidyanath Sanskrit Pathsala and did your best to establish it on a strong and lasting basis, by your advice, assistance and co-operation. (বিদায়কালীন মানপত্র, ৩০ জানুয়ারী ১৯০১)

গতযুগের কৃতবিদ্য শিক্ষকসমাজে যোগীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বহু কৃতী ছাত্রের মধ্যে দেশপ্রেমিক সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দেওঘর বিদ্যালয়ে সখারাম প্রথমে যোগীন্দ্রনাথের ছাত্র, পরে তাঁর সহকর্মী শিক্ষকরূপে অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যোগীন্দ্রনাথের মত সুযোগ্য শিক্ষকের প্রযত্নে ছাত্রজীবনেই সখারামের হৃদয়ে দেশাত্মবোধের বীজ উপ্ত হয়। যোগীন্দ্রনাথের সাহচর্যে সখারামের মনে শুধু যে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই উদ্দীপ্ত হয় তা নয়—বাঙলা রচনায় তাঁর হাতে-খড়ি হয়। যোগীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই বাঙলাভাষা চর্চায় সখারামের অনুরাগের মূল। ছাত্রসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলা ছিল যোগীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সাহিত্যসেবার মূল লক্ষ্য। বাঙলার এই গৌরবদীপ্ত স্বদেশীযুগে শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ রাজশক্তির কোপানলে পড়েন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এ সম্পর্কে লিখেছেন—'মিঃ হার্ড তখন দেওঘরের ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার বিরুদ্ধে নানাকথা হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রবাবু ও সখারাম দুজনেরই বাঙলা লেখক অপবাদ ছিল। তাই দুজনেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপানলে পতিত

৫ Presidency College Register, Cal. 1927

হইয়া চাকুরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।'৬ হার্ড সাহেব ক্ষমতাবলে স্কুল কমিটির সভাপতি ছিলেন। গুরু শিষ্যের এই ইংরেজ বৈরিতা সম্পর্কে প্রসঙ্গত আরও একটি নিবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।৭

দেওঘরের শিক্ষক জীবন যোগীন্দ্রনাথের জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। দেওঘরে অবস্থানকালে আদর্শ শিক্ষক ও বঙ্গসাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক প্রমুখ মনস্বী পুরুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ঘটে এখানে। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩), নামক তাঁর অমূল্য গ্রন্থখানির উপকরণ তিনি এখানে বসেই সংগ্রহ করেন। দেওঘরের শিক্ষক জীবনেই বাঙলা সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় চরিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়ে তাঁর যশো-গরিমাকে ব্যাপ্ত করে দেয়। এখানেই দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যিক সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁকে বিচিত্র সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করেন। যোগীন্দ্রনাথের অহল্যাবাঈ (২য় সংস্করণ ১৩০৭), তুকারাম (১৩০৮), শিবাজী (১৩২৫) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সখারামের অনুপ্রেরণার ফল। বস্তুতঃ দেওঘরের জীবন যোগীন্দ্র জীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্ব। পনেরো বৎসরকাল প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করার পর যোগীন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন (৩০ জানুয়ারী, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ)। এই উপলক্ষে তাঁর সুহৃৎ ও গুণমুগ্ধজন তাঁর একাধিক মহত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—'You have been to the boys of your school what the celebrated Dr. Thomas Arnold was to those of his, when he was Head Master at Rugby. Like that model teacher you loved not simply of your boys, but also to the development of their moral feelings and spiritual instincts.' (বিদায়কালীন মানপত্র হ'তে উদ্ধৃত)।

তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী পর্ব কোলকাতাতে অতিবাহিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাবক শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। কর্মদক্ষতা ও

৬ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সখারাম গণেশ দেউস্কর। আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

৭ মহাদেবপ্রসাদ সাহা কৃত ভূমিকা। দেশের কথা (১৩৪৭)

চরিত্র মাধুর্যে তিনি এই এস্টেটের এক্সিকিউটার পদে উন্নীত হন। এই সঙ্গে একাদিক্রমে তিনি কুড়ি বৎসর চাকুরী করেন। কোলকাতা তাঁর সাহিত্য সাধনার দ্বিতীয় বৃহৎ ক্ষেত্র। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক যোগীন্দ্রনাথ কোলকাতার এই কর্মক্ষেত্রে বসে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাতৃভাষার অনুশীলন করে গেছেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অন্তহীন। 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) ও 'শিবাজী' (১৩২৫) দু'খানি ঐতিহাসিক মহাকাব্য ও অন্যান্য বহুবিধ সাহিত্যকর্ম কোলকাতার কর্মজীবনে সম্পন্ন হয়। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে নবসৃজ্যমান সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ এক বিশিষ্টতম নাম। এই পর্বেই কবি ও শিশু সাহিত্যিক হিসেবে বঙ্গসাহিত্যের দরবারে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিতে'র (১৮৯৩) পর পৃথ্বীরাজ (১৩২২) ও শিবাজী (১৩২৫) মহাকাব্য দু'খানি তাঁর দ্বিতীয় মহৎ সাহিত্য কীর্তি। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যের প্রকাশ কাল ১৩২২ বঙ্গাব্দ। এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের কাব্যরসিক সুধী ও পণ্ডিতমণ্ডলী যোগীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাঙলাদেশের বিদ্বৎসমাজ সংস্কৃত কলেজের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগীন্দ্রনাথকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। এই উপাধি প্রদানের কাল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ, (শকাব্দ ১৮৩৮), সৌর ফাল্গুন চতুর্থ দিবস। কবিভূষণ প্রশস্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী ত্রিংশজন পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্র শাস্ত্রী, ভাগবতকুমার শাস্ত্রী প্রমুখ মনস্বীগণের নাম দেখা যায়। কবিভূষণ প্রশস্তিপত্রে লিখিত অংশ এইরূপ—

'পৃথ্বীরাজ ইতি প্রসাদমধুরং গভীরভাবং মহাকাব্যং যস্য মহাকবেরনুপমং ব্যাপ্নোতি কীর্ত্ত্যা মহীম্ তস্মৈতে কবিভূষণেতি মতিমন্ যোগীন্দ্রনাথাইতে প্রীত্যোপাধিরয়ং প্রদীয়ত ইহাশীর্ভিঃ সমং গৃহ্যতাম্।'

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার আপাততঃ আমার আলোচনার বিষয়ীভূত নয়—তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে তাঁর রচনারীতির উপর প্রাসঙ্গিকভাবে দু' একটি কথা নিবেদন করতে চাই। যোগীন্দ্রনাথ কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাস-ধর্মগ্রন্থ-জীবনচরিত-শিশুসাহিত্য এবং বিদ্যালয় পাঠ্য বহুবিধ পুস্তক রচনা করে সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। সমসাময়িক কালে তাঁর যথেষ্ট কবিখ্যাতি ছিল। তাঁর খণ্ড কবিতা সমূহ বিদ্যালয় পাঠ্য হওয়ায় বহুল প্রচারিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথের সংকলিত কাব্যগুলির মধ্যে কবিতা প্রসঙ্গ (১৮৯৯), আদর্শ কবিতা (১৩০৬ ?), পৃথ্বীরাজ (১৩২২), শিবাজী (১৩২৫), মানবগীতা (১৩২২) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সমস্ত কাব্যের ভাবনা ও রচনায় নতুন কোনও জীবন বাণী ছিল না। মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিবৃন্দের অভ্যুদয়ে বাঙলাকাব্যের যে গতিপথ নির্ণীত হয়—যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই উনিশ শতকীয় কাব্য ঐতিহ্যের মুগ্ধ উপাসক। ফলতঃ তাঁর কাব্য চর্চায় কোন উচ্চতর তরঙ্গবিক্ষেপ ছিল না। সমকালীন কাব্য প্রবাহকে গতিশীল রেখে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন। এমন কি যুগান্তকারী মেঘনাদবধ কাব্য অনুস্মৃতির অনিবার্য ফলস্বরূপ পৃথ্বীরাজ (১৩২২) ও শিবাজী (১৩২৫) নামক যে দু'খানি মহাকাব্য প্রণয়ন করেছিলেন—সেখানেও কোন নূতনতর জীবন সঙ্কেত ছিল না। এমন কি উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিকাব্যের যে উৎসমুখ উন্মোচন করেন—যোগীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই কাব্যরীতির প্রভাব বিরল। বস্তুতঃ সুরুচি-সুনীতি-ঈশ্বরানুরাগ-বিশ্বাস-সদ্ভাব-স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তা কেবলমাত্র তাঁর কাব্যসমূহেই নয়—তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য ছিল। যুগের হিসেবে এগুলি নূতন ছিল না। তথাপি সুললিত গাম্ভীর্যপূর্ণ বিশুদ্ধ ও ভাবগর্ভ বর্ণনায় এই কবি সিদ্ধহস্ত।

যোগীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রহসনাত্মক রচনাসমূহ কোন নতুন দিগন্তের বার্তা বহন করে আনেনি। এগুলি নিতান্তই সাময়িক তাগিদে রচিত। তাঁর শিশু ও কিশোর পাঠ্য রচনাসমূহ এদিক থেকে মূল্যবান। বাঙলা শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ অন্যতম পথিকৃত। তাঁর ছবি ও কবিতা ১৯২৪), দু'খণ্ড রামায়ণের ছবি ও কথা (১৯০৯), ছোট-ছোট গল্প (১৯২৩), ছবি ও কথা (?) বিদ্যালয়-পাঠ্য 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' (১৩১৭) প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম এই সূত্রে উল্লেখ্য। তাঁর বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকসমূহ এদেশে আধুনিক শিক্ষাপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যোগীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে আধুনিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য সন্দেহাতীত। যোগীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস' (১.১৪) ও 'সরল কাশীরাম দাস' (১৩১৫) গ্রন্থ দু'খানি কিশোরদের উপযোগী করে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। উভয় গ্রন্থে সম্পাদকের বিস্তৃত ভূমিকা ছাড়াও দুরূহ ও অপ্রচলিত

শব্দসূচী ও অর্থ সন্নিবেশিত আছে। রবীন্দ্রনাথ 'সরল কৃত্তিবাসের' (১৩১৪) ভূমিকায় লিখেছেন—'ইহাতে আমাদের মৃতশিক্ষা প্রাণ পাইয়া উঠিবে এবং যোগীন্দ্রবাবুর এই কীর্তি দেশে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।' তিনি আরও লিখেছেন—'যোগীন্দ্রবাবুর মত লোক একাজের ভার লইয়াছেন শুনিয়া আমি নিজেকে দায়মুক্ত জ্ঞান করিলাম। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সকল চেষ্টাই সফল হইয়াছে। এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে না। এখন কেবল অপেক্ষা করিয়া রহিলাম তিনি কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করিয়া, বাঙলায় শিশুসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবেন।' রবীন্দ্রনাথের এই আশা বিফল হয়নি। যোগীন্দ্রনাথ 'সরল কাশীরাম দাসেও' (১৩১৫) সেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই গ্রন্থে কাশীরামের বিস্তৃত জীবন আলোচনা ছাড়াও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি ভূমিকা আছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙলা সাহিত্য সেবায় যোগীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের সপ্রশংস উল্লেখ করে লিখেছেন—'সরল কাশীরাম দাস, সকল শ্রেণীর পাঠকেরই উপযোগী হইয়াছে এবং বাঙলা শিশুসাহিত্যের একটি প্রধান অভাব পূর্ণ করিয়াছে।' পরবর্তীকালে 'কঠোপনিষদের (১৩১৯) সম্পাদনা করে যোগীন্দ্রনাথ প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদকরূপে বাঙলা সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করেন।

বাঙলাসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সারস্বতকীর্তি—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)। বস্তুতঃ উনিশ শতকের বাঙলা চরিত সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ একটি অবিস্মরণীয় নাম। বাঙলা চরিত সাহিত্যে তাঁর অমর কীর্তি বা ফাদার ডাসিয়েনের জীবনচরিত (১৮৯০), অহল্যাবাঈ (২য় সং ১৩০৭) ও তুকারাম (১৩০৮) গ্রন্থসমূহ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই চরিতগ্রন্থের সব ক'খানিই উনিশ শতকের শেষদশকে রচিত। 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত' (১৮৯৩) গ্রন্থখানি সম্পর্কে মোহিতলালের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিকভাবে স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন—"স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার যে জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন, তজ্জন্য সাহিত্যসেবী বাঙালীমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ; উক্ত গ্রন্থে কবির জীবনকাহিনী, সাহিত্যসাধনা ও কাব্যপরিচয় যেরূপ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য-সহকারে লিখিত-হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থ এক হিসাবে আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে।'[৮]

৮ মোহিতলাল মজুমদার। কবি শ্রীমধুসূদন। উপক্রমণিকা (৩য় সংস্করণ ১৩৬৫)

বঙ্গসাহিত্যসেবায় যোগীন্দ্রনাথের এই সাফল্য সমাদৃত হ'তে বিলম্ব হয়নি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষাসমূহে এম, এ পরীক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন করেন। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পঠন-পাঠনের বিষয়ীভূত করার এই সিদ্ধান্ত একটা যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা। স্যার আশুতোষের এই মাতৃভাষা প্রীতি বাঙলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার পরবর্তী অধ্যায়কে গৌরবমণ্ডিত করে তুলেছে। বাঙলায় এম, এ প্রবর্তনের প্রথম বৎসরে অধ্যাপকমণ্ডলী নিয়োগের ব্যাপারে তিনি দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। গুণগ্রাহী আশুতোষের আহ্বানে দীনেশচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক-মোহন সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আই-জে-এস-তারাপুরওয়ালা, প্রমুখ সুধীবর্গ বাঙলাবিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের সম্বন্ধের সূত্রপাত এই সময় থেকে। আশুতোষ যোগীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর আহ্বান ও অনুকম্পায় যোগীন্দ্রনাথ প্রথম বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা এম, এ বিভাগে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র থেকে জানা যায় এম, এ থার্ড পেপারে মেঘনাদবধ কাব্যপাঠের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর।৯ ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার' বিভাগে স্নাতকোত্তর বিভাগে যে সব শিক্ষকবৃন্দের নাম মুদ্রিত আছে—সে তালিকার প্রথম নাম যোগীন্দ্রনাথ।১০ ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দের জন্য গঠিত 'Council of Postgraduate teaching in Arts' ও 'Board of higher studies (Arts)' এই উভয় বিভাগে যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম সদস্য।১১ পরবর্তী বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে যোগীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায় না। অতএব বাঙলা বিভাগের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বৎসরকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বার্ধক্য ও ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু অধ্যাপনার দায়িত্ব চালানো সম্ভবপর হয়নি। পি-আর-এস্ পরীক্ষকের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উপর ন্যস্ত করেন।১২ দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই আদর্শ শিক্ষকের গৌরব লাভ করেছিলেন।

৯ Post Graduate Teaching in the University of Calcutta, 1918—1919

১০ The Calcutta University Calendar, 1918—1919

১১ Ibid

১২ The Calcutta Review, August, 1927

অত্যল্পকালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে যোগীন্দ্রনাথ মনস্বী ও পণ্ডিত অধ্যাপকরূপে প্রশংসিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রথম বৎসরের ছাত্র ভারতবর্ষ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্মৃতি-তর্পণচ্ছলে লিখেছেন—'আমরা এম, এ ক্লাসে বহু সুধী ব্যক্তিকে অধ্যাপকরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শিবাজী ও পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত লেখক আচার্য যোগীন্দ্রনাথ বসু আমাদের মধুসূদনের মেঘনাদবধ পড়াইতেন। শৈশবে তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলাম—কৈশোরের সেই প্রিয় কবিকে অধ্যাপকরূপে পাইয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মধুসূদনকে তিনি কত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রতি কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তিনি বহুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহাকে এম, এ ক্লাসে পড়াইবার সুযোগ দেওয়ায় তিনি আমাদের পড়াইবার জন্য প্রচুর শ্রম করিতেন ও বোধ হয় বয়সে প্রবীণ হইলেও তরুণ অধ্যাপকদের মত যতটা সম্ভব নিজেকে তৈয়ারী করিয়া আসিতেন।'১৩

ভগ্নস্বাস্থ্য যোগীন্দ্রনাথ অতঃপর অধিককাল জীবনধারণ করেননি। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই (বাং ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৪) যোগীন্দ্রনাথ কোলকাতার নিজ বাসভবনে লোকান্তরিত হন। যোগীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে সাময়িক পত্র-পত্রিকার স্তম্ভে শোকাঞ্জলি নিবেদিত হয়। The Calcutta Review যোগীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখেন—'A notable personality has been removed from the field of Bengali literature by the hand of death—Mr. Jogindranath Bose, whose death last month we deeply mourn, was a lifelong devotee to the causes of Bengali literature and was one of the pre-eminent writers who contributed to its present wealth His pure and modest life was naturally reflected in the simple and chaste style which he adopted in his writings. He began his life as a teacher, and his examplary character, which endeared him to students and guardians alike, remained principle trait of the man even when he became known to fame and fortune. His life of Michael Madhusudan Dutta is an enduring monument to his industry and critical faculty, and it has become a classic

১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন। ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৬৪

in Bengali biographical literature. His Prithviraj and Sivaji received in his life time the full meed of praise which they deserve, and his numerous other writings have been acclaimed with unstinted praise by an appreciating public. A strong undercurrent of patriotism and of lofty ideals breathing the purity and sanctity of ancient lore pervades his works. When Sir Asutosh Mookerjee introduced the Scientific study of Indian vernaculars in the Post Graduate Department of the University, he invited Mr. Bose to take part in the work, and Mr. Bose responded with characteristic enthusiasm, but it was his failing health that stood in the way of his continuing the work. He was appointed to examine Premchand Roychand theses and though illness prevented him from performing his duties, no small joy was his to see his beloved Vernacular a subject for examination for the Blue Ribond of the University.[১৪]

গত যুগের বাঙলাসাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথের অবদানের কথঞ্চিৎ উপযুক্ত মন্তব্যটিতে আভাসিত। বাঙলাসাহিত্যের বহুধা বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির স্বাক্ষর বর্তমান সন্দেহ নেই, তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্যচর্চা সাম্প্রতিক পাঠককে সংক্রমিত করে ক্বচিৎ; তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকৃতিও বলা চলে, কালোত্তীর্ণ নয়; বস্তুতঃ জীবনচরিতকার হিসেবেই তাঁর [illegible] প্রসিদ্ধি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (১৮৯৩) গ্রন্থ-খানির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী বৎসর পরেও যোগীন্দ্রনাথের সেই অসামান্য গ্রন্থখানির কোনও নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। আশা করা যায় কোনও সহৃদয় প্রকাশক অচিরে একাজে অগ্রণী হবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে আচার্য যোগীন্দ্রনাথ একালে এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব, এমতাবস্থায় কেবলমাত্র রচনাদির পুনর্মুদ্রণের দ্বারাই তাঁর প্রতি সানুরাগ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্ভবপর।

১৪ The Calcutta Review, August, 1927

গ্রন্থ পঞ্জী

জীবনী

(১) অমর কীর্তি বা ফাদার দাসিয়েনের জীবনচরিত (১৮৯০), (২) মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত (১৮৯৩), (৩) মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত (বিদ্যালয়-পাঠ্য, ১৩১৭), (৪) অহল্যাবাঈ (২য় সংস্করণ ১৩০৭), (৫) তুকারাম (১৩০৮)।

কাব্য

(১) কবিতা প্রসঙ্গ, ১ম—৩য় খণ্ড (১৮৯৯), (২) আদর্শ কবিতা (১৩০৬ ?), (৩) পৃথ্বীরাজ (১৩২২), (৪) মানবগীতা (১৩২২), (৫) শিবাজী (১৩২৫) (৬) একাদশ অবতার (১২৯৩)।

নাটক

(১) গন্ধর্বনগর (১৯১৪), (২) দেববালা (১৯১৫)।

উপন্যাস

(১) রাজউদাসীন (?), (২) পর্ণকুটীর (?)।

ধর্মগ্রন্থ

(১) সরল কৃত্তিবাস (১৩১৪), (২) সরল কাশীরাম দাস (১৩১৫), (৩) কঠোপনিষৎ (১৩১৯), (৪) পতিব্রতা—১ম (১৯১১), (৫) পতিব্রতা —২য় (১৩২০), (৬) সীতা (১৯১৩)

শিশু সাহিত্য

(১) রামায়ণের ছবি ও কবিতা (১৯০৯), (২) ছবি ও কবিতা—১ম (১৯১৪), (৩) ছবি ও কবিতা—২য় (?), (৪) ছোট ছোট গল্প (১৯২৩), (৫) ছবি ও কথা (?)।

বিদ্যালয়-পাঠ্য

(১) সরল প্রবন্ধ ও কবিতা (১৯১০), (২) রচনা প্রকরণ, ১ম (১৯১০) সহ-লেখক ঈশানচন্দ্র ঘোষ, (৩) আদর্শ পাঠ—১ম (?), (৪) আদর্শ পাঠ —২য় (?), (৫) আদর্শ পাঠ—৩য় (?), (৬) রচনা প্রকরণ, ২য় (?), (৭) সরল ইতিহাস (?), (৮) সুখপাঠ্য ইতিহাস (?), (৯) সরল শিশুপাঠ (?)।

পরিশিষ্ট

গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর

শুভঙ্কর বাঙালীর গৌরব, বাঙলাদেশের গণিতবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে শুভঙ্কর একটি অদ্বিতীয় ও অবিস্মরণীয় নাম; অষ্টাদশ শতক থেকে প্রাক-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত বাঙলাদেশের শিক্ষাজগতে শুভঙ্করের গণিত-পদ্ধতি অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত ছিল। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকে শুভঙ্কর প্রবর্তিত পদ্ধতির প্রাধান্য কমতে থাকে। স্বাধীনদেশে এই অসাধারণ বাঙালী-প্রতিভা আজ উপেক্ষিত ও অবহেলিত। বাঙলার শিক্ষাজগত থেকে শুভঙ্করের বিদায় সম্পন্ন হয়েছে স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রনায়ক ও শিক্ষাবিদদের নির্মম আঘাতে। বিগত প্রায় আড়াইশত বৎসরের অধিক কাল ধরে শুভঙ্কর কেবলমাত্র ছাত্রসমাজের মধ্যেই নয়—আপামর বাঙালীর ঘরে ঘরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রামবাঙলাব ছায়া সমাচ্ছন্ন তরুতলে, খড়ো পাঠশালায়, মাদ্রাসা-মোক্তব-বঙ্গবিদ্যালয় এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে শুভঙ্করের আসন ছিল সুনির্দিষ্ট। বাঙলা পয়ারে লিখিত শুভ[illegible] আর্যাগুলি অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সুললিত কণ্ঠে আবৃত্ত হতো। শুভঙ্কর ছিলেন বাঙলার অদ্বিতীয় লোকশিক্ষক। হাট-বাজারের মুদি, পসারী, ব্যবসায়ী, মহাজন সকলেই শুভঙ্করের দৌলতে কাজ সমাধা করতো। জমিদারী সেরেস্তায় শুভঙ্কর ছাড়া কাজ চলতো না। দীঘির কালিকষা, ইট পাঁজার ইট গোণা, নৌকার বোঝাই নিরূপণ, ভোজনসর্বস্ব বাঙালীর ভোজের দধির পরিমাণ স্থির, বাঙালীর নিত্যজীবনের সব ব্যাপারেই শুভঙ্করের প্রয়োজন হতো। বিশুদ্ধ ও মিশ্রগণিতে উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক সময় সূক্ষ্ম হিসাব নির্ণয় করতে গিয়ে গলদঘর্ম হলেও অশিক্ষিত সাধারণ লোক এমনকি বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত শুভঙ্করের কল্যাণে এসব হিসাব অনায়াসে সম্পন্ন করে দিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের যুগন্ধর প্রতিভা শুভঙ্করের নাম বাঙলার জনমানস থেকে প্রায় অপসৃত। শুভঙ্কর প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা, লোকশিক্ষক, পূর্তবিদ্যাবিশারদ, মনস্বী বাঙালী। কিন্তু এতাবৎ প্রকাশিত প্রথাবদ্ধ বাঙলা ও বাঙালীর গৌরবঋদ্ধ ইতিহাসে গণিতশাস্ত্রে শুভঙ্করের অবিস্মরণীয় অবদানের দিকটি একপ্রকার অনুপস্থিত। এমনকি শুভঙ্করের পূর্ণাবয়ব জীবন-চিত্রের অভাবও পীড়াদায়ক মনে হয়।

শুভঙ্করের কাল আমাদের যুগ থেকে অনেক দূরবর্তী। এমনকি শুভঙ্করের সঠিক আবির্ভাব কাল, এখনও পর্যন্ত নির্ণিত হয়নি। জীবনকাহিনী রচনায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পূর্বস্মৃতি, কুলপরিচয় তথা বংশধারার ঐতিহ্য আবশ্যক। শুভঙ্করের সমকালের এমনকি তাঁর নিকটবর্তী যুগের কোন লেখক যেমন সহজেই তাঁর জীবন-পরিচয় লিখতে পারতেন শত শত বৎসর পরে একালের কোন জীবনীকারের কাছে তা খুব সহজ নয়। শুভঙ্করের নামে প্রচারিত পুথির কথা প্রায়ই শোনা যায়। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে শুভঙ্করের আর্যার পুথি আছে। কিন্তু এইসব পর্যালোচনা করে তাঁর জীবনকাহিনী রচনার প্রয়াস নেই বললেই চলে। তাঁর জীবনবৃত্তান্তমূলক পুথির সংবাদ আমাদের নজরে পড়েনি। তাঁর সঠিক জীবনবৃত্তান্তও বোধকরি এখনও লিখিত হয়নি। সুতরাং শুভঙ্কর সম্বন্ধে আমাদের কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি ও লোকপ্রবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে শুভঙ্কর কে ছিলেন ? শুভঙ্করী কি ? তিনি কোন্ সময়ের লোক ? তাঁর নিবাস কোথায় ? ঐতিহাসিক, গবেষক ও পুথিবিশারদ পণ্ডিতগণ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রে ও পুস্তকে শুভঙ্কর বিষয়ক কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান নিবন্ধটি এইরূপ কিছু কিছু সংবাদ বা তথ্যকে অবলম্বন করে রচিত, পুথিপত্র অবলম্বন করে শুভঙ্কর সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা হতে পারে। গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের সম্পূর্ণ জীবনকথা রচিত হোক—এই আশায় বক্ষ্যমান আলোচনায় দু-একটি কথা নিবেদন করে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভঙ্করের প্রকৃত জীবনকাহিনী অতীত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। শুভঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন—'শুভঙ্কর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন কিনা বলা দুরূহ। যদি থাকেন তবে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে জীবিত ছিলেন এবং অপভ্রংশে লিখিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে একাধিক গণিতজ্ঞ ব্যক্তি প্রধাণত কায়স্থসন্তান শুভঙ্কর নাম বা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মল্লভূমিতে এক শুভঙ্কর দাসের বা শুভঙ্কর সেনের ঐতিহ্য কল্পনা করা হয়'।১ আমাদের আলোচনা মল্লভূমির এই শুভঙ্করের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধ্যাপক ডক্টর সেন মল্লভূমির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই শুভঙ্করের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করলেও শুভঙ্কর নামিত সর্বপ্রাচীন আর্যার একখানি পুথির প্রাপ্তিসংবাদ দিয়েছেন। পুথিখানির লিপিকাল অষ্টাদশ শতকের

মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৪ মল্লাব্দ বা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে এই সময়ের অনেক আগে শুভঙ্কর আবির্ভূত হয়েছিলেন। লিপিকাল থেকে ৫০ বা ৪০ বৎসর ধরলেও অষ্টাদশ শতকের সূচনাতে শুভঙ্করের আবির্ভাবকাল ধরে নেওয়া হয়। শুভঙ্কর সম্ভবত সপ্তদশ শতকের অন্তিম লগ্নে কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্ত মহাশয় লিখেছেন :—"The exact date of Subhankar and the locality of his birth as well as habitation are not definitely known to us. Manuscript of his work are found in different parts of Bengal and in the border areas. I have collected his such manuscripts near Pakur in the district of Santal Parganas, which were probably written (as it appears from handwriting) in the early part of the 19th Century. Some consider him to be an inhabitant of Bankura district in Bengal. Buchanan describes him as a Kayastha of Nadia. There is no doubt that he flourished before the establishment of British Rule in Bengal." (Survey of India's life and Economic condition in the 18th century) ডক্টর কালীকিঙ্কর দত্ত তাঁর পূর্ববর্তী প্রকাশিত studies in the History of Bengal Subah (1936) ও Aliverdi and His Times (1939) নামক গ্রন্থে শুভঙ্কর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। শুভঙ্কর সপ্তদশ শতকের শেষে কিংবা অষ্টাদশ শতকের সূচনায় আবির্ভূত হন এবং তাঁর গণিত পদ্ধতি বাঙলাদেশের পাঠশালা ও গ্রাম্যবিদ্যালয়ে সমগ্র অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত ছিল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। শুভঙ্করের কালনির্ণয়ে ঐতিহাসিক দত্ত মহাশয়ের এই অভিমত মূল্যবান। তাঁর আবিষ্কৃত পুথি দুখানির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। পুথি দুখানি তিনি পাটনা কলেজের পুথিশালায় দিয়েছিলেন। ১৫. ৫. ৭১ তারিখের এক পত্রে তিনি জানিয়েছেন পুথি দুখানি যথাস্থানে না থাকায় শুভঙ্কর বিষয়ক তথ্যাদি জানাতে পারলেন না। অনুসন্ধান করে পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শুভঙ্করের আর্যার বিভিন্ন পুথিতে শুভঙ্করের জীবন-বিষয়ক যেসব উপাদান আছে সেগুলি অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি।

ডক্টর মতিলাল দাস কর্মসূত্রে বাঁকুড়ায় অবস্থানকালে শুভঙ্কর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে শুভঙ্করের জীবন বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেন। মাসিক

বসুমতী'তে প্রকাশিত মতিলাল দাসের এই রচনায় ২ শুভঙ্করের জীবন-বিষয়ক কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বাঁকুড়ার উকিল কুলদাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সহযোগিতায় শুভঙ্করের বংশধরদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে দাবী করেছেন। তাঁর উক্ত রচনা থেকে জানা যায় শুভঙ্করের কোন পুত্র ছিল না, রুক্মিনী ও চাঁদমুখী তাঁর দুই কন্যা। শুভঙ্করের দৌহিত্রবংশের শ্যামাচরণ বরাট সেনগুপ্ত মহাশয় শুভঙ্করের একখানি বংশ-তালিকাও দাস মহাশয়কে প্রদান করেন, ডক্টর দাস বাঁকুড়া কালেক্টরীতে রক্ষিত ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখের রোবকারী অনুসারে সংশোধন করে তাও ঐ রচনার সঙ্গে প্রকাশ করেন। শুভঙ্করের দৌহিত্রবংশীয় শ্যামাচরণ বরাট সেনগুপ্ত মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত শুভঙ্করের জীবন-বিষয়ক একখানি খণ্ডিত ও অসমাপ্ত পুথি থেকে তাঁর জীবনের প্রথম দিকের কিছু কিছু পরিচয় অবগত হওয়া যায়। দাস মহাশয়ের উক্ত নিবন্ধে জীবন-বিষয়ক ঐ পুথিখানি হুবহু মুদ্রিত আছে। শুভঙ্করের এই পরিচয়পত্রকে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও শুভঙ্করের পরিচয়জ্ঞাপক এই খণ্ডিত ও অসমাপ্ত বিবরণকে একেবারে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শুভঙ্করের সেই জীবন-বৃত্তান্ত প্রয়োজনবোধে এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করা যাচ্ছে। শুভঙ্কর বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পরগণার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দাসগুপ্ত চৌধুরী। জন্মকাল, ফাল্গুন মাস, ১০০৯ সাল। পীতাম্বর দাসগুপ্ত চৌধুরী ছিলেন খুব দরিদ্র। তিনি বিষ্ণুপুরের মহারাজ চৈতন্য সিংহের অধীনে স্বল্প বেতনে চাকুরী করতেন। কুলপুরোহিত পুত্রের নাম রাখেন জগন্নাথ। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়, দশম বৎসর বয়সে বাঙলাভাষায় জ্ঞানবান হয়ে ওঠেন। জগন্নাথ বাল্যকালে শারীরিক, মানসিকবল ও বুদ্ধিমত্তায় গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় করে সুরেন্দ্রনারায়ণ নামে খ্যাত হন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে জগন্নাথের পিতৃবিয়োগ হয়। পড়াশুনায় আসে বাধা। অতঃপর তিনি বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হন। বিষ্ণুপুররাজ তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও দেহলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে জগন্নাথকে সমাদৃত করেন। মাতার ভরণ-পোষণের জন্য বিষ্ণুপুররাজ একটি বৃত্তিও মঞ্জুর করেন। চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে জগন্নাথ ফারসী, বাঙলা প্রভৃতি তৎকালোচিত সকল বিদ্যায় নিপুণ হয়ে ওঠেন, গণিতশাস্ত্রে তিনি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এই সময় জগন্নাথ গণিতশিক্ষার জন্য সরল ও সুমধুর উপায় উদ্ভাবন করেন। জগন্নাথ প্রবর্তিত

লোকশুভকর গণিত পদ্ধতির জন্য বিষ্ণুপুররাজ তাঁকে শুভঙ্কর উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি জগন্নাথের নাম শুভঙ্কর। পরে দামোদর সিংহের চক্রান্তে শুভঙ্কর রাজভবন ত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে মহারাজ চৈতন্য সিংহ সভাসদসহ নগর ভ্রমণে বাহির হন, পথিমধ্যে এক উচ্চ তালবৃক্ষ অবলোকন করে সভাসদগণকে ঐ বৃক্ষের উচ্চতা নির্ণয় করতে বলেন, কিন্তু সভাসদগণের কেউই রাজার মনোরঞ্জন করতে না পারায় শুভঙ্করের ডাক পড়ে। মহারাজ শুভঙ্করের পলায়ন অবগত হলে তাঁর অনুসন্ধানের জন্য রাজভ্রাতা দামোদর সিংহকে অনুরোধ করেন। বহু অনুসন্ধানের পর শুভঙ্করের সন্ধান পাওয়া যায় এবং অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। শুভঙ্কর তালবৃক্ষের বিবরণ আনুপূর্বিক শ্রবণ করেন এবং তালগাছের ছায়া মাপ করে গাছের উচ্চতা নিরূপন করে মহারাজের প্রশংসালাভ করেন, এই বিবরণ থেকে শুভঙ্করের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

শুভঙ্করের এই জীবনবৃত্তান্তে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। শুভঙ্করের জন্মকাল বঙ্গাব্দ বা মল্লাব্দ কিনা এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, শুভঙ্করের এই জন্মকালকে বঙ্গাব্দ ধরলে চৈতন্য সিংহের কালে তাঁকে টেনে আনা খানিকটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, ১০০৯ বঙ্গাব্দ ইংরেজী ১৬০২।৩ সাল। কিন্তু চৈতন্য সিংহের রাজ্যকাল আনুমাণিক ১৭৫৮-১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।৩ বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের ইতিহাস অনেকেই লিখেছেন। সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মৃদঙ্গদর্পণে (১৩২৫) প্রসঙ্গত বিষ্ণুপুর রাজাদের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিষ্ণুপুর' (১৩৪৮) গ্রন্থে বিষ্ণুপুর রাজবংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন, বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রণিধানযোগ্য ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন অভয়পদ মল্লিক। (History of Bishnupur Raj) এতৎব্যতীত L. S. S. O. Mally 'বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে' প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণুপুর রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। এইসব পুস্তকে বিষ্ণুপুরের রাজাদের রাজত্বকাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। 'বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্য সিংহের রাজ্য প্রাপ্তির কাল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এই তারিখ ঠিক নয়, যাহোক, ১০০৯ সালকে বঙ্গাব্দ ধরলে শুভঙ্করের জন্ম তারিখ মহারাজ চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। ১০০৯ সালকে মল্লাব্দ ধরে নিলেও শুভঙ্করের বাল্যজীবন চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে পড়ে না। শুভঙ্করকে বরং বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত করা

সমীচীন। মল্লরাজ গোপাল সিংহ ১৭২০-১৭৫৮ পর্যন্ত বিষ্ণুপুর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ডক্টর মতিলাল দাস তাঁর 'শুভঙ্কর' প্রবন্ধে বাঁকুড়া কালেক্টরীর দপ্তরখানায় রক্ষিত ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখের একখানি রোবকারীর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এই রোবকারী থেকে জানা যায় বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ শুভঙ্করকে পাঁচখানি সনন্দ মারফত ৪'শত ৬৪ বিঘা ভূমি দান করেন। গোপাল সিংহ ১০৩৯, ১০২১, ১০৪২, ১০৪৫, ১০৩৯ এই পাঁচ সালে শুভঙ্করকে ভূমিদান সম্পন্ন করেন। এই সালগুলিও মল্লাব্দ না হলে গোপাল সিংহের রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। শুভঙ্করের দৌহিত্ররূপে পরিচিত শ্যামাচরণ বরাট সেনগুপ্তের গৃহে প্রাপ্ত শুভঙ্করের জীবন বৃত্তান্ত প্রামাণ্য নয় বলেই মনে হয়। পরবর্তীকালে হয়ত শুভঙ্করের জীবনকথা লিখে রাখার এ এক প্রয়াস। বস্তুত এই সব অসঙ্গতি দেখে মনে হয় ঐ জীবনী লেখক ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন। আমাদের ধারণা শুভঙ্কর সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষ অঙ্কে বা অষ্টাদশ শতকের সূচনায় জন্মগ্রহণ করেন। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় West Bengal District Gazetteers : Bankura (1968) ও বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি (মাঘ ১৩৭৭) উভয় গ্রন্থেই 'শুভঙ্করকে' গোপাল সিংহের রাজদরবারের সভাসদরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। শুভঙ্কর যে অষ্টাদশ শতকে মল্লরাজ গোপাল সিংহের দরবারে একজন অমাত্য ছিলেন এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় অন্ততঃ দুটি নিবন্ধে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা করেছেন।৪ তিনি রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা' নামক পুথির ভিত্তিতে দেখিয়েছেন শুভঙ্কর ছিলেন গোপাল সিংহের অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তি। রতন কবিরাজ গোপাল সিংহের কালের লোক, শুভঙ্কর মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজদরবারে সমাদৃত ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় 'মদনমোহন বন্দনা' ও 'আর্যার' পুথি থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে তা প্রমাণ করেছেন। 'বর্গীর হাঙ্গামা' সম্পর্কে শুভঙ্করের অভিজ্ঞতা ছিল, 'বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নূতন কথা' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন—'ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুরে আসিয়া পড়িয়াছে—শুভঙ্কর আসিয়া গোপাল সিংহকে সংবাদ দিতেছেন—

আইলেন ভাস্কর খবর কহে শুভঙ্কর,
তিন লক্ষ ঘোড়া সঙ্গে কর্‌্যা
শুনিয়া চিন্তিত রাজা নানস্থানি হৈল প্রজা
ভাবনা করয়ে মনে মনে।

এই শুভঙ্করই বিখ্যাত শুভঙ্করী প্রণেতা। শুভঙ্কর গোপাল সিংহের অমাত্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি চৈতন্য সিংহের আমলের লোক। কাহারও মতে 'গোপাল সিংহেরও পূর্বেকার, দুটি ধারণাই ভুল।' আর্যাতেও বর্গীর হাঙ্গামার প্রসঙ্গ আছে। পালিত মহাশয় 'শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী' নিবন্ধে তা উদ্ধৃত করেছেন। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের মতের সঙ্গে আমি একমত। এই দুটি কোণ থেকে বাঁকুড়া কালেক্টরীর রোবকারীর সঙ্গে এসব তথ্যের সামঞ্জস্য খুঁজে বার করা যায়। শুভঙ্কর নিজ প্রতিভাবলে বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের অনুগ্রহভাজন হয়ে বিষ্ণুপুর রাজদরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন, হয়ত দীর্ঘজীবন লাভ করায় তিনি চৈতন্য সিংহের রাজসভাও অলঙ্কৃত করেন। যেজন্য চৈতন্য সিংহের প্রসঙ্গও একেবারে অবান্তর নয়। এই সময়েই তাঁর প্রবর্তিত গণিত পদ্ধতি দেশব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি রাজ সম্মান লাভ করেন।

শুভঙ্কর বাঁকুড়া জেলার লোক এটা প্রায় সর্বস্বীকৃত, Buchanan শুভঙ্করকে নদীয়া জেলার কায়স্থ সন্তান বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নদীয়ার স্বপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য যুক্তি মেলেনা। বাঁকুড়া জেলার কোন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এ নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পরগণা সন্নিহিত কোন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেকেই বলেছেন তিনি বিষ্ণুপুরের লোক। শুভঙ্করের দৌহিত্র বংশীয় শ্যামাচরণ বরাট সেনগুপ্তের গৃহে প্রাপ্ত শুভঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় তিনি সোনামুখীর নিকটবর্তী রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় জনৈক লেখক লিখেছিলেন: "Subhankar Ray was born at Palasdanga, a Village about six miles to the north of Sonamuki (Bankura—Damodar River Railway) in the Bishnupur Subdivision of the Bankura district."৫ হেমেন্দ্রনাথ পালিত পলাশডাঙ্গার নিকটবর্তী হদলনারায়ণপুর সন্নিকটস্থ পখন্না বা রাসপুর গ্রামকে শুভঙ্করের জন্মস্থান বলেছেন। (শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫১।) বাঁকুড়া জেলার গেজেটিয়ারের সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ছাতনায়' অন্তত তিনজন এবং বিষ্ণুপুরে একজন শুভঙ্করের কথা জানিয়েছেন।৬ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে রামপুরকেই শুভঙ্করের জন্মস্থান রূপে স্থির প্রতিপন্ন করেছেন।৭ এই গ্রামে শুভঙ্করের বাস্তুভিটা, শুভঙ্কর দীঘি, ও

শুভঙ্কর প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধিকা বিগ্রহের অস্তিত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। রামপুর গ্রামের অবস্থান এবং শুভঙ্কর স্মৃতিময় গ্রামের পুরাকথাও তিনি বিবৃত করেছেন। বিষ্ণুপুর শাখা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে চারখানি শুভঙ্করের পুথি আছে। এই পুথিগুলি পর্যালোচনা করে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একাধিক শুভঙ্করের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। ছাতনায় তিনজন শুভঙ্কর এবং খানসায়ের গ্রামের রত্নেশ্বর ভট্টের পুত্র শংকর ভট্টও শুভঙ্কর উপাধি লাভ করেছিলেন। একাধিক শুভঙ্করের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত 'রামপুর' গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুভঙ্করের দৌহিত্র পরিবারে প্রাপ্ত জীবনবৃত্তান্তে রামপুর গ্রামকে শুভঙ্করের জন্মস্থান বলা হয়েছে।

শুভঙ্করের জন্মপল্লী রামপুর গ্রাম। তিনি বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। শুভঙ্কর যে বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন এ সম্পর্কে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। স্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত লেখক লিখেছিলেন: He was an officer in the revenue serrishta of Bishnupur Raj and, probably, on account of his mathematical skill, was once deputed by the Raj to devise some means of irrigating a tract of Country which was liable to failure of crops and consequent scarcity. He planned and constructed a canal which is still known as the Subhankar Danra (trunk canal) and which, with its distributaries lead down to a tank in Subhankar's homestead. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের সঙ্গে মিল আছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছিলেন শুভঙ্কর বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিংহের মন্ত্রী ছিলেন—আর এই মন্ত্রী শুভঙ্কর গণিতজ্ঞ হিসাবে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শুভঙ্করের সঙ্গে চৈতন্য সিংহের সম্পর্কের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তৎসত্ত্বেও শুভঙ্কর যে মল্লরাজ-দরবারে মন্ত্রী ছিলেন মিত্র মহাশয়ের বিবরণ থেকে তা অবগত হওয়া যায়। বিষ্ণুপুর রাজ্যের মন্ত্রী এই শুভঙ্কর শুধু গণিতজ্ঞই নয় তিনি ছিলেন অসাধারণ পূর্তবিদ্যাবিশারদ। শুভঙ্কর বাঁকুড়া জেলার লোক, তিনি বিষ্ণুপুর রাজ্যের রামপুর পল্লীর অধিবাসী এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পয়ঃপ্রণালীগুলির উদ্ভাবয়িতা গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর। বাঁকুড়া জেলার বাড়জোরা, সোনামুখী ও পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে যে প্রাচীনতম

সেচখাল বা পয়ঃপ্রণালীগুলি আজও বিদ্যমান আছে তা 'শুভঙ্কর দাঁড়া' বা 'শুভঙ্কর খাল' নামে পরিচিত। বাঁকুড়া জেলায় এই শুভঙ্কর খাল গণিতজ্ঞ শুভঙ্করের এক অক্ষয় কীর্তি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে আরও দু-একটি কথা বলা যাবে। শুভঙ্কর যে বাঁকুড়া জেলার লোক 'শুভঙ্কর খাল'ই তার প্রমাণ।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলেও শুভঙ্করকে বাঁকুড়ার লোক বলে গণ্য করতে হবে। শুভঙ্কর প্রবর্তিত আর্যার ভাষায় তার ইঙ্গিত আছে। শুভঙ্করের মূল আর্যা এখন একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য। পুস্তক পুস্তিকায় যে সব আর্যার সাক্ষাৎ মিলে তা মূলের আধুনিকীরণ ও সংশোধিত রূপ। এই আর্যাগুলিতে শুভঙ্কর যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সে ভাষায় নবাবীযুগে বাঁকুড়া অঞ্চলের ভাষা রীতির প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। 'শলি' ও 'মাপ' নামক ওজন মল্লভূমে প্রচলিত ছিল। বাঙলার অন্য কোন অঞ্চলে এইরূপ ওজনের প্রচলন বোধহয় ছিল না। পয়সার অংশ হিসাবে বাঁকুড়ায় 'ছিদাম' প্রচলিত ছিল। শুভঙ্করের আর্যায় 'শলি' 'মাপ ও 'ছিদামের' উল্লেখ আছে।

ধান্য চাউল সর্ষপাদি মাপ পাই যত,
টাকাপ্রতি শলি তার আনায় পড়ে কত।
মাপ প্রতি দশসের শুনহ রচন,
শলি প্রতি পঞ্চ পোয়া আনার ধারণ।
সের প্রতি এক ছটাক পোয়ায় তোলা হয়,
ছটাকেতে এক সিকি শুভঙ্করে কয়।

কড়িকষার মধ্যে 'ছিদামে'র নিয়ম নামে নিম্নোক্ত সংকেত—

কাহনে লইবে পঞ্চ কড়ার ধারণ
চোকে পঞ্চ কাক লবে শুন শিশুগণ,
পণ প্রতি পঁচিশ তিল লবে সাবধানে,
গণ্ডা প্রতি সওয়া তিল লহত এক্ষণে।
কড়া প্রতি সওয়াবালি ধর শিশুচয়
এই মত লেখা কর শুভঙ্করে কয়।

আর্যার ভাষার এই প্রসঙ্গ একেবারে উপেক্ষার নয়। হেমেন্দ্রনাথ পালিত তাঁর 'শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী' রচনায় ধান্য নিয়ে লেখা বারোটি আর্যার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাঁকুড়া ছাড়া অন্য কোথাও 'পাই' 'কোনো' ইত্যাদি মাপের প্রচলন ছিল না। শুভঙ্কর ছাড়া অন্য কারো আর্যায় 'পাই' 'কোনো' ইত্যাদির

উল্লেখ নেই। শুভঙ্করের দাঁড়ার মত 'ধান্যের লেখা' বিষয়ক আর্যাগুলিতে বাঁকুড়ায় প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের যে সব ব্যবহার দৃষ্ট হয় এসব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে শুভঙ্কর বাঁকুড়া জেলার লোক। শুভঙ্করের আর্যার প্রাচীন পুথি-সমূহ পর্যালোচনা দ্বারা ভাষাবিদেরা এসব বিষয়ে আরও আলোকপাত করতে পারেন।

শুভঙ্করের প্রকৃত নাম কি? তাঁর জাতি কি? এসব নিয়েও শুভঙ্করের আলোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। শুভঙ্কর এই নামটি কাল্পনিক বা রাজপ্রদত্ত নয় এমতের পোষকতা করেছেন কেউ কেউ। ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২২শে চৈত্র তারিখের 'সোমপ্রকাশে' বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নামে একজন পত্রলেখক লিখেছিলেন—'অনেকে শুভঙ্কর এই নাম শুনিয়া বলিয়া থাকেন, এটি কাল্পনিক নাম। কিন্তু শুভঙ্কর যখন তাঁহার আর্যার ভণিতার শেষে শুভঙ্কর দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তখন কাল্পনিক নাম হওয়া কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কাল্পনিক নাম হইতে দাস, এই জাতি বা বংশজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইবে কেন?' হেমেন্দ্রনাথ পালিত তাঁর, 'শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী'তেও লিখেছেন 'শুভঙ্কর—উপাধি এ কথার কোন হেতু নাই।' ডক্টর সুকুমার সেন 'বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড অপরার্ধে লিখেছেন 'পরবর্তী কালে একাধিক গণিতজ্ঞ ব্যক্তি প্রধানত কায়স্থসন্তান 'শুভঙ্কর' নাম বা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন'। তিনি আরও লিখেছেন 'চিত্রগুপ্ত ছিলেন যমের দপ্তরে মহাকায়স্থ। মুসলমান অধিকারের সময়ে কায়স্থ শব্দ জাতির নামে পরিণত হইয়াছে বটে কিন্তু হিসাবের কাজ তখনও তাহাদের একচেটিয়া ছিল। সেজন্য আর্যা রচয়িতারা সকলে কায়স্থ না হইলেও ছড়ায় প্রায়ই পড়ুয়া কায়স্থ সন্তানকে উদ্দেশ করিয়াছিলেন।' আবার অনেকের ধারণা 'শুভঙ্কর' এই নামটি রাজপ্রদত্ত। তাঁর দৌহিত্র বংশের বাড়ীতে প্রাপ্ত বিবরণে 'শুভঙ্কর' এই নামটি রাজপ্রদত্ত হিসেবে কথিত। জগন্নাথ দাসগুপ্ত (চৌধুরী) শুভঙ্করের প্রকৃত নাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার বাঁকুড়া (১৩৪৭)র সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপুর শাখা, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' গ্রন্থাগারে রক্ষিত চারখানি পুথি পর্যালোচনা করে একাধিক শুভঙ্করের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর মতে ছাতনায় অন্তত পক্ষে তিনজন শুভঙ্কর ছিলেন। এই তিনজন শুভঙ্করের মধ্যে একজনের প্রকৃত নাম ভবানী মিত্র। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের মন্ত্রী পূর্তবিদ্যাবিশারদ ও গণিতবেত্তা আর একজন শুভঙ্করের কথা তিনি বলেছেন। বিষ্ণুপুর

রাজদরবারের এই শুভঙ্কর ছিলেন জাতিতে কায়স্থ ও 'শুভঙ্কর খাদের' স্রষ্টা ও স্বপ্নদ্রষ্টা। এই শুভঙ্করের প্রকৃত নাম জগন্নাথ দাস। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ তাঁকে শুভঙ্কর উপাধিতে ভূষিত করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যত্র লিখেছেন 'শুভঙ্কর' কারও ব্যক্তিগত নাম নয়। গণিতে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করলে মল্লরাজদরবার থেকে এ উপাধি দেওয়া হত। শুভঙ্কর দাসের আসল নাম জগন্নাথ দাস এবং তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে। এছাড়া ছাতনা নিবাসী আরও তিনজন ও মানসায়ের গ্রামে রত্নেশ্বর ভট্ট নামে (ভট্টসুত শঙ্কর হবে) আর একজন গণিতজ্ঞ 'শুভঙ্কর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।৯ আবার শুভঙ্করের আসল নাম ভৃগুরাম এই মতেরও অনেক পৃষ্ঠপোষক আছেন। ১৮৮০-৮১ সালের Educational Report of Bengal-এ A. W. Garrete M. A. তদানীন্তন ডি পি আই) বাঙলাদেশে গণিত পুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। এই সময়ে Sir A. W. Croft M. A. এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় 'শুভঙ্করী' প্রকাশ করেন। ১২৯৯ সালে প্রকাশিত 'শুভঙ্করীর' একখানি সংস্করণে পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় শুভঙ্করের যে কথঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা থেকে অবগত হওয়া যায় শুভঙ্করের প্রকৃত নাম ভৃগুরাম দাস। আবার স্টেটসম্যান পত্রিকার লেখক নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখেছিলেন: 'The name of the mathematician was Bhriguram Das, by caste a (Bangiya) kayastha. He solved the sciences of quantity and mensuration by simple practical rules which are known as Subhankari Arjaya. Because his system did a great amount of good to the children of the soil, the title of Subhankar Rai, was conferred on him by the Maharaja of Bishnupur. I believe he drew his inspiration in setting down his simple rules from ancient Hindu mathematics written in Sanskrit'.১০ দ্বারকানাথ বসু শুভঙ্করকে কায়স্থ বলে উল্লেখ করেছেন।১১ এই গ্রন্থে শুভঙ্করের জীবনবিষয়ক কোন তথ্য নেই। বিশ্বকোষেও শুভঙ্করের জীবনের দিকটি অনালোচিত। শুধু বলা হয়েছে এই গণিতবেত্তার নাম শুভঙ্কর দাস এবং তিনি জাতিতে কায়স্থ।১২ সোমপ্রকাশের পত্র লেখক বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 'শুভঙ্কর পণ্ডিত' শিরোনাম যুক্ত পত্রখানিতে আরও

লিখেছিলেন 'কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। কারণ তাঁহার প্রণীত আর্যায় 'আশী তিলে কড়া হয় কায়স্থের পো' এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই স্বজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে যখন যত্ন করিয়া থাকেন, তখন কায়স্থের পো ও দাস এই দুই শব্দ দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে তিনি কায়স্থ ছিলেন।' L. S. S. O. Malley, অশোক মিত্র, বি, রায় এরা প্রত্যেকেই শুভঙ্করকে 'শুভঙ্কর রায়' বলে উল্লেখ করেছেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার লেখক Md, Mahmed শুভঙ্করকে বলেছেন শুভঙ্কর রায়। এই সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে কয়েকটি সূত্রে পৌছান যেতে পারে। সেগুলি হচ্ছে (১) শুভঙ্কর দাস প্রকৃত নাম (২) শুভঙ্কর নামটি বিষ্ণুপুররাজ কর্তৃক প্রদত্ত (৩) তাঁর প্রকৃত নাম জগন্নাথ, ভৃগুরাম ভবানী কিংবা রত্নেশ্বর ভট্টসুত শঙ্কর এগুলির মধ্যে একটি এবং জগন্নাথ নামটিই অধিক গ্রাহ্য। (৪) তিনি জাতিতে কায়স্থ কিন্তু তাঁর বংশধরগণের কাছে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায় শুভঙ্করের উপাধি ছিল দাসগুপ্ত (চৌধুরী) দৌহিত্র বংশের উপাধি বরাট (সেনগুপ্ত) এজন্য কিছু সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন 'সেন' উপাধিধারী কায়স্থ শুভঙ্করের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এমনকি একাধিক কায়স্থ শুভঙ্কর ছিল বলে তাঁর ধারণা। হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় তাঁর 'শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী' রচনায় প্রায় একশত নব্বই বৎসর পূর্বের একখানি আর্যার পুথিতে শুভঙ্কর সেন ভণিতার কথা জানিয়েছেন। শুভঙ্কর এই নামটি রাজপ্রদত্ত বলে যে সব অভিমত রয়েছে পালিত মহাশয় তা অস্বীকার করেছেন। 'রায়' ও 'দাস' উপাধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দাস' উপাধিকেই গ্রাহ্য করেছেন। ভৃগুরাম পৃথক ব্যক্তি। ভৃগুরাম আর্যা লেখক ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ পালিত তাঁর 'শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী' নিবন্ধে আর্যার পুথি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন ভৃগুরাম ও শুভঙ্কর এক ব্যক্তি নন। ভৃগুরাম বাঁকুড়াবাসীও ছিলেন না। ভৃগুরাম ও শুভঙ্করের ভণিতাতেও পার্থক্য আছে। শুভঙ্কর অঙ্ক লিখেছেন ভৃগুরাম অঙ্কের উত্তর করেছেন। তবে তিনি কোন রাজার অধীনে আমিন ছিলেন। একখানি আর্যায় ভৃগুরামের এই পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। .

অকস্মাৎ সৈন্যতে ভাঙ্গিল সর্বগ্রাম
নিজ গ্রামে আমিন আইল ভৃগুরাম।

ভৃগুরাম যে পৃথক ব্যক্তি পালিত মহাশয়ের উক্ত নিবন্ধে এতদবিষয়ে বিশদ

ও যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা আছে। শুভঙ্কর দাস শুভঙ্করের প্রকৃত নাম এই যুক্তি একেবারে উপেক্ষার নয়। তবে বর্তমান লেখকের অনুমান কায়স্থ জগন্নাথ দাস সামান্য অবস্থা থেকে প্রতিভা বলে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদরবারে মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করেন। গণিত ও পূর্তবিদ্যায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার জন্য তিনি বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ কর্তৃক 'শুভঙ্কর' উপাধিতে ভূষিত হন।

শুভঙ্করের জীবন দেশ ও কাল সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে আমাদের ধারণা উপস্থিত করেছি। তাঁর প্রবর্তিত গণিত পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে দু-একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুভঙ্কর কি মৌলিক গণিতপদ্ধতির উদ্ভাবক? না কোন পুরাতন পদ্ধতিকে তিনি জনপ্রিয় করেন। এই লেখকের ধারণা শুভঙ্কর নিজেই শুভঙ্কর-রীতির প্রবর্তক। দেশীয় গণিত শিক্ষণপদ্ধতিকে তিনি সরলীকৃত করেন। পয়ার শ্লোকে সুললিত ছন্দে শুভঙ্করী গণিত শাস্ত্রকে সহজ ও সাধারণের সম্পত্তি করে তোলেন। গণিতের মত কঠিন বিজ্ঞানকে সুগম ও সরল করে তোলা সহজ মনীষার কাজ নয়। অবশ্য কবিতার ছন্দে গণিত ব্যাখ্যা প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। প্রাচীন ভারতে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, লীলাবতী, শ্রীধরাচার্য, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণ আর্যা রচনার রীতি প্রবর্তন করেন। এ সম্বন্ধে কেউ কেউ উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন। ১৩ পয়ারবদ্ধ গণিত সূত্রগুলিকে আর্যা বলা হয়। আর্যা হচ্ছে প্রাকৃত কবিতার বিশিষ্ট ছন্দের নাম। প্রাকৃতে এই ধরনের গণিত সূত্র আর্যা ছন্দে গ্রথিত হত। সংস্কৃতে লেখা গণিত নিবন্ধেও প্রায়ই আর্যা ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের শতাধিক বৎসর পূর্বে শুভঙ্করী-রীতি সমগ্র বাঙলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর আর্যাগুলি পর্যালোচনা করলে স্থির ধারণা হয় নবাবীযুগের বাঙলাদেশে শুভঙ্করীরীতি প্রবর্তিত হয়। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রভাবে শুভঙ্করের যেসব আর্যাগুলি বহুল প্রচলিত হয়েছিল, সেগুলি যে অনেকাংশে পরিশোধিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুভঙ্কর যে ভাষায় এগুলি রচনা করেছিলেন সেই মূল রচনা বোধহয় এখন দুষ্প্রাপ্য। পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় 'শুভঙ্করী' গণিত পুস্তকগুলির বহুল প্রচার করেন। হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় প্রাচীন পুঁথির দৃষ্টান্তে 'শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী' নিবন্ধে বলেছেন—পঞ্চাননবাবুর 'শুভঙ্করীর' আর্যার সহিত প্রাচীন পুঁথি ও খাতার আর্যা মিলাইয়া দেখিয়াছি। একটিও মিলে না। পঞ্চাননবাবুর 'শুভঙ্করীতে' শুভঙ্করের আর্যা নাই বলিলেই হয়। যাহা আছে তাহা অপরের রচনা।' তথাপি এই প্রচলিত আর্যাগুলিতে অধুনা অপ্রচলিত বহু দেশজ শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এছাড়া হিন্দুস্থানী ফারসী ও বহু ইসলামী প্রয়োগ আর্যাগুলি থেকে খুঁজে বার করা কঠিন নয়। আর্যাগুলি বহিরাগত পশ্চিমী প্রভাবশূন্য। সুতরাং শুভঙ্কর যে মুসলমান শাসনকালে তাঁর রচিত পদ্ধতি প্রচার করেন এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শুভঙ্করীর পুরাতন সংস্করণ অধুনা একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য। বাঙলাদেশের বহু গৃহস্থ ঘরে অনুসন্ধান করলে হয়ত পুরানো 'শুভঙ্করী' পুস্তক খুঁজে পাওয়া যাবে। বহু সংগ্রহশালায় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে শুভঙ্করের আর্যার পুথি রক্ষিত আছে। শুভঙ্কর মূলত দেশীয় প্রথায় গণিতরীতি প্রচলন করেন। মুদ্রিত 'শুভঙ্করী' পুস্তকে যে বিষয়গুলির উপর আর্যা দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে, বিঘাখালি, কাঠাখালি, কড়িকষা, জমাবন্দী, মনকষা, সেরকষা, বাটাকষা, সুদকষা, কাগজকষা, মোকরা কড়িকষা, মোকরা জমাবন্দী, পিতলকষা, ত্রিকোণকালি, নিটনকালি, পুষ্করিণীকালি, নৌকাকালি, মোকরা সুদকষা, মোকরা বাটাকাটা, মাথট, খালসায়েরী, সমান আনামাসা, বাজারওজন, বদল বা হুণ্ডি, যোগ খড়ি, গুণখড়ি, অস্থিরপঞ্চক, ইটকালি, শস্য মাপিবার প্রণালী, কাল পরিমাণ প্রণালী, ভাঙ্গা তেরিজ, আভাঙ্গাহরণ বা ভাগাহার প্রভৃতি। শুভঙ্করের মূল পুথিতে আরও বহু বিষয়ের উপর আর্যা আছে। ১৪ এই সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর শুভঙ্কর নিজস্ব মৌলিক প্রণালীতে গণিতসূত্র প্রণয়ন করেন। এই সূত্রে শুভঙ্করের গণিতরীতির দু-একটি আর্যা এখানে উদ্ধৃত করছি—

বিঘাকালি ও কাঠাকালি :—কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে,
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে।
কাঠায় কাঠায় ধুলপরিমাণ,
বিশগণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ।
গণ্ডা বাকি থাকে যদি কাঠা নিলে পর।
যোল দিয়া পুরে তারে সারা গণ্ডা ধর।

পুকুরকালি :— পুকুর কালির কথা কহি শুন সবে
দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুইদিকে যতেক মাপিবে।
একদিকে পাকা আর একদিকে কাঁচা লবে।
পাকার উপরে কাঁচা কড়ি দর হবে॥
সারাকালি হবে যত করিয়া কাহন।
উর্দ্ধ দিয়া সারা পুরে নিকর গণন॥

গণিয়া অঙ্কের মধ্যে যত তঙ্কা হয়।
নির্জাস কাহন সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

জমাবন্দি :— জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর ॥
যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট।
গণ্ডা প্রতি ষোল তিন ঘুচাও কপট ॥
কড়া প্রতি চার তিন শুভঙ্কর ভণে।
জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

মনের দর হইতে সের :— মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর ॥
আনা প্রতি দুই কড়া বুঝহ সুশীল।
গণ্ডা প্রতি ধরিয়া লইবে অষ্ট তিল ॥
কড়া প্রতি দুই তিল শুভঙ্কর ভণে।
মণ কষা কর শিশু আনন্দিত মনে।

শুভঙ্করীর গণিতরীতি শুভঙ্করের অক্ষয় কীর্তি, শুভঙ্করের প্রণালী বা নিয়ম অবলম্বন করে অনেকেই আর্যা রচনা করেছেন। পরবর্তী আর্যা লেখকদের মধ্যে ভৃগুরাম দাস, বিশ্বেশ্বর দাস, গুণনিধি, ফকিরবাম দাস, শিবচরণ দাস, গোবিন্দ রায়, নবীনমোহন, চিন্তামণি, পেলারাম দাস, ডাক. শ্রীহেমন্ত দাসী, ধুলদত্তি, সদাশিব দত্ত, দত্ত রঘুনাথ, রামানন্দ, মহাদেব, ভূষণ, ভুবনমোহন, নারায়ণ, হরেকৃষ্ণ দাস, জয়রাম, বিজয়রাম, কমলাকান্ত, ধনঞ্জয় দাস, দ্বিজ বৈদ্যনাথ, কবি কালিদাস, মদন রায়, শ্রীকৃষ্ণচরণ, অনুপাচন্দ্র ভট্ট, রাজেশ্বর ভট্ট, শঙ্কর ভট্ট, তিতু ভট্ট, নরসিংহ, ক্ষমানন্দ, দীনদয়াল দাস, গন্ধর্ব রায়, শ্রীকবিভূষণ প্রভৃতি অনেকেই শুভঙ্করের অনুকরণে আর্যা রচনা করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন ও হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় এই সব আর্যা লেখকদের একাধিক পুথির কথা বলেছেন। এই সকল আর্যা-লেখকগণের মধ্যে ভৃগুরামই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। আর্যা-লেখকদের অনেকেই শুভঙ্করের আর্যা আত্মসাৎ করেছেন এমন নজিরও পাওয়া গেছে। শুভঙ্কর প্রবর্তিত কাঠাকালি, বাসেভাঙ্গাহরণ, দোভাঙ্গা-হরণ প্রভৃতি গণিত পদ্ধতির উপর কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। ১৫ গণিতের বিভিন্ন শাখায় শুভঙ্করের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বিস্ময়াবহ। সেজন্য গত যুগের কেউ কেউ তাঁর শুভঙ্করী-রীতিকে 'Bunyan's Pligrim's Progrss-এর

সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার কথা স্মরণ করে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে একটি ইংরেজী সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল—Subhankar was a practical genious of Vishnupur near Bankura, allmost as Versatile apparently as Leonard Da-vinci, he taught Bengal and Orisssa to calculate, and out of gratitude by gone his name to the processes he taught' নিবন্ধটিতে আরও বলা হয়েছে, 'Like Euclid he gave his name to the doctrine' শুভঙ্কর গণিতজ্ঞ, শুভঙ্কর লোকশিক্ষক, সেজন্য শুভঙ্করের আসন ছিল বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। কেবল তাই নয় সমগ্র বাঙলাদেশ ও উড়িষ্যা জনপদে শুভঙ্করের প্রভাব ব্যাপক। এমনকি আসাম প্রদেশেও শুভঙ্করের নামে গণিতের ছড়া আছে।১৬ বাঙালী ঘরের গৃহবধূরাও শুভঙ্করের দৌলতে সুগৃহিণীর মর্যাদালাভ করতেন। উড়িষ্যা প্রদেশে এবং কটক র‍্যাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলের কোন কোন ছাত্র উড়িষ্যায় শুভঙ্করের প্রভাবের কথা বলেছেন।১৭ এই সূত্রে Herbert A. Stark-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বাঙলার শিক্ষা জগতে শুভঙ্করের জনপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে W Adam তাঁর Education report-এ যা বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'The only other written Composition used in these Schools and that only in the way of oral dictation by the master, consists of a few of the rhyming arithmetical rules of Subhankar a writer whose name is as familiar in Bengal as that of 'Cocker' in England without any one knowing who or what he was, or when he lived. It may be inferred that he lived or is not a real personage, that the rhyming bearing that name were composed before the Establishment of British rule in this Country, and during the existence of the Mussalman power, for they are fully Hindustani or Persian term, and contain references to Mohammadan usages without the remotest allusion to English practices or modes of calculation.১৮ বিলেতি শিক্ষা পদসঙ্কারণের যুগেও শুভঙ্করের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা অবগত হওয়া যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রবর্তনের সঙ্গে চুঁচুড়ার Rev. R. May দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে একখানি গণিত পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকখানিতে শুভঙ্কর পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল বলে অবগত হওয়া যায়। পর বৎসরেই অর্থাৎ ১৮১৮ সালে J. Harle 'স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে 'গণিতাঙ্ক' নামে আর একখানি পুস্তক বিলেতি পদ্ধতিতে প্রণয়ন করেন। হার্লের এই পুস্তক-

সমাদৃত হয়নি—কিন্তু শুভঙ্কর-রীতি অবলম্বন করায় Rev. R. May-র পুস্তকখানি ব্যাপক জনসমাদর লাভ করে। দেশীয় পদ্ধতি বা শুভঙ্করী-রীতি যে জনপ্রিয় ছিল এই সংবাদে তার আভাস পাওয়া যায়। ১৮৪৬ ও ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হার্লের 'গণিতাঙ্কে'র দুটি সংস্করণ দেখেছি কিন্তু সংস্করণ দুটিতে শুভঙ্করীর অঙ্ক যুক্ত হতে দেখা যায়। মনে হয় 'হার্লে' শুভঙ্করের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তাঁর পুস্তকে শুভঙ্কর-রীতির একটি অধ্যায় যুক্ত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি'র পক্ষে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'গণিতসার' নামে একখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুভঙ্করের' কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। এই সমস্ত সংবাদ থেকে গত শতকেও শুভঙ্করের জনপ্রিয়তার কথা অনুভব করা যায়।

গত শতকের শিক্ষাজগতে শুভঙ্করের মত আর একজন গণিতবেত্তা বাঙালীর কথা মনে পড়ে, ইনি 'উগ্র বলরাম'। একদা বাঙলাদেশের শিক্ষা জগতে এই 'উগ্র বলরাম'ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিলেন। Adam তাঁর Third report on the state of Education in Bengal 1838 লিখেছেন—'The arithmetic of Ugra Balaram, consisting of practical and imaginary examples which are worked out' Adam-এর সময়ে 'উগ্র বলরামের' নামে প্রচলিত গণিতপদ্ধতি পুঁথি পাণ্ডুলিপির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই উগ্র বলরাম কি শুভঙ্করের সমসাময়িক, উগ্র বলরামের কাল কি? পণ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাগণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। এ সময়ে 'শিশুবোধ' নামক একখানি মুদ্রিত পুস্তকে শুভঙ্করের কিছু বিধি আর্যা মুদ্রিত হয়েছিল। Adam এর রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তিনি সম্ভবত বাঁকুড়া পর্যটন করেননি কিন্তু সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলগুলি সমীক্ষা করে বুঝেছিলেন—তৎকালে প্রচলিত গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভঙ্কর ও উগ্র বলরামের খ্যাতি ছিল। শুভঙ্কর ও উগ্র বলরামের গণিত পদ্ধতি পাশাপাশি চললেও শুভঙ্করের জনপ্রিয়তা ছিল বেশী। বেদনার কথা, বাঙলার শিক্ষাজগতে শুভঙ্কর ও উগ্র বলরামের মত দিকপাল ও প্রতিভাধরদের কাহিনী আজও দেশের ঐতিহ্য গৌরবের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। Adam শুভঙ্কর ও উগ্র বলরামের কালের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন, তাঁর পক্ষে এদের জীবনী উদ্ধারের যে সম্ভাবনা ছিল এ যুগে তা সম্পন্ন করা খুবই কঠিন।

শুভঙ্করের কালে দেশের পথ ঘাট ছিল অগম্য ও মধ্যযুগীয়। বিজ্ঞানের

জয়যাত্রা তখনও সূচিত হয়নি। ষ্টীমইঞ্জিন, মোটর, বিমান বা বিদ্যুতের বিস্ময়কর বার্তা মানুষের সমাজকে আলোড়িত করেনি। আবিষ্কৃত হয়নি মুদ্রাযন্ত্র, প্রচলন ছিল না কাগজের। বাঙলাদেশের এই মধ্যযুগীয় সমাজে শুভঙ্করের এই গণিত পদ্ধতি কি ভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল তা অনেককেই ভাবিত করবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতিও বিনাশী কালকে অতিক্রম করে আজও বেঁচে আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলাদেশের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদের অনেকেই রাজ অনুগ্রহ পেয়েছেন। রাজপৃষ্ঠপোষণে এদের জ্ঞান পাণ্ডিত্য কবিত্ব জনসমাজে প্রচারিত হয়েছে। শুভঙ্কর বিষ্ণুপুর রাজদরবারে বরেণ্য মন্ত্রী ছিলেন, তিনি যে মল্লরাজদরবারে রাজকর্মচারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর একটি আর্যায় আছে।—

নৃপতি সহিতে শুভঙ্কর গেলা মৃগয়া করিতে।
হেন কালে পুষ্করিনী দেখে আচম্বিতে॥
পুষ্করিনীর ষোল যোজন ধনু দুই ষোল জল।
জলের মধ্যে মৎস্য করে কলবল,
অর্ধ অঙ্গুলি ছাড়া মৎস্য নাচিতে লাগিল।
রাজা বলে শুভঙ্কর কত মৎস্য হৈল।

তাঁর রচিত আর্যার মধ্যে এই রকম অন্তর্নিহিত প্রমাণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তদুপরি শুভঙ্কর গণিতবিজ্ঞান ও পূর্তবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ তাঁকে সম্মানিত করেন। শুভঙ্করের গণিতপদ্ধতি প্রচারের ব্যাপারে বিষ্ণুপুর রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষণার দিকটি অনুমান করা যায়। এই সূত্রে স্টেটসম্যান পত্রিকার লেখক নগেন্দ্র মিত্রের ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। তিনি লিখেছেন: He being at the helm of affairs at Bisnupur and at his command many scribes who used to copy his manuscript on palm leaves and distribute them in pathsalas at Bisnupur and the copies spread live fire from one Gurumahasaya to the neighbouring Gurumahasayais Village scribes used to copy the palm leaf copies of course on the introduction of the printing press in Calcutta Subhankari was printed and distributed or translated in the vernaculars of each province and then printed and distributed.'

শুভঙ্কর প্রবর্তিত শুভঙ্করী গণিতরীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপ্ত করে

বাঙলাদেশের মানুষকে গণিত শিক্ষায় প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই শুভঙ্করী রীতি আজ শিক্ষাবিভাগ থেকে নির্বাসিত। শুভঙ্কর বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। শুভঙ্করী পদ্ধতিতে একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। শুভঙ্কর তাঁর গণিতরীতি প্রণয়নের সময় কেবলমাত্র বাঙলাদেশকেই সম্মুখে রেখেছিলেন। বাঙলাদেশের মুদ্রা ওজন জমিজমার হিসাব প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তিনি শুভঙ্কর প্রণালী প্রবর্তন করেন। কালক্রমে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বিদেশী মডেলে নতুন নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হতে থাকে। মেট্রিক ইলেকটিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকসমাজ 'শুভঙ্করী'কে অবহেলা করতে থাকেন। মনসাংক গণিত অপেক্ষা Arithmetic of understanding এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। এইরূপে ইংরেজ শাসনের সময়ে শুভঙ্কর উপেক্ষিত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতার পরবর্তীপর্বে আমাদের মুদ্রা ওজন সবকিছুই যুগোপযোগী বিবেচনায় পরিবর্তিত হয়। ফলে অচিরকাল মধ্যে শিক্ষাজগত থেকে শুভঙ্করের বিদায় সম্পন্ন হয়ে যায়। এইরূপে বাঙলাদেশের এক অসাধারণ গণিত-প্রতিভা নির্বাসিত হন বিস্মৃতির অন্ধকার রাজ্যে।

বিষ্ণুপুর রাজ্যের মন্ত্রী শুভঙ্কর শুধু গণিতজ্ঞই নন তিনি ছিলেন অসাধারণ পূর্তবিদ্যাবিশারদ। শুভঙ্কর বাঁকুড়া জেলার লোক। তিনি প্রাচীন বিষ্ণুপুর পরগণার অধিবাসী এবিষয়ে পূর্ব অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। বাঁকুড়া জেলার প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালীগুলির উদ্ভাবয়িতা গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর। বাঁকুড়া জেলার বাড়জোরা সোনামুখী ও পাত্রসায়র থানার অন্তগত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে যে প্রাচীনতম সেচখাল বা পয়ঃপ্রণালীগুলি বিদ্যমান আছে তা আজও 'শুভঙ্কর দাঁড়া' বা 'শুভঙ্কর খাল' নামে পরিচিত। শুভঙ্কর তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং বিজ্ঞান বুদ্ধির বলে বাঁকুড়ার উষর মরুর বুকে শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করেছিলেন। 'শুভঙ্কর খাল বা দাঁড়া' শুভঙ্করের স্মৃতির অক্ষয় কীর্তি। গণিতবেত্তা শুভঙ্করই যে 'শুভঙ্কর খালের' উদ্ভাবয়িতা গত যুগের এবং একালের ঐতিহাসিকগণ তা স্বীকার করেছেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার Md. Mahmed-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। L. S. S. O.-Malleh এ সম্পর্কে লিখেছেন "There are no natural lakes or canals or artificial water courses in the district except an artificial channel, called the Subhankari khal, which is popularly attributed to the famous Bengali mathematician Subhankar Rai'[১৯] বাঁকুড়ার প্রাক্তন কালেক্টর

এস, এন, রায় এই খালগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট কালে লিখেছিলেন 'The Danra which is a monument of the foresight and the public spirit of Subhankar Rai'২০ P. W. D. বিভাগের জেলা সেচ ও খাল সংস্কার বিভাগের অধিকর্তা লিখেছেন 'The Subhankar Danra system is a combination of canals which are said to have been constructed by the wellknown Bengali mathematician, Subhankar Roy, while he was Dewan of Bisnupur, for reclaiming 20'000 acres of Jungle land.'২১ এ ছাড়া District census Hand book; Bankura (1951 ও 1958) এই দুইখানি গ্রন্থেও অশোক মিত্র ও বি, রায় শুভঙ্কর খাল খননে গণিতবেত্তা ও বিষ্ণুপুর রাজ্যের মন্ত্রী শুভঙ্করের দূরদৃষ্টি ও পূর্তবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার কথা বলেছেন। এই সূত্রে মতিলাল দাসের নিজের নিবন্ধটিও মূল্যবান। 'বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের' সম্পাদক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন: The Subhankar Khal, ...The construction of which is traditionally attributed to the great Bengali mathematician Subhakar Das, a minister of Gopal Singh, the Malla king ot Bishnupur, who reigned between 1730 and 1745 A. D.' (West Bengal District Gazetteers Bankura (1958) P-21) বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে গোপাল সিংহের রাজত্বকাল (১৭২০-৫৮) করেছেন। 'শুভঙ্কর দাঁড়া ও খাল' সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর এই গ্রন্থে বলেছেন 'ইমারত ছাড়াও যে পুরাকীর্তি হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোনামুখী থানার উত্তরাংশে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত শুভঙ্কর দাঁড়া ও বড়জোড়া থানার অনুরূপ এলাকায় শুভঙ্কর খাল। জলসেচের জন্য নির্মিত কাটা খালকে বাঁকুড়ার কথ্য ভাষায় বলে দাঁড়া। সোনামুখী বড়জোড়া অঞ্চলের চিরন্তন জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই কৃত্রিম জলপথগুলি খৃষ্টিয় আঠার শতকের প্রথমার্ধে, মল্লরাজ গোপাল সিংহের রাজত্বকালে (১৭২০-১৭৫৮) তাঁর সভাসদ, সুপরিচিত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাসের পরিকল্পনা অনুসারে খনন করানো হয়েছিল।'২২ আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে, আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান যখন বাঙলাদেশে তথা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তখনকার পরিকল্পিত এই বিস্তীর্ণ সেচ ব্যবস্থা। মন্দিরময় বাঁকুড়া জেলায় অন্যধরণের এক

আশ্চর্য পুরাকীর্তি। শুভঙ্কর খাল সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এমনতর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। শুভঙ্কর যে বাঁকুড়া জেলার লোক 'শুভঙ্কর দাঁড়া বা খাল' তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাঁকুড়ার সর্বপ্রাচীন সেচ ব্যবস্থার নিদর্শন এই শুভঙ্কর দাঁড়া বা খাল। এই শুভঙ্কর খালের পরিকল্পনা করেন শুভঙ্কর। মল্লরাজ গোপাল সিংহের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই বিস্তীর্ণ খালটি খনিত হয়। যতদিন এই খাল ও পয়ঃপ্রণালী সমষ্টি জলধারা বুকে করে ঊষর ও কংকরময় ভূভাগকে সজীব শ্যামল করে রাখবে গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর ততদিন আপন অবিনশ্বর মাহাত্ম্যে লোকসমাজে পূজিত থাকবেন। এই খালগুলি খনন করে শুভঙ্কর বাঁকুড়ার ঊষর মরুর বুকে শস্যলক্ষ্মীর বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিলেন। দেশপ্রেমিক শুভঙ্করের বিজ্ঞানবুদ্ধির বলে বাঁকুড়া একদা পরিত্যক্ত ও জনহীন প্রান্তর কলকোলাহল মুখর জনপদে পরিণত হয়।

শুভঙ্করের গণিত পুস্তকের নাম 'শুভঙ্করী'। এই শুভঙ্করীর প্রচারক পঞ্চানন ঘোষ। শুভঙ্কর নামে কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন কিনা জানা যায় না। শুভঙ্করীর পূর্বে 'শিশুবোধ'কে শুভঙ্করের আর্যা সংকলিত হয়েছিল, 'শিশুবোধ'কের দুষ্প্রাপ্য কপি অনুসন্ধান করেও পাইনি। গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিতগণ শুভঙ্করের আর্যা সংগ্রহ করতেন, আর্যাগুলি নিজ নিজ খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এই সমস্ত শিক্ষকগণই বোধহয় খাতায় লিখিত আর্যাগুলিকে 'শুভঙ্করী' বলতেন। শুভঙ্করী নামের উৎপত্তি বোধহয় এই রকম করে। কারণ 'শুভঙ্করের' নামে প্রচারিত ও বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত পুথিগুলিতে কোথাও শুভঙ্করী শব্দের উল্লেখ নেই। প্রত্যেকটিতেই 'আরজা লিখ্যাত আছে'। হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শুভঙ্করের অপর রচনা 'কাগজসার' ও 'ছত্রিশ কারখানা'। এই দুটি বিষয়ের পুথিও বিভিন্ন পুথিশালায় সংগৃহীত আছে। হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় জানিয়েছেন শুভঙ্কর 'কাগজসার' লিখেছিলেন। তিনি কাগজসার পুস্তকের বিষয়-বস্তুরও পরিচয় দিয়েছেন। 'ছত্রিশ কারখানা' তাঁর এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষে' যেরূপ বর্ণিত আছে এখানে তা উদ্ধৃত করছি 'কায়স্থপ্রবর শুভঙ্কর দাস নবাবী আমলের রাজকীয় বিভাগের পরিচয় দিবার জন্য 'ছত্রিশ কারখানা' রচনা করেন, গ্রন্থখানি ঐতিহাসিকের নিকট অতি মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। দুইশত বৎসর পূর্বে মুসলমান নবাব সরকারে বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল ও কি নিয়মে পরিচালিত হইত, শুভঙ্কর সবিস্তারে

তাহার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানির শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০। এই পদ্য গ্রন্থে মুসলমান রাজসরকারের ব্যবহৃত বহু পারসী শব্দ দৃষ্ট হয়।'২৩ কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন, 'কাগজসার' ও 'ছত্রিশ কারখানাকে' অর্বাচীন রচনা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।২৪

বাঙলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জগতে শুভঙ্কর একটি অবিস্মরণীয় নাম, কিন্তু শুভঙ্কর আজ বিস্মৃত। শিক্ষা জগত থেকে শুভঙ্কর বহিষ্কৃত, বাঙলাদেশের পাঠশালা মাদ্রাসা মোক্তবে ছেলে-মেয়েরা এখন আর সুর করে 'শুভঙ্করী' পড়ে না। যুগ পালটেছে। যুগজোয়ারে অনেক কিছুই ভেসে যায়। প্লাবনের মুখে ক্ষতিও হয় অনেক, শুভঙ্করের গণিতপদ্ধতি কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রীর সমাজে আবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন লোকশিক্ষক। আপামর বাঙালীর হৃদয়রাজ্যে তাঁর আসন ছিল। গণিত বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা বিস্মৃতিযোগ্য নয়। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে শুভঙ্করের অবদানের দিকটি এখনও অনুল্লিখিত আছে। স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' ২য় খণ্ডে (১৩৪২) শুভঙ্করের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু জীবনেতিহাসের দিকটি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে, গতযুগের রক্ষণশীল গুরুমহাশয়ের গৃহে অনুসন্ধান করলে হয়ত আজও শুভঙ্কর রচিত গণিতের নির্ভরযোগ্য পুথি আবিষ্কৃত হতে পারে, বিভিন্ন গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে শুভঙ্করের যে সব পুথি রক্ষিত আছে সেগুলিও শুভঙ্কর সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করতে পারে। এইরূপ কোন প্রামাণ্য পুথি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়া উচিত, শুভঙ্করের যথার্থ জীবনবৃত্ত অচিরে রচিত হলে বাঙালীর কলঙ্ক মোচন হবে। এই জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য আমি বাঙলাদেশের সুধী পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকবৃন্দের কাছে সাদর আমন্ত্রণ রাখছি। বহুপূর্বে ইংরেজ শাসনকালে একজন বিদেশী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিভাগের কর্তা বাঙলাদেশের এই অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিভার অবমাননা লক্ষ্য করে দুঃখিত হয়েছিলেন। সেই Herbert A. Stark সেদিন যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেই কথা দিয়েই 'শুভঙ্কর' প্রসঙ্গে উপসংহার করছি—

'So much so that a subject which once called forth spontaneous admiration for its excellence, now raises surprise by its difficiency. A lesson which formerly kept the Class keen and alert, now all but puts them to sleep. Let us go back to Subhankar, and Subhankari. What was it ? Who was he ?'

উল্লেখ পঞ্জী

১। সুকুমার সেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড, অপরার্ধ (২য় সংস্করণ ১৩৪৭) পৃঃ ৫২৪-২৭

২। মতিলাল দাস। শুভঙ্কর। মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৩৭

৩। West Bengal District Gazetteer : Bankura, 1958

৪। হেমেন্দ্রনাথ পালিত। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নূতন কথা। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১

৫। Md. Mahmed. Subhankar. The Statesman, 5th September, 1928

৬। West Bengal District Gazetteers, Bankura, 1958, P. 21

৭। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, ১৩৫১, পৃঃ ১১১-১১৪

৮। বিনয় ঘোষ। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৬৬, পৃঃ ৫১৫-৫১৬

৯। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, ১৩৫১, পৃঃ ১১৫-১১৬

১০। Nagendra Nath Mitra. Subhankar, The Statesman, 8th. September. 1928

১১। দ্বারকানাথ বসু। জীবনীকোষ ১৮৯৪, পৃঃ ২৭১

১২। নগেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্বকোষ, ২০ ভাগ, ১৩১৬, পৃঃ ৫১০

১৩। (ক) B. B. Dutta and Singh. History of the Hindu Mathemetics—1962

(খ) O. P. Jaggi. Scientists of Ancient India, 1956

১৪। প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫১

১৫। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভঙ্কর। ভারতবর্ষ (বিবিধ প্রসঙ্গ), কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

১৬। সুকুমার সেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৫

১৭। Nagendra Nath Mitra, Subhankar, The Statesman, 8th September —1928

১৮। Adam's Report on the State of Education in Bengal (1835-38) Ed. by A. N. Bose

১৯। L.S.S. O-Malley. Bengal District Gazetteers, Bankura 1908, P. 7

২০। মতিলাল দাস। শুভঙ্কর। মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৩৭

২১। ঐ

২২। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি— 1958 পৃঃ ১১৫-১১৬

২৩। নগেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্বকোষ। অষ্টাদশ ভাগ—১৩১৪, পৃঃ ১৮২

২৪। সুকুমার সেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড, অপরার্ধ—১৯৬৫, পৃঃ ৫২৪

নির্ঘণ্ট

অক্ষয় চরিত ১৪
অক্ষয়কুমার দত্ত ৮২, ৯৬
অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত ৯৬
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১০, ৮৩
অগিলভি ৬৪
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮১, ৮৩
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ৯৫
অনুশীলন ৯৩, ৯৭
অনুসন্ধান ৯৭
অমরকোষ ৫১, ৫২
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৬, ২৬০-২, ২৭০
অমৃতবাজার পত্রিকা ৪৪, ৭৮, ৮১, ৮৬-৮৭, ১১১,
অমৃতলাল বসু ৯৭, ৯৯
অরুণকান্ত নাগ ১২৭
অম্বিকাচরণ ঘোষ ৪১, ৪৭
অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৭২-৩, ২৩১, ২৩৭
আজিমুদ্দিন খাঁ ২৭
আনন্দকৃষ্ণ বসু ১৮
আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ৩৯
আনন্দমোহন বসু ৬৪, ৮১, ১১৬
আমীর আলি ১০
আর (শিক্ষক) ৭
আরমস্ট্রং ৮৩
'আর্নল্ড অফ্ দি ইস্ট' ৩২
আর্যদর্শন ৯৩, ৯৭
আর্যভট্ট ৬১
আলেকজান্ডার ডাফ ৪, ৫
আশুতোষ চৌধুরী ৮১, ৮৮
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৭০, ৭৩, ৮০, ৮৮ ১১৯, ১২১, ২৪৭
আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় ৬৩
ইংলিশম্যান ৬, ১১, ১২
ঐ শোক সংবাদ (হরিচরণ দাস) ৫৮-৬০
ইউব্যাঙ্ক (স্যার) ১১৪
ইডেন হিন্দু হোস্টেল ২৫
ইণ্ডিয়ান নেশন ৮, ৯, ১২, ৮৫
ইণ্ডিয়ান খৃশ্চিয়ান হেরাল্ড ১২
ইণ্ডিয়ান মিরর :-
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
ঈশানচন্দ্র ঘোষ (জীবনী) ১৪৩-৫৬
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবনী ১-১৫),
ঐ ৪১, ৮৮
ঈশ্বরচন্দ্র দাস ১০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮, ২৪, ২৫, ২৭, ৫১, ৫৬, ৮২, ১১৮
উইলকিনসন্স স্কুল ৫, ৯,
উইলিয়ম গ্রে (স্যার) ২৯
উড্রো, এইচ ২৬, ৩১, ৪৩, ৪৫
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১১৬

উপেন্দ্রনাথ সিংহ ৮০
উমানাথ গুপ্ত ৮২
উমেশচন্দ্র দত্ত (জীবনী ৩৩-৪৯), ৪১, ৫৫
উমেশচন্দ্র দাস ৫৮
এ নেশন ইন মেকিং ২৮
এটকিনসন ২৪, ২৫
এডওয়ার্ড (সম্রাট) ১০
এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন ৯১
এডওয়ার্ড গেট ৮৫
এডওয়ার্ড নরম্যান বেকার ৫৭
এডিসন (স্পেক্টেটর) ৫৩
এডুকেশন গেজেট ২৯
এডুকেশন বা শিক্ষা রিপোর্ট ৮, ১০,
১৮, ২৩, ১৯, ২৩, ৪১
এড্যাম সাহেব ৩৬
এনটিকুইটিজ অফ উড়িষ্যা ৮৬
এবারজিনস অফ বেঙ্গল ৮৬
এলফিনস্টোন জ্যাকসন ২১, ২২
এলানসন ৫৭
ওব্রায়েন স্মিথ ২৯
ওয়াটসন সাহেব ৫৩
ওয়েল উইসার ২৭, ২৮
ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী (জীবনী) ৭৪-৮৯
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ২১
কটন ইনস্টিটিউশন ৯১
কটন, এইচ. এ. ৬২
কণাদ ব্রহ্মচারী ৯৬
কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ৩১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪১, ৪৩, ৫৫
৬৪, ৬৯, ৭৩, ৮২, ৮৬, ৯১
কলিকাতা মাদ্রাসা ৫৪
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ১৫, ২৪
কল্পনা ৯৫, ৯৭
কামদেব ব্রহ্মচারী ৭৪, ৭৫
কামাখ্যাচরণ নাগ (জীবনী)
১৭৯-৯০
কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ৪৮
কার সাহেব (অধ্যক্ষ) ১১, ২০, ৪১
কালিস, সি. ই. ৬৮
কালীকিঙ্কর দত্ত ২১৩
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১১৮, ১২৯
কালীকৃষ্ণ মিত্র ২২, ২৪
কালীনাথ ভাদুড়ী ১০৩, ১০৯
কালীপদ বসু ১০৬
কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ২৩৭
কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ১১৭, ১১৮
কালীমোহন রায়চৌধুরী ৭৬
কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৭
কুঞ্জলাল নাগ (জীবনী) ১২৫-৪২
কুমুদরঞ্জন রায় ১২১
কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫৮
কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৩৬
কৃষ্ণদাস পাল ২৭
কৃষ্ণনগর কলেজ ৬, ৯, ৩৮-৪১, ৫৪
কৃষ্ণনগর মিশনারী বিদ্যালয় ৩৭
কৃষ্ণনাথ কলেজ ৬, ৯, ৭৯, ১১৭
কৃষ্ণবিহারী সেন ৮১
কৃষ্ণলাল নাগ ১১৮, ১৩০
কৃষ্ণানন্দ স্বামী ১৮৮-৯
কেদারনাথ মজুমদার ৯৬

কেশব একাডেমী ৬১
কেশবচন্দ্র রায় ৪১
কেশবচন্দ্র সেন ২৭, ৩১, ৮২-৪
কেশব রায় মজুমদার ৭৫
কৈলাসচন্দ্র বসু ১৯
ক্যালকাটা খৃশ্চিয়ান অবজারভার ৫
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটী ৫২
ক্রুপট ১১৭
খানাকুল কৃষ্ণনগর ৯০
গঙ্গাচরণ সরকার ১০
গঙ্গাধর কবিরাজ ৮৩
গঙ্গাধর রায় ৫৩
গঙ্গানারায়ণ বারিক ৫৩
গিরিজাসুন্দরী দেবী ১০৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৩, ৯৫
গিরিশচন্দ্র বসু ১০
গুণাভিরাম বড়ুয়া ৮১, ৮২
গুরুচরণ চক্রবর্তী ১৮
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪-৭
গোকুলচন্দ্র বসু ১৬, ১৯
গোখেল ৮২
গোপাল কৃষ্ণ ১৮
গোপিকামোহন ভট্টাচার্য ৬২
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১৮
গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী ১১৮
গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৫৮
গৌরীশঙ্কর দে (জীবনী ৬১-৭৩), ১০১
ঐ ভ্রাতাগণ ৬২
গ্রীফিথস ১৬৪
গ্রেভস ৭
চট্টগ্রাম কলেজ ৭৯
চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ১১৮
চন্দ্রকিশোর ঘোষ ১৪৬
চন্দ্রনাথ বসু ৮০
চন্দ্রপণ্ডিতের মাইনর স্কুল ৭০
চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভিলিয়ন ৫
চার্লস প্যারী হবসহাউস ৩৮
চার্লস ব্যারোজ ৬৫
চারুচন্দ্র গোস্বামী ৮১
চিন্তামণি সরকার ৩৭
চীক (ডাঃ) ৫২
চোরবাগান প্রিপারেটরী স্কুল ২৫
চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয় ২৫, ২৭
ছবীন্দ্রলাল নাগ ১৩০, ১৪০-৪২
জগদিন্দ্র নাথ রায় ১২১
জগদীশ মুখোপাধ্যায় (জীবনী ১৭১-৭৮), ৮১, ৮৮, ২৩৫
জগবন্ধু লাহা ৮৮
জন পামার এ্যাণ্ড কোং ১১
জন পিটার গ্রাণ্ট ১৪
জন্মভূমি ৭৬, ৮৪-৫, ৯৩-৭
জনার্দন চক্রবর্তী ২৩৬
জনার্দন সরকার ৫২
জর্জ (সম্রাট পঞ্চম) ১২১
জর্জ, গোল্ডস বারি ৫২
জর্জ, লক ৫২
জার্ডিন ৬৯
জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩
জেমস (অধ্যক্ষ) ১৬৬
জেমস সাদারল্যাণ্ড ২১

জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন বা
স্কটিশচার্চ কলেজ ৪, ৯, ৬৫, ৬৬, ১২৯
জ্যাকেরিয়া, কে, ৭
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ১০১
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১০৬-৭
জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ৮৩
টনি (অধ্যক্ষ) ৩১
টি অফ টেম্পারেন্স ২৭
ট্রেভর ২১
ঠাকুরদাস দাস ৫১
ডন সোসাইটী ১৯৭-২০১
ডারউইনের থিয়োরী ৮৫
ডাল, সি. এইচ. ২৭
ডিরোজিও ৭৪, ৮৮
ডেভিড কার্লভাক ৮
ডেভিড হেয়ার ১৭
ঢাকা কলেজ (স্কুল) ১০, ১৭, ৪৩,
১১৪, ১১৭
তত্ত্বচিন্তামণি ৯৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৩
তারকনাথ ঘোষ ১৯
তারাচরণ দত্ত ৫২
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ৮৩
তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ৫৩
তারিণীচরণ সরকার ১৬
তোফেল আলি ৩
থোয়েটস ১১, ৪২
দাতাকর্ণ পালা ৫২
দিলীপকুমার রায় ২০৭
দীননাথ ধর ২৫
দীনবন্ধু মিত্র ২৮, ৪১, ৪৮
দীনেশচন্দ্র সেন ২৪৭, ২৭২
দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩
দুর্গাচরণ লাহা ১৮
দুর্গাচরণ সার্বভৌম ১১৮
দুর্গাপ্রসাদ দত্তগুপ্ত ৩৪
দেবপ্রসাদ ঘোষ ১২০
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ৮১, ৮৮
দেবী চৌধুরীর পাঠশালা ৩৫
দ্বারকানাথ অধিকারী ১০, ৪১
দ্বারকানাথ বসু ২৬১
দ্রবময়ী দেবী ১৬
ধনমণি ১৬
ধর্মদাস সুর ৯৪
ধর্মবংশ স্থবির ৮৬
ধর্মবন্ধু ৮৬
নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ৯৪
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮, ৮৫, ১১৮-৯
নগেন্দ্রনাথ বসু ৯৫, ৯৯
নজরুল ইসলাম ২২৫-৭
নন্দকুমার রায় ৫৩
নন্দলাল দে ১০
নবকৃষ্ণ ঘোষ ৩০
নবীনকৃষ্ণ মিত্র ১৩
নবীনকৃষ্ণ সরকার ৫৩
নব্যভারত ৭৯, ৮৩, ৮৫, ৯৫, ৯৭, ১২৮
নলিনীকান্ত সরকার ২২৫
নারায়ণ ঠাকুর ৯৬

নারায়ণ বিদ্যারত্ন ১১৮
নীলকণ্ঠ মজুমদার ১১৭
নীলকমল ভাদুড়ী ৪০
নীলমণি চক্রবর্তী ২৫
নীলমণি মিত্র ৬২
ন্যাস ১১৫
পন্নালা (কৃষ্ণনগর) ৩৪
পলাশীর যুদ্ধ ১, ২
পাইওনিয়ার ৭২
পামার এ্যাণ্ড কোং ৩
পার্বতীচরণ মিত্র ২০
পেডলার ১৬৫
পার্বতীচরণ সরকার ১৭, ১৯, ২১, ৩১
'পিত-পুত্র' (অক্ষয়চন্দ্র-গঙ্গাচরণ) ১০
পিয়ার্স ৩
পুরোহিত ৯৩, ৯৫, ৯৭
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০
পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৩
পূর্ণানন্দ স্বামী ৮৬
প্যারীচরণ বালিকা বিদ্যালয় ২৭
প্যারীচরণ সরকার (গ্রন্থপঞ্জী) ৩১
ঐ (জীবনী) ১৬, ৩২
প্যারীচরণ সরকার ৯, ১৪, ৪৩, ৭৪, ৮৮
প্রকৃতি ৯৭
প্রতাপাদিত্য ৭৫
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৫৫
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৬১, ১৮৪
প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ২৪৩-৪
প্রবাহ ৯৭
প্রমথনাথ তর্কভূষণ ১১৮
প্রসন্নকুমার গুপ্ত ২৪
প্রসন্নকুমার রায় ১১৭-৮
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ৬১, ৯০
প্রসন্নকুমার সরকার ১৭
প্রসাদ লাহিড়ী ৩৭
প্রহ্লাদ চরিত্র ৫২
প্রাচীন আর্যরমণীগণের জীবনবৃত্তান্ত ১৪
প্রাচীন ভারতীয় গণিত বিদ্যা ৬১
প্রাট ১০
প্রেমহার ৮২
প্রেসিডেন্সী কলেজ ৯, ২৬, ৬৩,
৬৮, ৭৮, ৮১, ১০৫, ১১৫
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (গ্রন্থপঞ্জী) ২১৭
ঐ (জীবনী) ২০৯-১১)
ফার্স্ট বুক অফ রিডিং ২৪
ফ্রী চার্চ স্কুল ৬৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০, ৪৮, ৬৯,
৮৩, ১৬১
বঙ্গমহিলা ১৮
বঙ্গবাসী ৮৩-৫
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ৯৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৭০, ৯১, ৯৭,
৯, ২১৮, ২৪১
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৯৫
বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২, ৩
বরদাচরণ মজুমদার (জীবনী) ২২০-৩০
বরদাচরণ মিত্র ৮৩
বরদানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৩
বর্ণ পরিচয় ১৪
বসন্তকুমার নিয়োগী ৫৮

বহরমপুর কলেজ ৭
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৩৮-৯, ২০৬
বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর ৯৭
বিপিনচন্দ্র পাল ৯৯
বিপিনবিহারী গুপ্ত ৫৫, ১১৮
বি. বি. দত্ত (বিভূভূষণ) ৬১, ১৩০
বিমলচরণ দে ১৮
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৯৫, ২৬০-১
বীটন বালিকা বিদ্যালয় ২৩, ২৭
বীটন সাহেব ২৭, ৪৩, ৪৭, ৫০
বীটন সোসাইটী ১২, ২৯
বীটল্যাণ্ড ৩৯, ৪২
বীরেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ১২২-৩
বীরেশ্বর দাস ১৬
বীরেশ্বর মিত্র ৪৩
বুথ ১১৮
বেঙ্গল ম্যাগাজিন ৯, ১১-২
বেঙ্গল একাডেমী ৯৭
বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটী ২৭
বেঙ্গল হরকরা ১২
বেঙ্গলী ১২, ৩২
বৈকুণ্ঠনাথ সেন ৩১
বৈদ্যনাথ বসু ১১৮
বৌদ্ধ জাতক ১২১
ব্যোমকেশ মুস্তফী ৯০
বাষ্টিড ৬২
বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৯৬
বাঞ্ছারাম অক্রুর ৮
বাসুদেব নন্দী ১১৩
বাসুদেব সার্বভৌম ৯৬
বামাবোধিনী ৯৭
বারাসাত স্কুল ১২, ২১
ব্রজনাথ দে ১১৮
ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৭
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫, ৯৬
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৬১
ব্রহ্মমোহন মল্লিক ৫৫
ব্র্যাডবেরী ৩৯
ব্ল্যার্ক, সি. বি. ৫৮
ভবানন্দ ৭৬
ভাস্করাচার্য ৬১
ভিক্টোরিয়া ৪৮
ভুবনমোহন সরকার ৬, ২৫, ২৮, ৩১
ভুবনমোহন সেন ৮৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৮, ১৪, ১৮, ২৯, ৪২, ৮০, ৮৩, ৮৮
ভূপতিমোহন ভট্টাচার্য ৯৮
ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ১৮৯
ভৈরবচরণ সরকার ১৬
ভোলানাথ দত্ত ১৮
মডার্ণ রিভিউ (গৌরীশঙ্কর দে) ৭২
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১৮৪-৫
মতিলাল দাস ২৫৩-৪
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৩৯
মধুসূদন দত্ত (মাইকেল) ১৮, ৩২
মধুসূদন দে ৬২-৩
মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ৫১, ৫৩
মন্মথনাথ ঘোষ ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭১
মারিশন ৬৯
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (জীবনী) ৯০-৯৯

মহেন্দ্রলাল বসু ৯৫
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১১৬
মহেশচন্দ্র চৌধুরী ৫৩
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৪৩
মহেশচন্দ্র মিত্র ১০
মানিক বসু ২০
মাধবচন্দ্র দত্ত ১৮
মার্টিন ৭
মাইকেল স্যাডলার ১৩২
মেকলে ৫, ১৩, ৩৯
মেট্রোপলিটান ৮, ২৫, ১১৮
মোহিতলাল মজুমদার ২১৬
মৌয়াট ১৯
ম্যাকে ৬
ম্যাকডোনাল্ড ৩১
ম্যাকআর্থি ৪২
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৯৮
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৬৫
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (জীবনী) ২৩১-৮
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ৮২
যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৩
যদুনাথ রায় ৫৩
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী (জীবনী) ১০০-১১
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৮
যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫২
যোগীন্দ্রনাথ বসু ৮১, ৯৮, ২৫০ (জীবনী) ২৩৯-৪৯
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ৮৩, ৮৪
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৯৩
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৮
যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৪৪
যোগেশচন্দ্র রায় ১৮১
য়াল্টি সার্কুলার সোসাইটী ১৩৫
রঘুনাথ রায় ৩৬
রঘুনাথ শিরোমণি ৯৬
রজনীনাথ রায় ৮১
রচফোর্ট ৩৯, ৫৪
রতনমণি গুপ্ত ৮৮
রত্নেশ্বর আগমভূষণ ৯৬
রমানাথ রায় ৮৪-৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৩, ৯৭, ৯৯
রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৩
রসময় মিত্র (জীবনী, সংবর্ধনা) ১২৭, ১৫৬
রাখালচন্দ্র নাগ ৫৬
রাজকুমার চক্রবর্তী ১৩১
রাজকুমার সেন ১২৭
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৯
রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী ৯৭
রাজনারায়ণ বসু ১৮, ৭৪, ৮২, ৮৭, ৮৮
রাজা মানসিংহ ৭৫
রায়, এ. কে. ৭৬
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩১, ৮৩, ৮৬
রাধাকান্ত দেব ২৭
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ২০৩
রাভেনশ কলেজ ৪৩, ৮০, ৭৯, ৮৩
রামচন্দ্র ভট্টাচার্য ১০৩
রামচন্দ্র সরকার ১৭

রামতনু লাহিড়ী ১৪, ৩৫-৩৬, ৩৯, ৪৫, ৭৪, ৮৮
রামদাস সেন ৮৩
রামমোহন রায় ১, ২, ৯০, ৯৫-৬
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৮, ৭২, ৮৫
রামেশ্বর শর্মা ১১৬
রাসবিহারী ঘোষ ৫৫, ৫৮
রিচার্ডসন ১৮, ২০, ৩৮৯, ৫৩, ৫৪, ৭৪, ৮৮, ১৩২
রিপন কলেজ ৬২
রীজ ১০, ১৭
রেইজ এ্যাণ্ড রাইয়ত ১০, ১২
রেভারলি, এইচ. ৭৬
রোপার লেলব্রীজ ২৫
লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী ৭৪-৬
লজ ২১
লাইব্রেরী পরীক্ষা ৪০
লা-পাতি ১১
লালবিহারী দে ৮-১২, ৪৩, ৪৫
লিউইস, জি ২০
লোকনাথ ঘোষ ৫
লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১৩৯
লোকনাথ রায় ১১১
লোপেজ ৪২
শম্ভুনাথ পণ্ডিত ২৭
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১
শিবচন্দ্র সেন ১৫৯, ১৬৩
শিবনাথ শাস্ত্রী ৩৬, ৮১
শিবরাম সরকার ১৬
শিবনারায়ণ বসু ১০
শিবপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ৩৬
শিবু সরকার ৫১
শিশিরকুমার ঘোষ ৮৩, ৮৫
শিস গাঙ্গুলী ৭৪
শুভঙ্কর (জীবনী ২৫১), ৬১
শ্যামসুন্দর রায় ১১৩
শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫, ২২২
শ্রীনাথ দত্ত ৮১
শ্রীনাথ সমাদ্দার ৬
শ্রীশচন্দ্র রায় ৪০
সংবাদ প্রভাকর ১২
সংস্কৃত কলেজ ৬২, ৯১, ৯৩
সখারাম গণেশ দেউস্কর ২৪৩
সঞ্জীবনী ৮৫
সটক্লিপ ৪৩, ৬৪
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯৫-২০১
সতীশচন্দ্র রায় ১৯৯
সন্তোষ রায়চৌধুরী ৭৫
সমাচার চন্দ্রিকা ৯৭
সমাচার দর্পণ ১৩
সল সিনিয়র ৬৫
সাধারণী ১২৯
সাপ্তাহিক সমাচার ৮২, ৮৫
সাহিত্য ৮৫, ৯৭
সাহিত্য কল্পদ্রুম ৯৭
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৯৭
সাহিত্য সংহিতা ৯৩, ৯৭
সাহিত্য সভা ৯৭-৮
সারদাচরণ মিত্র ৯, ৯৮
সারদারঞ্জন রায় (জীবনী ১১২-২৪), ১০৫

সিসিল বীডন ৩৯, ৪০
সিটি কলেজ ১০৫
সীতানাথ চক্রবর্তী ৫১
সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ৫০
সুকুমার সেন ১১৮, ২৫২, ২৫৫
সুরেন্দ্রকুমার নাথ ১৩১
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮, ৩১, ১১৮
সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৯, ৭১
সুরেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত ৪৫
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৯৩
সূর্যকুমার অগস্তি ১১৭
সৈয়দ আহমদ ১০৫
সোমেশচন্দ্র বসু ১৩৬
স্কুল বুক সোসাইটী ২৩, ৩৯
স্টার অফ উৎকল ৮০-৮৫
স্মিথ—৫, ৯, ১৩, ৬৯
স্টেটসম্যান ১২, ১০৫, ২৫০, ২৬১
হজসন প্রাট ১৯
হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৮
হরগোবিন্দ সেন ৫৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৯৬-৯৯
হরিচরণ দাস (জীবনী ৫০-৬০)
গ্রন্থাবলী ৫৪, ৫০
হরেন্দ্র ঘোষ ১০
হারাণচন্দ্র চাকলাদার (জীবনী ১৯১-২০৪)
ঐ প্রকাশিত গ্রন্থ ২০৪
হারাণচন্দ্র মৈত্রেয় ৫৩
হিতকরী ২৮
হিন্দু ইনটেলিজেন্সার ৭
হিন্দু পেট্রিয়ট ১২, ২৬, ৮২
হিন্দু মেলা ২৮
হিন্দু স্কুল-কলেজ ৪, ৯, ১৭, ১৯, ৩৮-৯, ৬৩, ৭৭-৯
হীরালাল বসু ৮১
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৯৯, ২১৩
হুগলী কলেজ-স্কুল ৫-৯, ১০-১১, ২০-২১ ৫৬, ৭৯
হেনরি হ্যারিসন ৫৭
হেয়ার (স্কুল) ১৭, ২৫, ৭৪, ৭৯
হেমেন্দ্র দত্তগুপ্ত ৪৪, ৫৮
হেস ৪১
হেস্টি ৬৯
হেমেন্দ্রনাথ পালিত ২৬২-৩, ২৭১
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৪২-৩
হ্যাণ্ড ৮
হ্যানিমানের জীবন চরিত ৯৩
হ্যালিডে ৪৬